বাংলা স্বদেশী গান

বাংলা স্বদেশী গান

গীতা চট্টোপাধ্যায়

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
দিল্লী

BANGLA SWADESHI GAAN
(Patriotic Songs in Bengali)

by Gita Chattopadhyay

প্রকাশক ঃ

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

দিল্লী

প্রকাশ কাল ঃ

জানুয়ারী, ১৯৮৩

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শ্রীশ্যামজী দুবে কর্তৃক প্রকাশিত ও নয়া প্রকাশ, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সংকেত সূচী

১। পূঃ উঃ—পূর্বে উল্লেখিত।

২। সা. সা. চ. মা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্যসাধক চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।

৩। র. র.—রবীন্দ্ররচনাবলী।

৪। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাস ও প্রবন্ধের উল্লেখ সাহিত্যসংসদ সংস্করণ বঙ্কিমরচনাবলী, ১৯৬৯, থেকে গৃহীত।

৫। গ্রন্থ প্রকাশস্থান উল্লিখিত না থাকলে তা কলিকাতা বুঝতে হবে, কলিকাতা ভিন্ন অন্যান্য স্থানের নাম উল্লেখ করা হবে।

৬। সমগ্র নিবন্ধে পরম্পরা রক্ষার জন্য খ্রীষ্টাব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বঙ্গাব্দ থেকে খ্রীষ্টাব্দ গণনা করা হয়েছে।

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ প্রসঙ্গের আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীতে। চর্যাপদ থেকে রামপ্রসাদের গান পর্যন্ত প্রায় সাতশ বছরের সাহিত্যে স্বদেশ সম্পর্কিত গান বা কবিতা নেই। এর কারণ অবশ্য স্পষ্ট। ইংরেজ আগমনের আগে স্বদেশ-চেতনার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। 'নদীজপমালাধৃত প্রান্তর' ভারতবর্ষের ঐক্য সম্বন্ধে শিক্ষিত ভারতীয়ের একটি ধারণা অবশ্যই ছিল—সেই ধারণা তৈরী হয়েছিল মূলতঃ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধন থেকে। কিন্তু সেই ধারণা রাজনৈতিক ঐক্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যদিও সংস্কৃত রামায়ণে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' বাক্যটি আছে, তবুও উনবিংশ শতাব্দীর এক বাঙালী সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজি *Patriotism* শব্দের প্রতিশব্দ নেই বলে সংস্কৃত ভাষাকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে স্বদেশপ্রেমের কারণ রাজনৈতিকবোধ সম্বন্ধে বাঙালীর সচেতনতা। আর সেই সচেতনতার প্রত্যক্ষ কারণ ইংরেজ শাসন ও ইংরেজি শিক্ষা। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন. "ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে" এবং ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার থেকে আমরা পেয়েছিলাম 'স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা'র বোধ। বঙ্কিম[১] স্বীকার করেছেন "ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দুজাতি জানিত না।" এই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতি প্রতিষ্ঠার বোধ উনবিংশ শতাব্দীর দেশপ্রেমের দু'টি প্রধান উপাদান।

বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেম নির্ভর সাহিত্য রচনার উদ্ভবের কারণের মূলে প্রধান ও অপ্রধান কয়েকটি কারণ আছে। প্রধান কারণটি সাহিত্যিক কারণ নয়—রাজনৈতিক ও সামাজিক। ইংরেজের সঙ্গে পরিচয় এবং পরাধীনতার বোধ—এই দু'টি বোধের সম্মিলনের ফলে আমাদের দেশপ্রেমের বোধ পরিপুষ্টি লাভ করে এবং সাহিত্যে নানাভাবে সেই বোধটি উন্মেষিত হতে থাকে। দেশপ্রেম নির্ভর সাহিত্য বা সাহিত্যে দেশপ্রেমের স্থান মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল পরাধীনতার বোধ থেকে—পরাধীনতার বোধ মূলতঃ হীনমন্যতার ও বেদনার বোধ এবং তার মধ্যেই এই হীনমন্যতা ও বেদনার প্রতিষেধক হিসেবে দেখা যায় দেশের যা কিছু মহৎ তার জন্য গৌরববোধ এবং যা কিছু তুচ্ছ তার জন্য মমত্ব। স্বদেশপ্রেমের সাহিত্য তাই একই সঙ্গে হীনমন্যতা ও বেদনা, গৌরব

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ভারতকলঙ্ক' বঙ্গদর্শন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৮৭২

ও আশা, মমতা ও প্রীতির কথা। সাধারণতঃ স্বদেশপ্রেম সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে দু'টি কারণে, একটি সমাজমানসের পরিচয় হিসেবে, আর একটি হ'ল সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজকে কোন একটি বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করা বা স্বাধীনতার জন্য পথনির্দেশ করার জন্য। অর্থাৎ স্বদেশপ্রেমের সাহিত্যের দু'টি ধারা, একটি ধারায় স্বদেশপ্রেম মানবপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রীতি বা ঈশ্বরভক্তির মতই একটি ভাব বা ধারণা বা অনুভূতি ; আর একটি ধারায় স্বদেশপ্রেম বিশেষ কর্মের জন্য মানুষকে উদ্বোধিত বা উত্তেজিত করার অস্ত্র। বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম সাহিত্যের এই দু'টি ধারাতেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। বাংলায় স্বদেশপ্রেমমূলক সাহিত্যের উদ্ভবের প্রধান কারণ রাজনৈতিক ও সামাজিক। কিন্তু একটি সাহিত্যিক কারণও আছে, সেটি অবশ্য অপ্রধান। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ ইংরেজি সাহিত্যে এবং ইংরেজির মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্যে, স্বদেশপ্রেমমূলক রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। মুর, ক্যাম্বেল, বায়রণ প্রভৃতির বহু কবিতাই শিক্ষিত বাঙালীকে মুগ্ধ করেছিল। যা মানুষকে মুগ্ধ করে তা নিজের সাহিত্যে সৃষ্টি করার কল্পনাও মানুষের স্বাভাবিক। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, এমন কি মাইকেল, বঙ্কিমও অনেক সময় বিদেশী কবির উক্তি নিজের ভাষায় অনুবাদ করে নিয়েছেন। স্বদেশের শৌর্যবীর্যগাথা, স্বদেশের কীর্তিবিষয়ক রচনার একটি পরোক্ষ কারণ ইংরেজি সাহিত্য।

স্বদেশ-চেতনা যখন বাঙালীর মনে বিকশিত হ'ল তখন থেকেই শুধু কবিতায় নয়, গানেও তার আবির্ভাব ঘটল। সে অর্থে দেশপ্রেমের গান বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি নূতন সৃষ্টি। দেশপ্রেমের গান রচনা শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তমদশক থেকে আর রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গানগুলিরও নানারকম পরিবর্তন ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুমেলা থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত সময়ে রচিত দেশপ্রেমের গানগুলিকে এক অর্থে স্বদেশী সংগীত বলা যেতে পারে। এই স্বদেশী সংগীতের পর্যালোচনাই এই নিবন্ধের লক্ষ্য।

॥ ২ ॥

বাংলা স্বদেশী গানের প্রধান উৎস বাঙালীর পরাধীনতার বোধ। প্রকৃতপক্ষে সব ভাষাতেই স্বদেশী গান রচনার পেছনে ঠিক পরাধীনতা না হলেও, দেশের বিপন্নতা বা বিপর্যয়ের একটি নিগূঢ় যোগ আছে। কারণ দেশ

সম্পর্কে জাতির ভাবনা ও উৎকণ্ঠার গভীরতা ও ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশী ফুটে ওঠে বিপর্যয়ে বা বিপর্যয়ের সম্ভাবনার মধ্যে। ইস্কিলাসের 'পার্সিয়ানস্' নাটকে দূত যখন

O walls of all the East, O Towers of might
Persia, my home, thou haven of delight

বলে আর্তনাদ করেন তখন বিপন্ন, বিধ্বস্ত পারস্যের পটভূমিতে দেশের প্রতি ভালোবাসার তীব্রতা অনুভব করা যায়। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, নিষ্ক্রিয় জীবন, নিরঙ্কুশ সমৃদ্ধির মধ্যে স্বদেশী কবিতা বা গানের জন্ম অসম্ভব না হলেও অস্বাভাবিক। 'রিচার্ড দি সেকেণ্ড' নাটকে জন অফ্ গন্টের মুখে যে ইংল্যাণ্ড প্রশস্তি শুনি, দেশের প্রকৃতি, দেশের ঐতিহ্য ও কর্মের গৌরব কথা শুনি—তার পটভূমিকায় আছে ইংল্যাণ্ডের বিপর্যয়ের বোধ। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে বাংলায় দেশপ্রেমের কথা সাহিত্যে যে সময়ে এবং যেভাবে শুনেছি—তা প্রত্যাশিত এবং স্বাভাবিক। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেও বাঙালীর দেশ-প্রেমের বোধ ছিল এরকম একটা কথা যদি কোন ঐতিহাসিক প্রমাণও করেন, তবুও দেশপ্রেম যে সাহিত্যের বিষয় হয়নি তার কারণ দেশের বিপন্নতা বা বিপর্যয়ের কোন বোধ বাঙালীর ছিল না। অবশ্যই প্রশ্ন করা চলে যে তাহলে ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ডের কবি টেনিসনের 'চার্জ অফ্ দি লাইট ব্রিগেড', কিংবা টমাস ক্যাম্বলের *Battle of the Baltic* বা *Hohenlinden*-এর মত কবিতা লেখা হ'ল কেন? তখনকার ইংল্যাণ্ডে দেশপ্রেমের কবিতা লেখার কী সামাজিক প্রেরণা ছিল? তার উত্তর অবশ্য সহজ—ইংরেজি সাহিত্যে ঐতিহাসিক ঘটনা বা কিম্বদন্তী অবলম্বন করে কবিতা রচনার ঐতিহ্য প্রাচীন। দেশের অতীতকালের যুদ্ধবিগ্রহের স্মৃতিতে কাব্য রচনার ধারাও ইংরেজিতে প্রবল। কাজেই ইংরেজ সৈনিকদের শৌর্যবীর্য ও বীরত্ব অবলম্বন ক'রে কাব্য রচনার ধারা ছিল অব্যাহত। এবং দেখা যাবে যে এই কবিতাগুলির পটভূমিকায় সমগ্র দেশের বিপর্যয়বোধ না থাকলেও, ইংরেজ সন্তানদের কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বা বিশেষ সময়ের বিপন্নতা, বিপর্যয় এবং প্রতিরোধের বোধ বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। এইসঙ্গে বলা দরকার যে এগুলি ঠিক বৃহত্তর অর্থে দেশপ্রেমের কবিতা নয়, যদিও দেশপ্রেম এদের পশ্চাৎভূমি। তবে বাংলাদেশে এদের জনপ্রিয়তা ছিল যথেষ্ট, এদের থেকে আমাদের কবিরা প্রেরণা পেয়েছেন বিপুল।

এখানে যে কথাটির ওপর জোর দিতে চাই, তাহ'ল দেশপ্রেম নির্ভর সাহিত্যের জন্মের একটা প্রত্যক্ষ কারণ থাকে। শত্রু-আক্রান্ত দেশ, পরাধীন দেশ, বিপর্যস্ত বিপন্ন দেশই দেশপ্রেম নির্ভর সাহিত্যের প্রত্যক্ষ পটভূমি। তখন দেশপ্রেম অতীত ঘটনা, পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে যেমন তির্যকভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনই বর্তমানের বেদনা ও দুঃখকে অবলম্বন ক'রে স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর ঘটনাগুলি তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের থেকে বহুদূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও সমকালীন বাঙালীর দেশপ্রেমের বোধে সাহায্য করেছিল। আবার কবিরা স্পষ্টভাবে বর্তমান পরাধীনতার গ্লানি ও তার থেকে উদ্ধার পাবার কর্মপন্থাও সাহিত্যে স্পষ্টভাবে বলতে চেয়েছিলেন। দেশপ্রেমের প্রকাশের এই দু'টি পথকে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে।

॥ ৩ ॥

বাংলা সাহিত্যের বিশেষ একটি ধারাকে 'স্বদেশী গান' রূপে চিহ্নিত করার আগে এই শ্রেণীর রচনার লক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষেপে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। উনিশ শতকের যে সকল কবিতা বা গানের উপজীব্য বিষয় 'স্বদেশপ্রেম'—অর্থাৎ দেশের ভৌগোলিক সত্তা সম্পর্কে চেতনা, দেশের প্রাকৃতিক রূপঐশ্বর্য্যের অনুধ্যান, দেশের সাংস্কৃতিক ও আত্মিক অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা, দেশ ও দেশবাসীর প্রতি শ্রদ্ধা, মমতা ও সহানুভূতির বোধ নিয়ে রচিত গানগুলিকেই 'স্বদেশী গান' বলে চিহ্নিত করেছি। অবশ্য এই অনুভূতি নিয়ে রচিত যে কোন কবিতাই গান নয়। প্রকৃতপক্ষে, স্বদেশী গান স্বদেশবিষয়ক বাংলা কবিতার একটি অংশ মাত্র। যেসকল রচনার শিরোনামের সঙ্গে রাগরাগিণী উল্লিখিত আছে, সেগুলিকেই শুধু গান বলে গ্রহণ করেছি। কারণ এগুলি যে গীত হয়েছিল, বা গীত হবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, তা রাগের উল্লেখের দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

এছাড়া, স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশবাসী যেসকল সংগঠন প্রতিষ্ঠা বা কর্মপ্রণালী প্রবর্তন করেছিলেন তার অঙ্গ হিসেবেও কিছু স্বদেশবিষয়ক গান রচিত হয়েছিল। হিন্দুমেলার (১৮৬৭) বাৎসরিক অনুষ্ঠানের জন্য রচিত ও গীত গান, কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনসমূহ উপলক্ষ্যে রচিত গান, 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী' আন্দোলন কালে, রাখীউৎসবের জন্য রচিত গান—প্রভৃতি নানা

সময়ে, নানা প্রয়োজনে জন্ম নিয়েছে এবং বাংলা স্বদেশী গানের কলেবর বৃদ্ধি করেছে।

এই গানগুলি যে উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত হোক না কেন, পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়ায় গানগুলির উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পায়। তখন থেকেই গানগুলির সাহিত্যিক গুণাগুণই শুধু নয়, রাজনৈতিক গুরুত্বও প্রধান হ'য়ে উঠল।

স্বদেশপ্রেমের উন্মেষলগ্ন থেকে দেশের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে অজস্র স্বদেশী গান রচিত হয়েছে, গীত হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ সময়ের চিন্তাধারা অনুসারে তাদের নব নব মূল্যায়নও ঘটেছে। বাংলা স্বদেশী গানের ক্ষেত্রে শিক্ষিত কবি-গীতিকারের অবদান যেমন স্বীকৃত, তেমনি পল্লীর অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত কবি-গীতিকারের দানও উল্লেখযোগ্য। দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত এই সমস্ত পল্লীগীতিগুলির মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রাণের আবেগ অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষ্য করি। অসংখ্য গীতিকারের সাধনাপুষ্ট এই গীতি-সাহিত্যের অনেক গান আমাদের কাছে আজও অজ্ঞাত রয়ে গেছে। তবে বিভিন্ন সঙ্গীত-সংগ্রহ গ্রন্থ ও গীতিকবিতা সংকলন গ্রন্থের 'স্বদেশবিষয়ক' রচনার অন্তর্ভুক্ত গান, গীতিকার বিশেষের সমগ্র সঙ্গীত সংগ্রহের অন্তর্গত এই বিশেষ লক্ষণসম্পন্ন গানগুলির ভেতর দিয়েই বাংলা স্বদেশী গানের পরিচয় খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছি। স্বদেশী গানের আলোচনার ভিত্তিও নানাভাবে সংগৃহীত এই সকল গান।

বাঙালীর স্বদেশপ্রেমের উপলব্ধি নানা রাজনৈতিক ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা-প্রভাবে বিবর্তিত হয়েছে, ইতিহাস এই বিবর্তনের সাক্ষ্য দেয়। বাংলা স্বদেশী গানেও সেই একই প্রভাবের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে বিচিত্র সুর বেজেছে। হিন্দুমেলা যুগের গান ও স্বদেশী যুগের গানের মধ্যে ভাবগত ঐক্য যেমন আছে, তেমনি সূক্ষ্ম পার্থক্য ও লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র গানের বিচারকালে দেখি হিন্দুমেলা থেকে আরম্ভ করে অসহযোগ এবং বিপ্লবী আন্দোলন পর্যন্ত রচিত বা গীত গানগুলিতে মূলসুরের সাদৃশ্য অনেক পরিমাণে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু আরও পরবর্তীকালে রচিত গণনাট্য সংঘের গানগুলি (১৯৪২'র পরবর্তী) এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। স্বদেশী গানের মূল ভাবধারার সঙ্গে এসব গানের যোগ অনেক কম। যদিও জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এই গানগুলির ভূমিকাও অন্যান্য গানের তুলনায় তুচ্ছ নয়, কিন্তু এই নূতন ভাবনা শুধু বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষকে অবলম্বন করেই কবিমনে জাগেনি, সমগ্র

পৃথিবীর শোষিত মানবের পটভূমিকায় এই চেতনা জেগেছে। ভাব-উৎস, বিষয়বস্তু, রচনারীতি—সবদিক থেকেই এই পর্যায়ের গানগুলি পূর্বপর্যায়ের থেকে পৃথক বলে এই গানগুলিকে এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিনি। কিন্তু বিশেষ যুগের, কবি বা গীতিকার-গোষ্ঠীর দেশপ্রেমের অনুভূতি ও রাজনৈতিক ভাবনার চিহ্নবাহী হিসেবে এই গানগুলি স্বতন্ত্র আলোচনা ও বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

॥ ৪ ॥

জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক বা সাহিত্য জাতীয়-চেতনায় কতটা এবং কিভাবে সাড়া জাগাতে পারে, অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনই বা কতটা সাহিত্যিক প্রেরণার উৎস হতে পারে সেদিক থেকে বিশেষ কোনও আলোচনা এখনও হয়নি। এই ধরণের আলোচনার উদ্দেশ্যে রচিত প্রথম বাংলা বই হ'ল সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য'।[১] এই বইয়ের নিবেদন অংশে তিনি বলেছেন যে স্বদেশী যুগে "আত্মশক্তির ভিত্তিতে জাতীয় উন্নতিসাধন ও স্বাধীনতা লাভের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায় বাঙালী যে কর্মশক্তির পরিচয় দেয় তার প্রভাব বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কম পড়েনি, আবার সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের প্রভাবও এই যুগের প্রকৃতি-গঠনের কাজে পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় ছিল। ইতিহাসের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখে এই যুগের বাংলা সাহিত্যের সঠিক ও সামগ্রিক পরিচয় নির্ণয় করাই এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য।" কিন্তু এক্ষেত্রেও আলোচনার কালসীমা নির্দ্দিষ্ট শুধু স্বদেশী যুগের (১৩১২-১৩১৮। ১৯০৫-১৯১১) মধ্যে। তবে সাহিত্যে স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বাভাস আরও কয়েক বছর আগেই সূচিত হয়েছে। তাই লেখক তাঁর আলোচনার কাল আর একটু দীর্ঘতর করে ১৯০১-১৯১৪ সালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ফলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সমগ্র ধারাটির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণের অবকাশ এক্ষেত্রে তাঁর ছিল না। অন্যদিকে, ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে জাতীয় আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্যের

১। সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য', ১৯৬০

এবং বিশেষ করে গানের প্রভাবের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তার বেশী নয়।[১]

স্বতন্ত্রভাবে কোন কোন কবির দেশপ্রেমমূলক গানের আলোচনা কেউ কেউ করেছেন। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, মুকুন্দদাস ও নজরুল সম্বন্ধে নানা গ্রন্থে ও প্রবন্ধে আলোচনা হয়েছে।[২]

স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য তথা স্বদেশী গান সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধও রয়েছে।[৩] সেখানে গান

১। Mukherjee, Haridas and Mukherjee Uma (b) *India's Fight for Freedom or The Swadeshi Movement*, Cal., 1958.

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ক) 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন', কলিকাতা, ১৯৬০ হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়—'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ', কলিকাতা, ১৯৬১

Majumdar, R. C. (b) *History of the Freedom Movement in India*, Vols. 1-3, Cal., 1963.

Dutta, K. K.—*Renaissance, Nationalism and Social Changes in Modern India*, Cal., 1965.

Tarachand—*History of the Freedom Movement in India*, Vols. 1-4, Delhi, 1961-72.

Sarkar, Sumit—*The Swadeshi Movement in Bengal*, New Delhi, 1973.

২। শান্তিদেব ঘোষ—রবীন্দ্রসঙ্গীত, ১৯৬২, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—কান্তকবি রজনীকান্ত, ১৯৬৫

দিলীপ রায়—দ্বিজেন্দ্রগীতি, ১৯৬৫. মানসী মুখোপাধ্যায়—অতুলপ্রসাদ, ১৯৭১

জয়গুরু গোস্বামী—চারণকবি মুকুন্দদাস, ১৯৭২

ভবতোষ দত্ত—'কবি রজনীকান্ত সেন', তত্ত্বকৌমুদী, ৮৮ বর্ষ, ৯-১৪ সংখ্যা, ১৩৭২।১৯৬৫

৩। Bagal, Jogesh Chandra—'Congress in Bengal'; Chowdhury, Sashi Bhushan—'Pre-Congress Nationalism'; Tagore, Soumyendranath—'Evolution of Swadeshi Thought'—সব ক'টি প্রবন্ধই Gupta, A. C. (ed.) Studies in Bengal Renaissance, Cal., 1958 গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

Das Gupta, R. K. (a) 'The Song Book of Indian Struggle', *Orient Review*, May-June, 1955, Vol. I, i, pp. 49-52.

Das Gupta, R. K. (b) 'The Deity of Bande Mataram', *The Statesman*, Puja Supplement, Sept. 18, 1960.

চিত্তরঞ্জন দাস—'স্বদেশী আন্দোলনের কথা', অর্চ্চনা, ২২শ ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩২।১৯২৫

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত (খ) 'মনোমোহন বসুর স্বদেশী গান', দেশ, ৫ই ফাল্গুন, ১৩৬২।১৯৫৫

প্রসঙ্গে গীতিকার বা কবি বিশেষের স্বদেশী গানের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ বা জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ কোনও একটি গানের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে স্বদেশী গানের বিচার—অর্থাৎ এই গানের ধারার পূর্বাপর বিশ্লেষণ করে, তার স্বরূপ এবং গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়নি।

স্বাধীনতা আন্দোলন জাতির জীবনে যে আলোড়ন জাগিয়েছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মনীষী ও রাজনৈতিক নেতাগণ তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সেকালের সাহিত্য ও গানের উল্লেখ করেছেন তাঁদের জীবনীতে।[১] এখানেও রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নির্দ্ধারণে সাহিত্য বা গানের ভূমিকা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থান ছিল না। কিন্তু এই গানগুলির একটি সামগ্রিক পরিচয় বাংলা সাহিত্যের এবং বাঙালীর সমাজ ও রাজনৈতিক ইতিহাসের পাঠকদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই গানগুলিকে শুধুমাত্র সংগীতরস আস্বাদনের উপাদান হিসেবে না দেখে—যদিও সেই মূল্য উপেক্ষণীয় নয়—দেশের রাজনৈতিক এবং সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে বিচার করলে একই সঙ্গে বাংলা গানের ধারায় এদের সংগীত গুণের বিচার এবং দেশের রাজনৈতিক ভাবনার বাহক হিসেবেও মূল্যায়ন করা সম্ভবপর হবে। এই উদ্দেশ্যেই বর্তমান আলোচনার সূত্রপাত। বিভিন্ন সময়ে রচিত অজস্র স্বদেশী গান বিচার করলে দেখা যায় যে বিভিন্ন

প্রমথনাথ বিশী (ক) 'বন্দেমাতরম্ তত্ত্ব', আনন্দবাজার পত্রিকা, কমলাকান্তের আসর, ১৯৬০

প্রবোধচন্দ্র সেন (গ) 'জনগণমন-অধিনায়ক', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (খ) রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড; ১৯৬১তে সংযোজিত।

নেপাল মজুমদার—'স্বদেশী সংগীত' শীর্ষক আলোচনা, তৎপ্রণীত ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে ১ম খণ্ড, ১৯৬১

১। যেমন Banerjee, Surendranath—*A Nation in Making*, London, 1925.

বিপিনচন্দ্র পাল (ক) 'সত্তর বৎসর', আত্মজীবনী, ১৯৫৫

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—'তরী হতে তীর', ১৯৭৪

মুজফ্ফর আহ্মদ—'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', ১৯৬৯

সুভাষচন্দ্র বসু—'তরুণের স্বপ্ন', ১৯২৯

সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে দেশপ্রেমিকের কর্মপন্থা ও চিন্তাধারাও পরিবর্তিত হয়েছে। তার চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে স্বদেশী গানের বিভিন্ন পর্যায়ে।

প্রশ্ন উঠতে পারে স্বদেশচিন্তা সাহিত্যের অন্যান্য যে শাখায় প্রবাহিত হয়েছে, যেমন, উপন্যাসে, নাটকে, কবিতায়, সেগুলিকে অবলম্বন না করে শুধু গানগুলিকেই কেন গ্রহণ করা হ'ল? অবশ্যই উপন্যাস-নাটক ইত্যাদি সমস্ত কিছুকেই অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্য ও স্বদেশপ্রেমের সম্পর্ক ও সম্পর্কের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা একটি বৃহৎ কাজ। এই বিরাট ক্ষেত্রের একটি অংশমাত্র একটি বিশেষ কারণেই এই আলোচনার কেন্দ্রে রেখেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত কাব্য, নাটক বা উপন্যাসে দেশাত্মবোধের প্রকাশ থাকলেও এই চেতনা ঐসকল রচনার একমাত্র লক্ষ্য নয়। যেমন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) কাব্যে কবির স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা—ইত্যাদি আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই বিজিত-বিজেতা কাঠামোর আশ্রয়ে পরাধীন জাতির হৃদয়বেদনা লাঘবের যে পথ খোঁজা হয়েছে, তা প্রত্যক্ষ নয় অর্থাৎ ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্ক স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। তাছাড়া, সমগ্র কাব্যের মধ্যে মাত্র একবার (ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য) এই চেতনা স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' বা 'বৃত্রসংহার' কাব্য সম্বন্ধেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। কাজেই দেখা যায় যে, বাঙ্গালী কবির স্বদেশপ্রেম আখ্যায়িকা কাব্যের কাহিনীর অন্তঃস্থলে ফল্গুধারার মত কখনও কখনও উচ্ছ্বসিত, কিন্তু তার প্রকাশরীতি সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ নয়।

বাংলা নাটক ও উপন্যাসে দেশপ্রেমের বাণী আভাসিত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তির্যক পথে। অর্থাৎ সাহিত্যিকগণ কখনও দেশের অতীত ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে স্মরণ করে তার বর্তমান পরাধীনতার গ্লানি ভুলতে চেয়েছে, আবার কখনও দেশের অতীত ইতিহাসের বেদনাময় কাহিনী নিয়ে সাহিত্য রচনা করে দেশমাতৃকার প্রতি সহানুভূতি ও মমতা জ্ঞাপন করেছেন। 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' (১৮৭৬) 'সীতারাম' (১৮৮৬) 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪) 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫) 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭) প্রভৃতি উপন্যাস ও নাটক এবং 'সিরাজদ্দৌল্লা' (১৯০৫) 'মীরকাসিম' (১৯০৬) 'মেবার পতন' (১৯০৮) প্রভৃতি নাটক যথাক্রমে এই দুই মনোভাবের দ্যোতক। এই উভয় ক্ষেত্রেই রচয়িতার স্বদেশ-চেতনা অলক্ষ্যে থেকে তাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টিকে পরিচালিত

করেছে। তবে জাতীয়তাবোধ এ ধরণের রচনার উৎস হলেও জাতীয় আন্দোলনের বিবিধ স্তরের সঙ্গে এদের প্রত্যক্ষ সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) সম্ভবতঃ একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে স্বদেশী গান স্বদেশপ্রেমের আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে, জাতির চিত্তে জাতীয়তাবোধ সঞ্চারে ও জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকতে সমর্থ হয়েছে। স্বদেশ-চেতনার উন্মেষকাল থেকে শুরু করে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত স্বদেশকে নিয়ে গান রচিত হয়েছে। এত অসংখ্য গান রচনা থেকেই অনুমান করা যায় যে জনমানসে দেশপ্রেমের উন্মাদনা জাগাতে সাহিত্যের এই শাখাটিই ছিল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাহন।

তাছাড়া, নাটক উপন্যাসের কাহিনী বিশেষ যুগের স্বদেশানুভূতির কোনও একটি দিক—যেমন, পরাধীনতার বেদনা, স্বদেশ রক্ষার আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতাস্পৃহা—নিয়ে রচিত। স্বদেশী গানে তার ক্ষেত্র আর বিস্তৃত। স্বদেশ-চেতনার বিভিন্ন দিক—অতীত গৌরববোধ, বর্তমান দীনতায় হীনমন্যতা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন—ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবোধের স্তর পরম্পরার চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য গানগুলিতে পরিস্ফুট হয়েছে। তার ফলে, বাঙালীর কাব্যপিপাসা, সঙ্গীতরস ও রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা-বিষয়ক কৌতূহলকে একইকালে চরিতার্থ করার আধার এই গানগুলি। এই কারণেই স্বদেশ-চেতনামূলক সাহিত্যের মধ্যে স্বদেশী গানই বিশেষভাবে আলোচনার বিষয় রূপে গ্রহণ করেছি।

॥ ৫ ॥

বর্তমান আলোচনা ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয় 'স্বদেশী গানের পরিচয় ও কালপটভূমি'। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বিষয় 'স্বদেশী গানের মধ্যে প্রকাশিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবনা'। তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্বদেশী গানগুলির মধ্যে যে ইতিহাস-চেতনার প্রকাশ হয়েছে, বিশেষতঃ অতীতকালের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী এবং বর্তমান ভারতের অবস্থার প্রতি কবিদের যে মনোভাব তার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে বন্দেমাতরম্ এবং রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' এই দু'টি গানকে তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত স্বদেশচিন্তা এবং বিভিন্ন বিতর্ক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় এইসব গানের শিল্পগত আবেদন এবং তাদের

রচনারীতির প্রকৃতি। শেষ অধ্যায়ে স্বদেশী গানের অন্যান্য দিকের আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তাদের সংগীত মূল্যের কথাও উঠেছে। কিন্তু বিশেষভাবে বলা হয়েছে সাহিত্যে ও জীবনে এই গানগুলির ভূমিকা। এই ছয়টি পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে স্বদেশী গানের উৎস ও পটভূমি, জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে স্বদেশী গানের সংযোগ, স্বদেশী গানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ইতিহাস-ভাবনার প্রকাশ এবং সর্বশেষে স্বদেশী গানের সাহিত্য মূল্যের বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে।

সঙ্গীত সংগ্রহ বা স্বদেশী সঙ্গীত সংগ্রহগুলি থেকে যেসকল গান সংগ্রহ করেছি, তার অতিরিক্ত আরও অনেক গান কবি-গীতিকার রচনা করেছেন। সেক্ষেত্রে, যে সকল রচয়িতার সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে দু'টি উৎস (সংগ্রহ গ্রন্থ এবং রচনাবলী) থেকেই গান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যাঁদের রচনাবলী প্রকাশিত হয়নি, তাঁদের রচিত আরো গান থাকলেও তা আমার সংগ্রহের বাইরে রয়ে গেল। কোনও একজন কবিরচিত সমস্ত স্বদেশী গানই নিঃশেষে সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা নয়। কেন না, অনেকে হয়ত বিশেষ প্রয়োজনে কোনও গান রচনা করেছিলেন, কিন্তু তা প্রকাশিত না হওয়াতে এখন আর তা সহজে পাওয়ার উপায় নেই। অথচ যাঁরা গানটি গেয়েছিলেন বা গানটি শুনেছিলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতায় গানটির স্মৃতি জাগ্রত হ'য়ে আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সাহানা দেবীর ক্ষুদিরামকে নিয়ে লিখিত গানটির অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, "আমি সেই গান গেয়ে এঁদের কথা আজ শেষ করি যে গান শুনেছিলাম তখনকার দিনে দেশবাসীর কম্বুকণ্ঠে—

> "ক্ষুদিরাম গেল হাসিতে হাসিতে ফাঁসিতে করিতে জীবন দান।
> পাপিষ্ঠ নরেনে বধিল কানাই, সত্যেন ধন্য করিল দেশ।"[১]

গানটির রচয়িতার পরিচয় যেমন আমাদের কাছে অজ্ঞাত, তেমনি সম্পূর্ণ গানটিও।

১। সাহানা দেবী, মৃত্যুহীন প্রাণ, ১৯৭০, পৃঃ ৭৪ ; অপর্ণা দেবীও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (১৯৭০) গ্রন্থে লিখেছেন, "সে সময় সমগ্র বাঙ্গলায় কি গান হোত জান। তখন আমরা সকলেই গাইতাম—

> "ক্ষুদিরাম গেল হাসিতে হাসিতে ফাঁসীতে করিতে জীবন শেষ।
> পাপিষ্ঠ নরেনে বধিল কানাই, সত্যেন ধন্য করিল দেশ।" পৃঃ ৩২

তবে যথাসম্ভব সব উৎস, যথা বিবিধ সঙ্গীত সংগ্রহ, স্বদেশী সঙ্গীতের সংকলন, গীতিকবিতার সংকলন, কবি বিশেষের রচনাবলী, সাময়িক পত্রপত্রিকা ইত্যাদি খুঁজে যে সকল গান বর্তমান আলোচনার অন্তর্গত হয়েছে, তার সংখ্যা চারশ'। এইসব রচনায় স্বদেশী গানের মুখ্য বৈশিষ্ট্য সমধিকভাবে বর্তমান। কাজেই সাধারণভাবে স্বদেশী গানের আলোচনা যখন করেছি, তখন এই সবগুলি গানকে মনে রেখেই আলোচনা করেছি।

॥ ৬ ॥

স্বদেশী গানের বৈশিষ্ট্য বিচারের উদ্দেশ্যে এই আলোচনায় একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক গান নিয়ে তার কথাবস্তু বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, গান নির্বাচনে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা সংখ্যানুপাতিক নয়। কারণ সঙ্গীত রচয়িতাদের রচিত গানের সংখ্যা সমান নয়, তাছাড়া তাঁদের রচনার গুণাগুণও সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়।

আমার গীতিসংগ্রহ থেকে একশ'টি গানকে আলাদা করে নিয়েছি অপরিকল্পিত ভাবে। এই একশ'টি গানে ব্যবহৃত শব্দ থেকে স্বদেশী গানের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। এই শব্দ তালিকার ওপর নির্ভর করে স্বদেশী গানের গীতিকারদের বা বাঙালীর স্বদেশ ভাবনার স্বরূপ যেমন খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি বিভিন্ন রচয়িতার স্বদেশপ্রেমের ব্যক্তিগত উপলব্ধির কতকগুলি সংকেত মেলে। এই একশ'টি গানকে প্রকৃতপক্ষে বাংলা স্বদেশী গানের ভূমিকা বা মুখবন্ধ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। স্বদেশী গান ও তার রচয়িতাদের পরিচয় দানের ক্ষেত্রে এই অংশের মধ্যেই সমগ্রতার স্বাদ পাওয়া যাবে।

এই একশ'টি গানের রচয়িতাদের মধ্যে স্বদেশী গানের খ্যাতনামা গীতিকার —রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, মুকুন্দদাস—প্রভৃতি আছেন, তেমনি স্বল্পপরিচিত বা অজ্ঞাত রচয়িতাও আছেন।

স্বদেশী গানের ইতিহাসের যুগবিভাগ যেমন সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট, যুগবিশেষের রচনাগুলি চিহ্নিত করা সহজ নয়। রচয়িতার জীবনী অজ্ঞাত না হলেও গান রচনার কাল অনেকক্ষেত্রেই অজ্ঞাত। কালের হিসেবে কবিকে বিশেষযুগের অন্তর্ভুক্ত করা অপেক্ষা গানের রচনাকাল অনুযায়ীই করা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু স্বদেশী গানের ক্ষেত্রে রচনাকাল নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি বলে নানা অনুমানের ওপর নির্ভর করে বা গানের প্রসঙ্গ বিচার করে তাদের যুগ নির্ণয়

করতে হয়। কাজেই কোনও বিশেষ যুগের সঙ্গীত রচয়িতা কতজন তা নিশ্চিতভাবে বলা মুস্কিল। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের মত কবিও আছেন, যাঁরা দুইযুগেই গান রচনা করেছেন। কাজেই তাঁদের বিশেষ পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা সহজ নয়। সেক্ষেত্রে যেযুগের গানে কবি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন বা বেশীসংখ্যক গান লিখেছেন, কবিকে সেই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মোটামুটিভাবে, এ একশ'টি গানের কবি-সংখ্যা হ'ল একুশজন, এছাড়া অজ্ঞাত কবিরচিত বিভিন্ন যুগের গানও আছে। অজ্ঞাত কবিরচিত গানের মধ্যে কয়েকটি যোগেশচন্দ্র বাগলের 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত'তে[১] (১৯৬৮) সংকলিত হওয়াতে সেগুলিকে হিন্দুমেলাপর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাকী গানগুলির বিষয়বস্তু থেকে তাদের রচনার আনুমানিক কাল ধরে নেওয়া হয়েছে।

স্বদেশী গানের বিষয়-বৈচিত্র্য তার অক্ষয় সম্পদ। দেশ, দেশবাসী ও দেশের ঐতিহ্য সংস্কৃতি নিয়ে অসংখ্য গীতিকারের মনে আনন্দ, বেদনা, গর্ব, হতাশা, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ—নানা বিচিত্র অনুভূতি জেগেছে এবং তা সবই স্বদেশী গানের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে আছে। এই একশ'টি গানের মাধ্যমে এই বৈচিত্র্যের আস্বাদ, অল্প হলেও, পাওয়া যাবে। এই গানগুলিকে রচনাকালানুসারে তিনটি পর্বে বিন্যস্ত করে, বিভিন্ন পর্বের স্বদেশী গান ও তাদের রচয়িতাদের পরিচয় লাভের যে প্রয়াস করেছি, তা একটি ছকের সাহায্যে প্রকাশ করা হ'ল।[২]

এই একশ'টি গানের মধ্যে স্বদেশী গানের প্রায় সব বিষয়বস্তু, সকল অনুভূতিই প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া গীতিকারদের কবিমানস, তাঁদের প্রকাশভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য—অর্থাৎ গঠনরীতি, ভাষা ও চিত্ররূপ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

একশ'টি গানে ব্যবহৃত শব্দগুলিকে বিশ্লেষণ করলে নানা কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, 'মা', 'জননী' শব্দগুলি স্বদেশী গানে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা, বলা যায় যে

১। যোগেশচন্দ্র বাগল (ক) জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত নামে প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫, এবং হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত নামে নূতন সংস্করণ ১৯৬৮।

২। পর পৃষ্ঠার ছক দ্রষ্টব্য।

বিষয়	প্রাক্‌-বঙ্গভঙ্গ যুগ														বঙ্গভঙ্গ যুগ							বঙ্গভঙ্গোত্তর যুগ	মোট
	সত্যেন্দ্রনাথ	গণেন্দ্রনাথ	দ্বিজেন্দ্রনাথ	রাজকৃষ্ণ রায়	সরলাদেবী	বঙ্কিমচন্দ্র	মনোমোহন বসু	আনন্দচন্দ্র মিত্র	গোবিন্দ দাস	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	গোবিন্দ রায়	কামিনী রায়	প্রমথ রায়চৌধুরী	অজ্ঞাত	রবীন্দ্রনাথ	রজনীকান্ত	অতুলপ্রসাদ	কালীপ্রসন্ন কাব্যঃ	মুকুন্দদাস	অশ্বিনী দত্ত	দ্বিজেন্দ্রলাল	নজরুল	
মাতৃভাষা																	ন					—	১
দেশের প্রকৃতি						১							১		৫	৩		ন			২	৩	১৬
বর্তমান দুর্দশা — অর্থনৈতিক দুরবস্থা		১	১	২			১	১	১	১	১				৪			১	২	১		৪	২১
ভবিষ্যৎ আশা					১							১			৩		১					—	৬
অতীত গরিমা	১			১	১			১	১					১		১	১				৩	২	১৩
সাম্প্রদায়িক ঐক্য — ঐক্য															৪				১			১	৬
শাসক বিদ্বেষ															১	২			৩			৩	৯
কর্মের উদ্দীপনা										১					৬	৬	১	১	৪	১		২	২২
দেশপ্রীতি (মিশ্রভাব)										১			১	১	২			১				—	৬
মোট সংখ্যা	১	১	১	৩	২	১	১	২	২	৩	১	১	২	২	২৫	১২	৪	৪	১০	২	৫	১৫	১০০

ভারতের জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় আন্দোলন 'হিন্দুজাতীয়তা' রূপে চিহ্নিত হয়ে অহিন্দুদের কাছে নিন্দিত হয়েছে। এই অভিযোগের যৌক্তিকতা বিচারেও এই শব্দতালিকা যথেষ্ট সহায়ক মনে হয়। এই তালিকায় দেখি হিন্দু দেবদেবী, পুরাণ, হিন্দু তীর্থস্থান প্রভৃতির নাম এবং পৌরাণিক ও হিন্দু ঐতিহাসিক ব্যক্তিনামের উল্লেখের প্রাধান্য রয়েছে। অন্যদিকে, 'কোরাণ' শব্দের একবার মাত্র উল্লেখ, 'মহম্মদ' শব্দের অনুল্লেখ এবং 'রহিম' শব্দটি নিতান্ত 'রামের' তুলনাবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দু'টি শব্দ ছাড়া মুসলিম সংস্কৃতি বা ইসলাম ধর্মের কোনও উল্লেখ স্বদেশী গানে নেই। উপরন্তু 'বিদেশী শাসক' অর্থে 'যবন' শব্দটিও গানে প্রযুক্ত হয়েছে। এইসকল নানা কারণে স্বদেশী যুগে বা মুসলিম লীগের শাসনকালে অহিন্দু সম্প্রদায় যে এরমধ্যে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার লক্ষণ দেখে তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে, সেই আশঙ্কা অমূলক নয়।

কবিদের ব্যক্তিমানসের স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কারেও এই শব্দ বিশ্লেষণ উপযোগী। দেশমাতৃকা বা শাসকবর্গের প্রতি সম্বোধনসূচক শব্দগুলি বিচার করলে দেখি, মুকুন্দদাস ও নজরুলের গানে যত উত্তেজনা ও বিদ্বেষপ্রসূত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, অন্যদের গানে তা হয়নি।

এই শব্দ বিশ্লেষণ পদ্ধতি স্বদেশী গানের শব্দসম্পদ, কল্পনা ও প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্যের পরিচয় দেয়। সমার্থক শব্দের সন্ধানও পাওয়া যায় এই তালিকায়।

বিশ্লেষণের এই পদ্ধতি নানা বিষয়ে সহায়ক হলেও এর সংকীর্ণতা সম্বন্ধে আমি সচেতন। একশ'টি গান অবলম্বন করে কোন কবির রচনা-বৈশিষ্ট্যের সমগ্র পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রত্যেক কবির গৃহীত গানের সংখ্যা সমান নয়, কাজেই শব্দ ব্যবহারের সংখ্যাগত তুলনামূলক বিচারের দ্বারা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যথা, রবীন্দ্রনাথের গানে 'মা' শব্দের ব্যবহার হয়েছে ৪৮ বার ; রজনীকান্তের গানে শব্দটি ২০ বার ব্যবহৃত। কিন্তু এই সংখ্যার তারতম্য দেখে রজনীকান্তের দেশভক্তি রবীন্দ্রনাথের থেকে ন্যূন, তা বলা যাবে না। এখানে রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা ২৫, অন্যদিকে রজনীকান্তের গান মাত্র ১২টি। কাজেই সংখ্যার তারতম্য এক্ষেত্রে কবি বিশেষের ব্যক্তিমানসের সঠিক পরিচয় দেবে না।

এই একশ'টি গানকে গ্রহণ করেছি শুধু পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার জন্য এবং গানের রূপ ও রীতি বিচারের ক্ষেত্রে স্বদেশী গানের বিশাল শাখার প্রত্যেকটি

গানের প্রতি সমান দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব নয় বলেই। শুধু ষষ্ঠ পরিচ্ছেদেই এই একশ'টি গানকে আলোচনার ভিত্তি করা হয়েছে।

ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা আলোচনার ক্ষেত্রে যেমন অনেক সময় একটি case study করা হয় এবং তার থেকে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করা হয়, তেমনই বাংলা স্বদেশী সঙ্গীত আলোচনার ক্ষেত্রে এই একশ'টি গানকে গ্রহণ করা হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে এই পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ নিতান্ত নিরর্থক নাও হতে পারে।

॥ ৭ ॥

স্বদেশী গানের বিষয় বিশ্লেষণে লক্ষ্য রেখেছি কোন্ কোন্ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবনা গানগুলির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমকালীন প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ভাবনাই গানগুলিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হ'ল যে গানগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক শোষণ চিন্তার প্রকাশ। যে economic drain-এর কথা অর্থনীতিবিদ্‌রা বহু তথ্য সহকারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, কোন কোন গানে যেন তারই পূর্বাভাষ, স্বদেশী গানের এইসব চিন্তা বর্তমান নিবন্ধের দু'টি পরিচ্ছেদে বিশ্লেষিত হয়েছে। এরই সঙ্গে যুক্ত তৎকালীন ইতিহাস চিন্তা। অতীত ভারতবর্ষের প্রতি যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখা দিয়েছিল এবং বর্তমান ভারতবর্ষের সম্পর্কে যে বোধ সাধারণ মানুষকে পীড়িত ও ব্যথিত করেছিল—তার একটি নিগূঢ় প্রকাশ দেখি স্বদেশী গানে। সেই সঙ্গে আরো বিচিত্র সমস্যা যা ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল তা নানাভাবে স্বদেশী গানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। এইসব প্রসঙ্গগুলি ঐতিহাসিক পট-ভূমিকায় দেখার চেষ্টা করেছি, আবার ভাষা ও রীতির মধ্যেও তাদের আবির্ভাবকে সন্ধান করেছি। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে এই গানগুলিতে ব্যবহৃত চিত্রকল্পের কথা।

প্রাক্‌বঙ্গভঙ্গ যুগের গানে দেশপ্রেম মূলতঃ দেশের বর্তমান দুঃখদৈন্যের বেদনাবোধ এবং অতীত গৌরবের উপলব্ধিকে আশ্রয় করেছে। গানে ব্যবহৃত চিত্রকল্প এই দু'টি অনুভূতিরই দ্যোতনা করে। এই পর্বে দেশমাতৃকার যে মূর্তি পাই তা প্রধানতঃ দু'টি—এক, দেশের দুঃখিনী জননীমূর্তি, অন্যটি ঐশ্বর্য্যময়ী দেবীমূর্তি। দেশের দীনমলিন অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে অন্ধকারাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বর্ণনায়, দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দিনে।

আবার বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব জাতীয় জীবনে যে ভাবের উন্মাদনা নিয়ে এসেছিল, চিত্রকল্পগুলিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। নদীতে বন্যা বা জোয়ার, নৌকাযাত্রা, সম্মিলিত ও সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে চলার ছবি দেখি গানে। এযুগের রাজনৈতিক দুর্যোগের ছবি ফুটেছে ঝড়, নদীতে তুফান, প্রাকৃতিক বিপর্যয়—ইত্যাদির মাধ্যমে। কিছু সংখ্যক গানে ভবিষ্যৎ আশার সুর ঝঙ্কৃত হয়েছে সূর্যোদয়, উষার আলোকরেখায়।

বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরের পর্বে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে, ফলে দেশাত্মবোধের আদর্শও বিবর্তিত হয়েছে। দেশপ্রেমের চেতনায় মাধুর্য্যের জায়গা নিয়েছে তিক্ততা ও কঠোরতা। চিত্রকল্পগুলিতে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। দেশমাতৃকা এখানেও দেবীরূপে উপস্থিতা—কিন্তু তা সর্বৈশ্বর্য্যময়ী মূর্তি নয়। নগ্নিকা, ভীষণা, রণরঙ্গিণী কালীর মূর্তি। পৌরাণিক দেবীর উল্লেখের মধ্যে চামুণ্ডা, চণ্ডী, মাতঙ্গী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী প্রভৃতি অরিসংহারকারী, উগ্রা দেবীদের মূর্তি পাই। প্রাকৃতিক চিত্রকল্পের মধ্যেও দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকার রাত্রি, যুদ্ধক্ষেত্র, শ্মশানভূমি, কারাগার—প্রভৃতি ছবিই প্রধান হয়ে ফুটে উঠেছে। বিপ্লবী ও 'সন্ত্রাসবাদী' দেশপ্রেমিকের প্রাণে গানগুলি যে উত্তেজনার আগুন জ্বালাতে সক্ষম হয়েছিল, তার একটি কারণ সম্ভবতঃ এইসব চিত্রকল্পের সজীবতা।

স্বদেশী গানের আলোচনায় দু'টি দিক সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য—একটি হ'ল জাতীয় আন্দোলনে গানগুলির ভূমিকা, আর একটি হ'ল কাব্যধারায় তাদের স্থান। এই দু'টি দিক দিয়েই বাংলা স্বদেশী গানগুলির বিচার করলে তবেই তাদের সমগ্র পরিচয় গ্রহণ করা সম্ভব।

॥ ৮ ॥

স্বদেশী গান যেমন দীর্ঘকাল ধরে, অজস্র সংখ্যায় রচিত হয়েছে, তেমনি বহু সংগীত-সংগ্রহ গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।[১] বহু গান একাধিক সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহুল গীত, পরিচিত গানগুলিই গৃহীত হয়েছে—হয়ত গায়কদের কাছেই গানগুলি সংগৃহীত। সাহিত্যিক কারণে গৃহীত হলে বিভিন্ন পর্বের বা ব্যক্তিবিশেষের রচনার সম্পূর্ণ সংগ্রহই গৃহীত হ'ত।

১। 'জাতীয় সংগীত' ১ম ভাগ (১৮৭৬); 'শতগান' (১৯০০); 'বন্দেমাতরম্' (১৯০৫); 'বাঙ্গালীর গান' (১৯০৬) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

যাহোক্—এই গবেষণার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে আহরিত সব স্বদেশী গানগুলি একত্র সংগৃহীত থাকলে গানগুলির এবং তাদের রচয়িতাদের সামগ্রিক পরিচয় পাবার সম্ভাবনা থাকবে—এই আশায় গানগুলিকে 'পরিশিষ্ট' অংশে সংযোজিত করা হ'ল। কোন ভাবে এই সংগ্রহ অন্যের কাজের সহায়ক হ'লে নিজের শ্রম সফল মনে করব।

গানগুলিকে রচয়িতাদের নামের আক্ষরিক ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করা হ'ল। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানগুলি 'গীতবিতান'-এর স্বদেশ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সঙ্গীতপ্রিয় বাঙ্গালীর কাছে তা সহজলভ্য, এজন্য সেই গানগুলি পূর্ণভাবে প্রকাশিত না করে শুধুমাত্র প্রথম চরণগুলি দেওয়া হ'ল। এছাড়া আরও কিছু গানেরও প্রথম চরণ এবং আকর গ্রন্থের উল্লেখ ক্রোড়পঞ্জীতে দেওয়া হয়েছে, যেগুলি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা কারণবশতঃ এখানে প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না।

॥ ৯ ॥

গবেষণার কাজে আমি আমার বিভাগীয় অধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক শ্রীশিশিরকুমার দাশের কাছে প্রেরণা ও নির্দ্দেশ পেয়েছি।

এছাড়া বহু প্রবীণ রাজনৈতিক কর্মী, অধ্যাপক, চিন্তাবিদ্ ও সঙ্গীত শিল্পীর সহায়তা লাভ করেছি। তাঁদের মধ্যে শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, ৺বিনয় রায়, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ, শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল, শ্রীসুমিত সরকার, শ্রীসুধীর চন্দ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমার কলেজ কর্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। শ্রীজ্যোতিষ ঘোষের আন্তরিক সহযোগিতার কথাও স্মরণ করছি।

সবশেষে, গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণ বিভাগ।

এঁদের সকলের ঋণ কৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করছি।

দিল্লী

জানুয়ারী, ১৯৮৩   গীতা চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বদেশী গানের পটভূমি ও পরিচয়

১

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের সংস্পর্শে এসে, শাসক-শাসিতের সম্পর্কের উপলব্ধির মধ্য দিয়েই বাঙালীর মনে স্বদেশপ্রেমের জন্ম হয়। স্বভাবতঃই এই উপলব্ধি ছিল অনেক পরিমাণে পরাধীন জাতির বেদনাবোধমিশ্রিত। এই বেদনাবোধ থেকেই স্বদেশবিষয়ক সাহিত্যের সূচনা হয় বাংলাদেশে। এই প্রসঙ্গে, ইংরাজের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ও স্বদেশপ্রেমের জাগরণ—এই দু'টি ঘটনার মধ্যে কোনও পারস্পরিক সম্পর্ক আছে কিনা, তা আমাদের বিচার করে দেখা দরকার।

ইংরেজ শাসন ও ইংরেজের প্রতি বাঙালীর প্রাথমিক মনোভাব ছিল শ্রদ্ধাপূর্ণ। ইংরেজশাসন মুঘল-রাজত্বের শেষদিকের বিশৃংখলা থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করেছিল, তাই ইংরাজকে বন্ধুরূপে বরণ করে নিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী হিন্দু। 'ইংরাজ মিত্ররাজা'[১], বিদেশী হলেও শত্রু নয়, এই ধারণা পোষণ করেছে শিক্ষিত মানুষ। এছাড়া ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে, ইংরেজের সাহিত্য, দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেছে বাঙালী। অন্যদিকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জাতি বিদেশীর অধীনতার বেদনা উপলব্ধি করে শাসকবর্গের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছে। এই বিরূপতার অন্যান্য কারণও ছিল। পলাশী যুদ্ধ থেকে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত ভারতের একশত বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে ইংরাজের ভূমিকা

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আনন্দমঠ, ১৮৮২, ৪।৮ পৃঃ ৭৮৮

ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইংরাজ আপন সামরিক শক্তি, অর্থশক্তি ও বণিকবুদ্ধি নিয়ে ভারতবাসীর ওপর আধিপত্য স্থাপনে সচেষ্ট হ'ল, কিন্তু ভারতবাসীর দুঃখকষ্ট সম্বন্ধে উদাসীন থাকল। ফলে, ইংরাজের প্রতি বাঙালীর আশাভঙ্গের কারণ ঘটেছিল। এছাড়া, ভারতের অর্থনৈতিক অবনতি, সামাজিক দুর্দ্দশার কবলগ্রস্ত হ'য়ে দেশবাসীর যে নির্জীব ও দুর্বল অবস্থা হ'ল, তারজন্যও দায়ী করা হ'ল ইংরাজ শাসককে। ধীরে ধীরে 'জাতিবৈর'র মনোভাব শিক্ষিত বাঙালীর মনে দানা বেঁধে উঠতে লাগল। ইংরেজের প্রতি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর যে আপাতবিরোধী দ্বৈতচিন্তার মনোভাব ছিল, তার কারণ এখানেই নিহিত রয়েছে। পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনের যুক্তিচিন্তায় মুগ্ধ বাঙালী ইংরেজের অনুকরণ ও অনুসরণে আগ্রহী, অন্যদিকে শাসকের ভূমিকায় ইংরেজের আচরণে তারা ক্ষুব্ধ। এভাবে বিদেশী শাসকের প্রতি বিরূপতা দেশবাসীকে দেশের প্রতি মনোযোগী করে তুলে স্বদেশপ্রেম জাগরণের পট প্রস্তুত করল।

এর সঙ্গে এসে যুক্ত হ'ল বহির্বিশ্বের নানা রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া। বাঙালীর স্বদেশপ্রেম জাগরণে এদিকটিও তুচ্ছ ব্যাপার নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত আমেরিকা-ইউরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ উদ্বোধনের বিভিন্ন ঘটনা বাঙালী শিক্ষিত সমাজকে ভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল।[১] নানা সামাজিক ঘটনার প্রভাবে বাঙালীর সামাজিক

১। রামমোহন রায়ের ওপর এসকল ঘটনার প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় নানাবিধ ঘটনায়। যেমন, "স্বেচ্ছাচারী রাজার নিকট হইতে এক নিয়মানুগ শাসনতন্ত্র আদায় করিয়াও নেপল্‌সবাসিগণ অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ কর্তৃক পুনরায় দাসত্বপাশে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়—ভারতবর্ষে এই সংবাদশ্রবণে রামমোহন মনে মনে এতই আহত হন যে, ১১ আগস্ট ১৮২১ তারিখে সিল্ক বাকিংহামকে লেখেন :

"...I consider the cause of the Neapolitans as my own, and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful."...

"স্পেনের স্বেচ্ছাচার হইতে দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলির

চিন্তার ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার চেতনা জেগে উঠল। দেশের ধর্ম, সংস্কৃতির প্রতি গভীর আগ্রহ ও মমতা গড়ে ওঠার অবকাশ এল। খৃষ্টান মিশনারী পাদরীদের হিন্দুধর্মের অসারতা প্রমাণের চেষ্টার বিরোধিতা করতে গিয়ে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের অনুসন্ধান ও প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধিজীবী বাঙালী মনোনিবেশ করলেন।[১] অন্যদিকে এশিয়াটিক সোসাইটির (১৭৮৫) প্রতিষ্ঠা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার অনুরাগ, বাঙালী বুদ্ধিজীবীকে প্রাচীন ইতিহাস, ধর্ম সাহিত্য চর্চায় আকৃষ্ট করল। প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার এই ধারাটি দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধকে পুষ্ট করে তুলতে সহায়তা করল।

হিন্দু কলেজের (১৮১৭) ইংরাজী শিক্ষাপুষ্ট 'ইয়ং বেঙ্গল' দল ডিরোজিওর স্বাধীন চিন্তাশীলতা ও সংস্কারমুক্তির আদর্শে যেমন অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তেমনি স্বদেশপ্রেমের অঙ্কুরও দেখা দিয়েছিল তাঁদের ইংরেজিতে লেখা কবিতা ও গল্পের মধ্যে। কাশীপ্রসাদ ঘোষের ইংরেজি কবিতায় দেখি তিনি ভারতীয় সামাজিক, ধর্মীয় ঐতিহ্যের পরিমণ্ডলটিকে স্বীকার করেছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা ও অবসানের পর্বমধ্যে কয়েকটি ঘটনার প্রভাব বাঙালী চিত্তকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল।

মুক্তির সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া রামমোহন স্বভবনে বহু ইউরোপীয় বন্ধুকে আমন্ত্রণ করিয়া ভোজে আপ্যায়িত করেন।" ..."ফ্রান্সে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে যে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হয়, তাহাতে তিনি অতিশয় আনন্দিত হন। ইংলণ্ডে যাইবার পথে তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে, তখন দুইটি ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতাসূচক নূতন তিন রঙের নিশান উড়িতেছে দেখিয়া ভাঙ্গা-পা গ্রাহ্য না করিয়া, সেই জাহাজগুলিতে গিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করেন ও ফিরিবার সময় 'ফ্রান্স ধন্য, ধন্য, 'ধন্য' বলিতে থাকেন।" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ১ম খণ্ড, ১৬শ সংখ্যা, ৫ম সং, ১৯৬০ পৃপৃঃ ৬৪-৬৫ দ্রষ্টব্য।

১। Das, Sisir Kumar, *The Shadow of the Cross*, Delhi, 1974

"এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন, নীল আন্দোলন ও তদ্বিষয়ে হাঙ্গামা ও 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে' প্রতিবাদ ··· হিন্দুসমাজের মধ্যে রক্ষণশীলদের জাগরণ, ধর্ম ও সমাজ সংরক্ষণের প্রয়াস, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্রুত ব্যাপ্তি ···"[১] বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঙ্গসমাজের জাগৃতির লক্ষণ প্রকাশ করে।

বহির্বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনা ও দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক নানা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বাঙালীর চিন্তা ও কর্মে নূতনত্বের যে সুর লাগল সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই নূতন চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ্য করি। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটক নীল আন্দোলনে পীড়িত, গ্রামবাংলার অশিক্ষিত চাষীর দুঃখ-বেদনাকে ভাষা দিল। সামাজিক চিন্তা যে ক্রমে দেশবাসীকে দেশাত্মবোধের দিকে পরিচালিত করতে সমর্থ হচ্ছে তা বোঝা গেল। এই অভিনব চিন্তাশক্তি প্রকাশের অপর একটি ধারা হ'ল যে, দেশ সম্পর্কে কয়েকটি নতুন উপলব্ধি ক্রমে স্পষ্টরূপ গ্রহণ করল। দেশের নিসর্গশোভা যেমন দেশবাসীর দৃষ্টিগোচর হ'ল, তেমনি দেশের ভাষা সম্পর্কেও চেতনা জাগল। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার জন্য গর্ববোধ এই নবচেতনার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'মাতৃভাষা' ও 'স্বদেশ' কবিতা, নিধুবাবুর গান 'বিনা স্বদেশী ভাষা, পূরে কি আশা'[২] মধুসূদনের 'বঙ্গভাষা' (১৮৬১) 'বঙ্গভূমির প্রতি' (১৮৬২), এবং 'ভারতভূমি' কবিতা এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। এর সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুঃখদুর্দ্দশা, বেদনামলিন অবস্থাও হ'ল কাব্যের বিষয়। ডিরোজিও—যিনি ভারতবর্ষকে নিয়ে

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পূঃ উঃ, পৃঃ ৩৩-৩৪

২। রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) গীতাবলী, ১৮৯৬ (১ম সং), পৃঃ ১০৪

প্রথম কবিতা লেখেন, তিনি এই লুপ্ত গৌরব, বেদনামলিন ভারতবর্ষের বন্দনা করেন।

"My country ! in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is thy glory, where that reverence now ?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou,
Thy ministrel hath no wreath to weave for thee,
Save the sad story of thy misery !
Well let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never more behold ;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country ! one kind wish for thee ![১]

স্বদেশকে নিয়ে ভারতীয় রচিত প্রথম কবিতাটিতে দেখি স্বদেশের 'গৌরবরবি গেছে অস্তাচলে'। এই কবিতাটি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর স্বদেশচেতনার স্বরূপটিকে তুলে ধরেছে। পরাধীন দেশের মানুষের স্বদেশচিন্তার উপলব্ধি ও স্বাধীনদেশের মানুষের স্বাদেশিকতায় মৌলিক প্রভেদ আছে। দেশমাতৃকার বর্তমান ঐশ্বর্য্য, গৌরব সম্পর্কে গর্ববোধ, শীর্ষোন্নত দেশের শক্তি ও সামর্থ্যের উপলব্ধি তাই বাংলা স্বদেশবিষয়ক সাহিত্যের প্রাথমিক

১। এই কবিতার অনুবাদ "স্বদেশ আমার কিবা জ্যোতির মণ্ডলী"। অনুবাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' (১৮৭৬) দ্রষ্টব্য। কবিতাটি সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন "This poem of Derozio published in 1827, may be regarded as the first patriotic poem written in India" : Mazumdar, R. C. *op. cit.*, Vol. 1, p. 325

যুগের রচনায় ততটা উপজীব্য হয়ে ওঠেনি, যতটা প্রকাশ পেয়েছিল পরাধীন, হৃতশ্রী, লুপ্তগৌরব, বেদনামলিন স্বদেশের বন্দনা।

স্বদেশবিষয়ক সাহিত্যরচনার এই পটভূমিতেই বাংলাসাহিত্য গড়ে উঠতে লাগল। দেশপ্রেমের উদ্দীপনা ও স্বাধীনতার সুর বাংলাকাব্যে ধ্বনিত হ'ল। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮), মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বীরবাহু' (১৮৬৪) কাব্যে স্বদেশপ্রীতিমূলক উচ্ছ্বাস, জাতি-প্রীতি ও স্বদেশবন্দনার আদর্শ প্রকাশ পেল। "উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জনচিত্তে দেশানুরাগ জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টায় বাঙালী এক নতুন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে। সভা-সমিতির আলোচনায় আর সাহিত্যের মধ্যে এতদিন যে প্রচেষ্টা গণ্ডিবদ্ধ ছিল তা বহুমুখী আর ব্যাপকরূপ লাভ করল 'চৈত্রমেলা' বা 'হিন্দুমেলার' প্রবর্তনে।"[১] ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু 'শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভা সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে' "Prospectus for the Promotion of National Feeling Among the Educated Natives of Bengal" নামে একটি অনুষ্ঠানপত্র রচনা করেন এবং সেটি নবগোপাল মিত্রের 'ন্যাশনাল পেপারে' ছাপা হয়। এই অনুষ্ঠানপত্রখানি পাঠ করে সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের মনে এর আদর্শে একটি জাতীয়সভা প্রতিষ্ঠার কল্পনা জাগে। তারই ফলে নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে, ঠাকুরবাড়ীর এবং মনোমোহন বসু প্রভৃতির সহযোগিতায় ১৮৬৭ সালের ১২ই এপ্রিল (১২৭৩, চৈত্র সংক্রান্তি) 'হিন্দুমেলার' প্রতিষ্ঠা হয়।

দেশের দুঃখদুর্দশা প্রতিকারকল্পে শিক্ষিত বাঙালী স্বচেষ্টায় স্বদেশের উন্নতিবিধান, স্বাতন্ত্র্যবোধ রক্ষা ও স্বাবলম্বনের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। 'হিন্দুমেলা' এই পুনরুজ্জীবনবাদী সংগঠন প্রচেষ্টার রূপায়ন। এই সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় শিল্প,

১। সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—পূঃ উঃ পৃঃ ৭

সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ বাঙালী চিন্তাশীলেরা বুঝেছিলেন দেশের দুঃখদুর্দ্দশাই প্রধান সমস্যা, কিন্তু এও বুঝেছিলেন যে, সেই সমস্যা দূর করার জন্য প্রথমে দরকার স্বদেশবোধ। সেই স্বদেশবোধ জাগরণের জন্য দরকার দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ। বলাই বাহুল্য দেশের ইংরেজি শিক্ষিত যুবকেরা দেশের সাহিত্য, ধর্ম, শিল্প, প্রভৃতি বিচিত্র ঐতিহ্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন না। সেই প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যেই এই সভার প্রতিষ্ঠা। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতমানসে ইংরাজের প্রতি যে দ্বৈত মনোভাব ছিল, তা এখানে প্রকাশিত। এই মেলার পরিকল্পনার মধ্যে শাসকবিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি, আবার শাসকগোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য ঘোষণাও করা হয়নি

প্রাক্-হিন্দুমেলাপর্বে যে স্বদেশানুরাগের অংকুরোদ্গম হচ্ছিল, স্বদেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি, দেশের দুঃখদুর্দ্দশায় বেদনাবোধ, দেশের অতীত গৌরবের অনুসন্ধান, কর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগ্রত প্রেরণা ইত্যাদি নানা বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে তা আরও পরিণত রূপ লাভ করল এই পর্যায়ে। তৎকালীন জাতীয়তাবোধের স্ফুরণের অন্যতম মাধ্যম এবং জাতীয়তাবোধের প্রকাশ হ'ল এযুগে রচিত স্বদেশী গানগুলিতে।

২

কংগ্রেসের জন্মের ১৮ বৎসর আগে ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলার সূচনা। ঐ বৎসরের ১২ই এপ্রিল বেলগাছিয়ার ডানকিন সাহেবের উদ্যানে হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন হয়। "প্রথম তিন বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তিতে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়, এ কারণ তখন ইহা চৈত্রমেলা নামে পরিচিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে 'হিন্দুমেলা' নামেই ইহা সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে।"[১]

১। যোগেশচন্দ্র বাগল পূঃ উঃ, পৃঃ ৫

রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' (১৯১২, ২য় সং) এই মেলা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "শ্রীযুক্তবাবু নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করাতে হিন্দুমেলার ভাব তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়।... উহা আমার প্রস্তাবিত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র আদর্শে গঠিত হইয়াছিল।'[১] 'স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা' ও 'স্বদেশের উন্নতি সাধন করাই' ছিল মেলার উদ্দেশ্য। বাঙালীর মনের জাতীয়তাবোধের প্রথম, সুস্পষ্ট স্বাক্ষর হ'ল 'হিন্দুমেলা'। 'ন্যাশনাল পেপার', জাতীয় সভা, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় শিল্প, জাতীয় ব্যায়ামশালা—সকল ক্ষেত্রেই জাতীয়তাবোধের প্রতিষ্ঠা করেন নবগোপাল মিত্র। "সেকালে তাঁহার নাম দাঁড়াইয়া গিয়াছিল 'ন্যাশানাল নবগোপাল'। একজন বলিয়াছিলেন 'যে তাঁহার ন্যাশনাল ধাত' ছিল। "তাঁহার মুখে 'জাতীয়, জাতীয়, জাতীয়'। তাঁহার সকল কার্য্য 'জাতীয়, জাতীয়, জাতীয়'। তাঁহার প্রচারিত সংবাদপত্রের নাম 'জাতীয়'। তাঁহার যত্নে স্থাপিত সভার নাম 'জাতীয়'। বিদ্যালয়ের নাম 'জাতীয়'। ব্যায়ামশালার নাম 'জাতীয়'। মেলার নাম 'জাতীয়'। তিনি জাগ্রত 'জাতীয়' লইয়াই বিব্রত। তিনি সুপ্তাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন 'জাতীয়'। তিনি জাগ্রত 'জাতীয়'।"[২] "এই মেলার উদ্দেশ্য, সঙ্গীতের মর্ম্ম, সংবাদপত্রের নাম প্রভৃতি হইতে একটা বিষয় বুঝিতে পারা যায় যে তখন সকলেই 'ন্যাশানাল' ও ভারতকে সমার্থক বলিয়া জানিত, অন্য কোন ক্ষুদ্রতর সত্তার অস্তিত্ব আমাদের কল্পনাতেও ছিল না।"[৩] বাঙালীমানসে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনে

১। রাজনারায়ণ বসু আত্মচরিত, ১৯১২, পৃঃ ২৩৮
২। মনোমোহন বসুর মধ্যস্থ পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩। ফাল্গুন, ১২৮০) নবগোপাল মিত্র সম্পর্কে প্রশংসামূলক প্রবন্ধ থেকে যোগেশচন্দ্র বাগল (ক) কর্তৃক উদ্ধৃত। পূঃ উঃ, পৃঃ ৬০
৩। প্রমথনাথ বিশী—চিত্রচরিত্র, ১৯৬৫, পৃঃ ১২১

নবগোপাল মিত্রের আদর্শ কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার উল্লেখ পাই বিপিনচন্দ্র পালের উক্তিতে। "নবগোপাল মিত্র আমাদিগকে নিজেদের সভ্যতা এবং সাধনার গৌরবে গরীয়ান করিয়া সত্য স্বাজাত্যাভিমানের প্রেরণা দিয়াছিলেন।" ...তাঁহার নিকটেই আমরা জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজমের প্রথম প্রেরণা পাইয়াছিলাম।[১] শুধু যে নবগোপাল মিত্র নিজে জাতীয়ভাবে ভরপুর ছিলেন, তা নয়। "নবযুগের গোড়াপত্তন করলেন নবগোপাল মিত্তির। চারদিকে ভারত, ভারত, ভারতী কাগজ বের হ'ল। বঙ্গ বলে কথা ছিল না তখন। ভারতীয়ভাবের উৎপত্তি হ'ল তখন থেকেই, তখন থেকেই সবাই ভারত নিয়ে ভাবতে শিখল।"[২]

হিন্দুমেলার চতুর্দ্দশটি অধিবেশন (১৮৬৭-১৮৮০) অনুষ্ঠিত হয়েছিল, জন্মদিনে কেবল কতিপয় বান্ধব ও প্রতিবেশীমাত্র উৎসাহী ছিলেন। অর্থাৎ "সে যেন নিজ বাটি ও পাড়াটি বলিয়া শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করা"।[৩] কিন্তু ক্রমে এই মেলার ভাবাদর্শ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ল এবং দেশবাসীর মনে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করে তুলল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালী তথা ভারতবাসীর মনে স্বাজাত্যবোধ ও স্বাবলম্বনবৃত্তির উন্মেষে হিন্দুমেলার দান সম্বন্ধে নানা মন্তব্য সমকালীন প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা ও বক্তৃতায় বিধৃত আছে।[৪] রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতির' (১৯১২) স্বাদেশিকতা অধ্যায়ে হিন্দুমেলা প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> "আমাদের বাড়ীর সাহায্যে 'হিন্দুমেলা' বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে

১। বিপিনচন্দ্র পাল পূঃ উঃ, পৃঃ ২৬৭-৬৮
২। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘরোয়া, ১৯৬২, পৃঃ ৭২
৩। মনোমোহন বসু বক্তৃতামালা, যোগেশচন্দ্র বাগল পূঃ উঃ, পৃঃ ৫ এ উদ্ধৃত।
৪। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস (১৯১৫), শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ১ম সং (১৯০৪), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূঃ উঃ।

নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয়সংগীত 'মিলে সবে ভারতসন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।"[১]

হিন্দুমেলার তৃতীয় অধিবেশনের (১৮৬৯) বিবরণে দেখা যায় যে শিল্পকর্মের জন্য মহিলাদের 'হিন্দুমেলা' নামাঙ্কিত এক একটি রৌপ্যপদক দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। "এবারেও সাহিত্য-বিভাগে কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত হয়। রজনীকান্ত গুপ্ত এ বৎসর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই অধিবেশনে কলিকাতার শ্যামবাজার, শ্যামপুকুর ও বাহির সিমুলিয়া ব্যায়াম-বিদ্যালয় হইতে ব্যায়ামকুশলীরা কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ হিন্দুমেলা নামাঙ্কিত পদক লাভ করিয়াছিলেন।"[২] ১৮৭৫ সালের হিন্দুমেলার অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া যায় রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিতে। "১৮৭৫ সালে যে মেলা হয় তাহার সভাপতির কার্য্য আমি সম্পাদন করি। ঐ মেলা কলিকাতার পার্সীর বাগান নামক বিখ্যাত উদ্যানে হইয়াছিল। এই মেলা উপলক্ষে বরদাবাসী সুবিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সের গান হয় এবং যশোহরের নড়ালবাসী জমিদার রায়চরণ রায় ব্যাঘ্র শিকারে নৈপুণ্যের জন্য এক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন। আমি সভাপতিস্বরূপে ঐ পদক তাঁহার গলায় পরাইয়া দিই।"[৩]

হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের মনে কোন অস্পষ্টতা ছিল না। মেলার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও এই মেলার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়েছিল। সম্পাদকীয় বিবরণ বা আত্মজীবনী গ্রন্থে এই মেলার কয়েকটি উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবনস্মৃতি, ১৯৬২ পৃঃ ৭৮
২। যোগেশচন্দ্র বাগল—পূঃ উঃ, পৃঃ ১৪
৩। রাজনারায়ণ বসু—পূঃ উঃ, পৃঃ ২১৫

মেলা উপলক্ষে যে জনসমাবেশ হ'ত, তার লক্ষ্য ছিল—"আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোন বিষয়সুখের জন্য নহে, কেবল আমোদপ্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য।"[১]

রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "The special features of the gathering were patriotic songs, poems and lectures, a detailed review of the political, social, economic and religious conditions of India . "[২] হিন্দুমেলার উদ্যোক্তারা অখণ্ডভারত ও ভারতীয় মহাজাতি গঠনের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, নয় বৎসর পরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' এবং প্রায় কুড়ি বৎসর পরে কংগ্রেসের আদর্শে তারই পরিণত রূপ দেখা যায়।

হিন্দুমেলার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল স্বাবলম্বন বা আত্মনির্ভরতার গুরুত্ব উপলব্ধি। মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, "আত্মনির্ভর ইংরাজ জাতির একটি প্রধান গুণ। আমরা সেই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ··· যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।"[৩] দেশীয় শিল্প, সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ দান, কৃষি ও দৈহিক শক্তি চর্চা প্রভৃতি বিষয়ে দেশবাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট হতে লাগল এই সময় থেকে।

তৃতীয়তঃ দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দেশের দৈন্যদুর্দ্দশার প্রতিকারে দেশবাসীর প্রচেষ্টার ওপর প্রথম জোর দেওয়া হয় হিন্দুমেলায়। দেশীয় শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রসারের প্রয়োজনীয়তার কথা এই সময়েই প্রথম ঘোষিত হ'ল।

১। যোগেশচন্দ্র বাগল—পূঃ উঃ, পৃঃ ৭
২। Majumdar, R. C.—*op. cit.*, p. 330
৩। যোগেশচন্দ্র বাগল—পূঃ উঃ, পৃঃ ৭-৮

চতুর্থতঃ হিন্দুমেলায় বিশেষভাবে বলা হল জাতীয় ঐক্যের আদর্শের কথা। আত্মনির্ভরের মতই জাতীয় ঐক্যের চিন্তাও ইংরেজের ইতিহাস থেকেই বাঙালী গ্রহণ করতে চাইল। স্বদেশীয়দের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষা না হ'লে আত্মনির্ভরতা, স্বাজাত্যবোধ, স্বাবলম্বন বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন—কিছুই সম্ভব নয়, এই মতও প্রচারিত হ'ল হিন্দুমেলায়।

পঞ্চমতঃ হিন্দুমেলায় বিদেশী শাসকের প্রতি 'জাতিবৈর'র মনোভাব বা বিরোধিতার আদর্শ ছিল না। অন্তত জাতিবৈরর প্রসঙ্গ নেই। কিন্তু দেশের অতীত গৌরবময় ঐতিহ্যের স্মৃতিচারণ করে বর্তমান দুঃখদৈন্যের কথা বারবার উঠেছে। দেশকে নিয়ে ভবিষ্যত সুখস্বর্গ রচনার বীজ বপন করা হয়েছে।

হিন্দুমেলার এই সকল আদর্শ গানে প্রকাশ পেয়েছে। হিন্দু-মেলাতেই সর্বপ্রথম 'জাতীয়সংগীত' রচিত ও গীত হয়েছিল। মেলার বিভিন্ন অধিবেশনে অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে সে সব গান যেমন গীত হয়েছে, তেমনি স্বদেশীসাহিত্য চর্চারও ছিল তা অঙ্গীভূত। এই গানগুলি প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দুমেলা'র উদ্দেশ্য, আদর্শ ও ধ্যানধারণারই অভিব্যক্তি।

বাংলাসাহিত্যে জন্মভূমির স্তুতি বা বন্দনামূলক কবিতা ইতিপূর্বেই রচিত হয়েছে। কিন্তু গানের মাধ্যমে দেশমাতৃকার চরণে ভক্তি ও অনুরাগের অঞ্জলি প্রদান হিন্দুমেলা থেকেই আরম্ভ হয়। সাহিত্যের মাপকাঠিতে এই গানগুলিকে উৎকৃষ্ট বলে গ্রহণ করা কঠিন, কিন্তু এক নূতন আদর্শের প্রচার ও ভাবাবেগ দ্বারা জনমানসকে উদ্বেলিত করার ক্ষেত্রে গানগুলির ক্ষমতা লক্ষ্য করে গানগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে রাশিয়ার যুবরাজ ও সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিশিকান্তের উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রণিধানযোগ্য। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জাতীয় সঙ্গীতের' এক ইংরিজি অনুবাদ লাহোর থেকে 'Indian National Songs and Lyrics' (১৮৮৩) নামে

প্রকাশ হয়েছিল। ১৮৭৯ খৃঃ নিশিকান্তও ঐ গানগুলি তর্জমা করে যুবরাজকে শুনিয়েছিলেন। "ঐ বৎসরের ২রা মার্চ সেণ্ট পিটার্সবার্গ হইতে রাজনারায়ণ বসুর নিকট লিখিত এক পত্রে নিশিকান্ত জানান 'Alluding to the Patriotic songs, His Imperial Highness asked, if such hymns were not prohibited by the British Government, to which, as far as I was aware, I answered in the negative." ইহার উত্তরে নিশিকান্ত যুবরাজকে বলিয়াছিলেন, "Apropos, I observed that these patriotic hymns had been mostly composed and sung on the occasions of what we call 'The Hindu Mela' : an annual vernal feast which bore much resemblance to the Greek Olympic Games and which has for its objects, as in the other case, the inculcation and the development of the national spirit of the Hindu race."[১] হিন্দুমেলার যুগে (১৮৬৭-১৮৮০) সত্যেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত দু'টি গান—যথাক্রমে 'মিলে সবে ভারতসন্তান' ও 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই হ'ল আমাদের আমলের সকাল হবার পূবেকার সুর, যেন সূর্যোদয় হবার আগে ভোরের পাখি ডেকে উঠল। আমরাও ছেলেবেলায় এইসব গান খুব গাইতুম।"[২] শুধু হিন্দুমেলা যুগেই নয়, পরবর্তীকালেও দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ ও ঐক্যের আদর্শ মুদ্রিত করে দিতে এসব সংগীতের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

হিন্দুমেলার বিভিন্ন অধিবেশন উপলক্ষ্যে রচিত ও গীত গানের সংখ্যা নিরূপণ সহজ নয়। গানের সঙ্গে সঙ্গে রচয়িতার নাম সর্বত্র উল্লিখিত না হওয়াতে কোন গানটি কার তা নির্ণয়ও কঠিন। তবে

১। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত 'স্বদেশী গান', যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা।

২। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পূঃ উঃ, পৃঃ ৬১

প্রথম কয়েকটি অধিবেশনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির স্মৃতিচারণা থেকে যেটুকু জানা যায় তাতে জাতীয়সংগীত রচয়িতা হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। হিন্দুমেলার গানের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় গান হ'ল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত, দ্বিতীয় অধিবেশনে গীত 'গাও ভারতের জয়' গানটি।

"মিলে সব ভারত সন্তান,
এক তান মনঃ প্রাণ ;
গাও ভারতের যশোগান ॥
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান ?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শতখনি রত্নের নিধান,
হোক ভারতের জয়,
জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয়, কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্মস্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?"

এই গানটি প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন—

"ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শ সুস্পষ্ট ভাষায় প্রথম ব্যক্ত হয় ১৮৬৮ সালের হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে। এই মেলার প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনের উদ্‌বোধন হত 'গাও ভারতের জয়' গানটি দিয়ে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মুক্তির

NATIONAL SONG BOOK

PART I

(PATRIOTIC SONGS.)

জাতীয় সঙ্গীত

প্রথম ভাগ।

(স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীতমালা)

Calcutta:

PRINTED BY G. P. ROY & CO., 21, BOW BAZAR STREET

1876.

মূল্য ৵০ আনা মাত্র

ইতিহাসে এর স্থান সুনির্দ্দিষ্ট। কেননা এই গানটিই নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়সংগীত অ্যাখ্যালাভের অধিকারী।"[১]

গানটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন (বঙ্গদর্শন ১২৭৯।১৮৭২) —"এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক। পূর্ব্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।"[২]

গানটি সম্বন্ধে এই প্রশস্তিই যে পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেশমাতৃকার বন্দনাগীত 'বন্দেমাতরম্' সংগীত রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। সত্যেন্দ্রনাথের এই গানটি সরলা দেবীর 'নমো হিন্দুস্থান' গানটিরও উৎসস্থল। প্রফুল্লকুমার সরকার লিখেছেন, "বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' এবং রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' ব্যতীত এমন উদ্দীপক জাতীয় সংগীত বাংলাভাষায় আর রচিত হয় নাই।[৩] সত্যেন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে পরবর্তীকালে রচিত নানা গানের ভাব ও ভাষার সাদৃশ্য সহজে চোখে পড়ে।

হিন্দুমেলা যুগে স্বদেশমাতৃকার বন্দনাগীত ছাড়াও বিচিত্রভাবের গান রচিত হয়েছে। পরাধীন দেশের হতশ্রী, বেদনামলিন অবস্থার ছবি ফুটে উঠেছে কয়েকটি গানে।[৪]

"নিরখি দেখ কাল বিকল, পূর্ববিভব সকল বিফল।
অঙ্গ ভঙ্গ জন্ম-ভূমি, নত শির হয় লাজে॥"

১। প্রবোধচন্দ্র সেন--ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত, ১৯৪৯, পৃঃ ৪১
২। প্রবোধচন্দ্র সেন—পূঃ উঃ, পৃঃ ৪৪
৩। প্রফুল্লকুমার সরকার—জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ, ১৯৬১, পৃঃ ৭
৪। যোগেশচন্দ্র বাগল--পূঃ উঃ, পৃঃ ১১৩-১১৭, সংকলিত ৭টি গানের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্য একটি গানে পাই—

"বুক ফাটে কি বলব আর, ভারতভূমি চেনা ভার,
নাই আচার, নাই অধিকার, আশ্চর্য্য পরিবর্তন।
পাপেতে পুরেছে রাজ্য, লোপ হয়েছে বৈধকার্য্য,
হারাইয়ে বলবীর্য্য, হলো দাসত্ব অবলম্বন।"

এই দুঃখদুর্দ্দশার কারণ দেশবাসী খুঁজে পেয়েছে। তাহ'ল বিদেশী শাসন ও বিদেশী শোষণ। বীরভূমি ভারতবর্ষ আজ বিদেশী শক্তির পরাধীন। আর এই কারণেই দেশের দীনদরিদ্র অবস্থা। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে—

"বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী ;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,"...

গণেন্দ্রনাথের গানে দেখি, বিদেশী শোষণই দেশের দারিদ্র্যের মূল কারণ।

"দেশান্তর-জনগণ ভুঞ্জে ভারতের ধন,
এ দেশের ধন হায়, বিদেশীর তরে ॥
আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা,
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে।"

বিদেশী শোষণে দেশীয় শিল্পবাণিজ্য বিলুপ্তপ্রায়।

"কীর্ত্তি হত, বৃত্তি হর্ত, এবে হত হয় জীবন।
ধনধান্য রত্নভার, সব যায় সিন্ধুপার,
উঠিয়াছে হাহাকার কেহ না করে শ্রবণ।"[১]

এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় হ'ল আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মনির্ভরতা ও ঐক্যসাধন। কয়েকটি গানে সে আদর্শ প্রকাশিত।

"সতত রত হও যতনে, দেশহিত সাধনে
একমত ভাব ধরি, এক তানে।

১। তুলনীয়ঃ মনোমোহন বসুর 'দিনের দিন অতি দীন' গান।

অতুল বল মিলন হয়, সফল হয় মনন চয়
বিমল সুখ সলিল বয়, বিদ্যমানে।"

স্বদেশপ্রেমে উৎসাহী হয়ে, ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারলে স্বদেশের উন্নতি কামনা সফল হবেই।

"উৎসাহেরি উপবনে, একতার সুপবনে,
কামনা কুসুম কলি ফুটিবে সরসে ;"

কিংবা

"যাহে দুঃখ ভার যায়, একতায় সে উপায়।
ত্যজ ত্যজ ঔদাস্য ভাব, রত হও নিজ কাযে॥"

হিন্দুমেলা যুগের গানের অন্য একটি প্রধান ভাব হ'ল দেশের গৌরবময় অতীতের স্মৃতিচারণ। দুর্ব্বল, অসহায়, পরাধীন জাতি বর্তমান দীনতার প্রতিষেধক খুঁজতে চেষ্টা করে দেশের অতীত গৌরব মহিমার মধ্যে। ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, আর্যসভ্যতার বিভিন্ন দিক, ক্ষত্রিয়ের বীর্য্য, রমণীর পাতিব্রত্য—সবই তাই কবি-গীতিকারের কাছে মহিমান্বিত হ'য়ে ধরা দিয়েছে। ভারতভূমি কবির চোখে অতুলনীয়, সকল দেশের রানী। বাংলা স্বদেশীগানের এই ধারাটি হিন্দুমেলা-পরবর্তীযুগে অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হয়েছে।

হিন্দুমেলাপর্বের গানে অতীত ভারতের যে ছবি পাই, তাতে প্রাচীন ভারতের স্বাধীন হিন্দু রাজত্বকালের বৈশিষ্ট্যই পরিস্ফুট হয়েছে। গীত রচয়িতারা মনে করেছেন মুসলমান শাসন থেকেই ভারতবর্ষে পরাধীনতার ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে। এই জন্যই হয়ত সঙ্গীতকারেরা প্রাক্-মুসলমান যুগের ভারতীয় সভ্যতার—অর্থাৎ হিন্দু সভ্যতার উল্লেখের দ্বারা আপন অতীত গৌরবশ্লাঘাকে চরিতার্থ করেছেন।

"বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারতভূষণ॥

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথ্বীরাজ আদি বীরগণ ?
ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন ॥"

আর্যের ভারতভূমি, "ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকি আদি জনক সনক সনাতন"এর কীর্ত্তি-যশমণ্ডিত, 'সাধ্বী-পতিপরায়ণা' ক্ষত্রিয় রমণীর আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তে সমুজ্জ্বল। অতীত ভারতকে অবলম্বন করে এই গর্ববোধ জাতির চিত্তে জাতীয়তার চেতনা জাগিয়েছে। স্বভাবতঃই হিন্দুরাজত্ব ও হিন্দুধর্ম বা শাস্ত্র ইত্যাদিই স্বাধীন, ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত ভারতের পরিচায়ক। এই কারণে জাতীয়তাবোধের প্রাথমিক স্তরে 'জাতীয়' ও 'হিন্দু'—এই দুটি শব্দ পরস্পর সমার্থকরূপে গৃহীত হয়েছে। জাতীয় আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে অহিন্দু অংশগ্রহণকারীর কোনও ভূমিকাও ছিল না। ফলে এযুগের জাতীয়তাবোধ 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ'রূপে চিহ্নিত হয়েছে। স্বদেশী-যুগে এরই বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসলমান সমাজ হিন্দু আন্দোলনের থেকে নিজেদের পৃথক রেখেছিল।

হিন্দুমেলাযুগের গানগুলির মধ্যে অপর যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে, তা হ'ল অখণ্ড ভারতের চিন্তা। স্বদেশ এখানে সমগ্র ভারতবর্ষ, শুধুমাত্র জন্মভূমির খণ্ডিত রূপ বা আঞ্চলিক নয়। হিন্দুমেলার প্রভাবে দেশব্যাপী এই ভারতীয় ভাবের জন্ম হয়।

হিন্দুমেলায় যদিও শিক্ষিত, নাগরিক মানুষের জাতীয় ভাবনার স্পন্দনকে প্রধানরূপে অনুভব করা যায়, কিন্তু পরে (১৮৭১ থেকে) মেলার কাজ কলকাতার বাইরে প্রসার লাভ করলে স্বদেশচেতনাও ক্রমে ব্যাপকতা লাভ করে। বাংলাদেশ তথা ভারতে জাতীয়তা-বোধের উদ্দীপনা, প্রচার, প্রসার এবং জাতীয় আন্দোলন-উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে এযুগের সাহিত্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঐতিহাসিকের ভাষায়ঃ "In Bengal the growth of literature made the greatest contribution to the

development of national and patriotic feeling during the last quarter of the nineteenth century."[১] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের এই সাহিত্যের সূচনা হয় 'হিন্দুমেলা'র গানে। হিন্দুমেলাযুগের স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য এই সময়ে রচিত ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটক এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসে এবং দেশপ্রেমিকের জীবনী রচনার আদর্শে প্রকাশিত।[২]

এইখানেই গানগুলির সার্থকতা। অন্যদিকে, পরবর্তীকালের 'জাতীয় মহাসভা' (১৮৮৫) প্রতিষ্ঠার সূচনাও হিন্দুমেলাতেই। দুদিক থেকেই ভারতের জাতীয়তাবোধের ইতিহাসে হিন্দুমেলার গানের অবদান এবং হিন্দুমেলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৩

হিন্দুমেলা ভারতের জাতীয়তাবোধের প্রথম প্রাণস্পন্দন। হিন্দুমেলাযুগের পর স্বদেশপ্রেমের চিন্তার এক সুস্পষ্ট পর্যায় রচিত হ'ল বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন্দ্র করে। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন, "পরাধীন জাতির জীবনচিন্তা স্বভাবতই··· ঐতিহাসিক খাতে বহিতে থাকে।"[৩] দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা তাই সহজেই অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার প্রথম প্রকাশ। এই উপন্যাসেই বঙ্গদর্শনের সূচনা এবং আনন্দমঠের পূর্বাভাষ লক্ষিত হয়। এই উপন্যাস রচনার কাল থেকেই বঙ্কিমের মনে ভারতের ইতিহাস, দেশের অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর চিন্তা আরম্ভ হয়েছে—তার পরিণতি দেখি ১৮৭২ খৃঃ

১। Majumdar, R. C —*op. cit.*, p. 340

২। রমেশচন্দ্র দত্তের মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত (১৮৭৬), রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯), রজনীকান্ত গুপ্তের আর্য্যকীর্তি (১৮৮৩), ভারতকাহিনী (১৮৮৩), বীরমহিমা (১৮৮৫), রাজকৃষ্ণ রায়ের ভারতসান্ত্বনা (১৮৭৬), ভারতগান (১৮৭৮)।

৩। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত—'বঙ্কিমচন্দ্র', কথাসাহিত্য, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭০, পৃঃ ১২২৩

'বঙ্গদর্শনে'র প্রতিষ্ঠায়। আত্মদৃষ্টির সঙ্কল্প নিয়ে বঙ্গদর্শন প্রতিষ্ঠিত হ'ল। "বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না"—বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলিতে এই ছিল বঙ্কিমের লক্ষ্য। প্রথম বৎসরের বারটি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে ঐতিহাসিক চিন্তা প্রধান উপজীব্য বিষয় হ'য়ে উঠলো।[১] স্বদেশের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা কালেই তাঁর ধ্যানকল্পনায় দেশমাতৃকার জননীরূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ১২৮১।১৮৭৪ সালের কাতিক সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'আমার দুর্গোৎসব' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম জন্মভূমির মাতৃরূপ দর্শন। বন্দেমাতরম্ গান এই দেশমাতৃকারই বন্দনাগীতি।

বঙ্কিমযুগের স্বদেশপ্রেমের প্রথম বৈশিষ্ট্য হ'ল দেশকে জননী-রূপে কল্পনা। হিন্দুমেলার যুগে এই কল্পনা জাগ্রত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ দেশের দুঃখদুর্দ্দশায় বেদনাবোধ, দীনমলিন অবস্থার জন্য যে কাতরতা আগের যুগের গানে প্রাধান্য পেয়েছিল, এযুগে তা অনেকটা ভিন্নরূপ ধারণ করল। পরাধীনতার বেদনাবোধের মতই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও মূর্ত হয়ে উঠল। প্রাক-বঙ্কিম ও বঙ্কিম-সমকালীন অন্যান্য কবির কাব্যেও এই আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে। নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৬) এর

> "চাহিনা স্বর্গের সুখ নন্দন কানন,
> মুহূর্ত্তেক যদি পাই স্বাধীন জীবন।"

পংক্তিসমূহ এযুগের কবিমানসের স্বাধীনতা স্পৃহাকেই সূচিত করে। বন্দেমাতরম্ গানে এই ভাবকল্পনা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত হয়েছে।

১। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', 'বাঙ্গালীর বাহুবল', 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', 'ভারত-কলঙ্ক'—প্রভৃতিতে বঙ্কিমের মনের ক্ষোভ ও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে।

"সপ্তকোটীকণ্ঠ কলকল-নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটী ভুজৈর্ধৃ্ত খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবল ধারিণীং
নমামি তারিণীং
রিপুদল বারিণীং
মাতরম্।"

দেশবাসীর বাহুবলের দ্বারা শত্রুদলকে পরাভূত করার শক্তি দেশমাতৃকার মধ্যে লক্ষ্য করেছেন বঙ্কিম। স্বাধীনতা কামনা প্রচ্ছন্নভাবে গানটিতে ফুটে উঠেছে।

দেশমাতৃকার জননারূপ কল্পনা ও হিন্দুজাতিকে স্বাধীন দেখার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এযুগের স্বদেশপ্রেমের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য জন্ম নিয়েছে। তাহ'ল "আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম"।[১] স্বদেশপ্রীতি বঙ্কিমের বিচারে ঈশ্বরভক্তিরই নামান্তর। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র একথা বলেছেন 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে (১৮৮৮), সম্ভবত এই চিন্তার সূত্রপাত মৃণালিনী রচনার সময় থেকে। স্বদেশরূপ আনন্দ-মঠে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মভূমিরূপ দেবীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন, সন্তানেরা এই দেবীরই স্তুতি করেছে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র দিয়ে। বঙ্কিমের দেশভক্তি ও ঈশ্বরভক্তি অভিন্ন। ঐতিহাসিকের বিচারে "... Bankim Chandra converted patriotism into religion and religion into patriotism."

বঙ্কিমপর্বের অপর বৈশিষ্ট্য হ'ল 'জাতিবৈর'র চিন্তা।[২] এই 'জাতিবৈর' ইংরাজ বা মুসলমান—কোন জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের

১। Mazumdar, R. C.—*op. cit.*, p. 364

২। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১), নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৬) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' (১৮৭৭) কাব্য প্রভৃতিতে স্বদেশ আক্রমণকারীর প্রতি দেশপ্রেমিকের বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে।

প্রতি বিদ্বেষসঞ্জাত নয়। স্বাতন্ত্রপ্রিয়তা এবং জাতি গঠনের আকাংক্ষা দেশবাসীর মনে জাগ্রত হলে স্বাভাবিকভাবেই পরজাতির শাসনাধীন হওয়ার অবমাননা ও বেদনাও অনুভূত হয়। জাতিবৈর না থাকলে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা জাগবে না—এই কারণেই জাতিবৈর কাম্য। শাসকবিদ্বেষ বা শাসকদ্রোহিতার আদর্শ সেখানে গুরুত্ব লাভ করেনি। দেশের শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ দেশপ্রেমের কষ্টিপাথর। "জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে? যে ডরে, ভীরু, সে মূঢ়, শতধিক তারে।" এযুগের জাতিবৈর শাসকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেনি—করেছে স্বদেশপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতির ওপর। স্বদেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য জাতিবৈর সহায়ক হবে—দেশবাসীর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল।

বঙ্কিমপর্বের দেশপ্রীতি বা স্বদেশচিন্তা পরবর্তীকালে নানাভাবে গৃহীত, সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছে। একদিকে যেমন বহু বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মী বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা এবং তার সমকালীন লেখকদের রচনা থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করেছে, অন্যদিকে তেমনই বঙ্কিমের চিন্তাকে সাম্প্রদায়িক এবং সংকীর্ণ ব'লে নিন্দাও করা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই পর্বে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির ফলে হিন্দু জাতীয়তাবাদ পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। বঙ্কিমের মতামত সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট হোক বা না হোক—তা স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য—তা পরবর্তীকালে হিন্দু জাতীয়তাবাদের অন্যতম উপাদানরূপে গৃহীত হয়েছে এবং তার ফলে তা কখনও প্রশংসিত এবং কখনও ধিকৃত হয়েছে।

আর্যসমাজের (১৮৭৫) প্রবল স্বদেশানুরাগের মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাংক্ষা, স্বদেশী, স্বরাজ ও স্বধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আগ্রহ যেমন ছিল, তেমন ছিল অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা। 'থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি'র আদর্শও হিন্দু জাতীয়তাবাদের কল্পনাকে পুষ্ট করতে সহায়তা করল। এই পটভূমিতে বঙ্কিমের রচনার বিদেশী শাসকবিরোধী কাহিনী আক্ষরিক অর্থে গৃহীত হ'য়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদের সূচনা করল। ঐতিহাসিক বিচারে, বঙ্কিমসাহিত্যের

হিন্দু জাতীয়তার আদর্শ এযুগের স্বদেশপ্রেমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তা ব্যক্তিবিশেষের কল্পনাপ্রসূত নয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "It is only necessary to emphasize the fact that his utterances give a clear indication of the trend of political thought in Bengal in the third quarter of the nineteenth century."[১]

হিন্দুমেলাযুগের গানের বর্তমান দৈন্যের অনুভূতি, দেশের দুর্দ্দশায় হতাশাবোধ—এযুগে অনেক পরিমাণে লুপ্ত হয়েছে। দেশপ্রেম এখন একটা শক্তি ও প্রেরণারূপে দেশবাসীর মনে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে। আনন্দমঠের পরিকল্পনা এই প্রেরণার কর্মরূপায়ণ।

হিন্দুমেলাযুগের তুলনায় এযুগে রচিত গানের সংখ্যা অতি সামান্য। কিন্তু এযুগের স্বদেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা হ'ল 'বন্দেমাতরম্' গান।[২] এই সংগীতটি একাই যুগসৃষ্টির কৃতিত্ব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। আবার, এই গানটিতেই রয়েছে যুগাতিক্রান্ত স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা।

৪

পরাধীনতার বেদনাবোধযুক্ত দেশপ্রীতির প্রবাহের সঙ্গে দেশবাসীর সংঘবদ্ধ স্বদেশব্রতের ও ঐক্যের আদর্শ যুক্ত হয়ে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫) ভারতের জাতীয়তাবোধের ইতিহাসের বিশিষ্ট এক অধ্যায়। বাঙালী সাহিত্যিকরা কংগ্রেসের ভাবাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতির নতুন পথ অবারিত করেছিলেন এমন কথা বলা যায় না ঠিকই কিন্তু কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও তার আদর্শের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের সহমর্মিতা ক্রমশই সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করল। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী যে অনুষ্ঠান হতো, সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনেক দেশাত্মবোধক গান রচিত ও গীত হয়েছে।

১। Mazumdar, R. C.—*op. cit.*, pp. 334-335.
২। চতুর্থ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

ভারতের জাতীয়তাবোধের বিবর্তন ধারায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। তা নানাদিক থেকেই এযুগের চিন্তাধারার স্বাভাবিক ও সঙ্গত পরিণতি হিসেবে জন্ম নিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশক থেকেই জাতীয়তাবোধের সঙ্গে রাজনৈতিক অধিকারবোধও জড়িত হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের শাসনের ক্ষেত্রে ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকারের দাবী ক্রমে গুঞ্জন তুলছিল। ভারতসভার (১৮৭৬) প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশের শাসন-ক্ষেত্রে দেশবাসীর অধিকার লাভ। দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ এবং দেশের শাসন সম্পর্কিত চিন্তা যখন জেগে উঠছে, সেই সময়কার (১৮৮৩) দু'টি ঘটনা—ইলবার্ট বিল নিয়ে আন্দোলন ও সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড—দেশবাসীকে আরও গভীরভাবে রাজনীতি সচেতন করে তুলতে সহায়তা করল। ছাত্রসমাজ দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলে দেশব্যাপী এক উত্তপ্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'ল। সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা এই সময়ে অনুভূত হয়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বীজ থেকে জাতীয় কংগ্রেস কাণ্ডে-পত্রে সুশোভিত, বিশাল মহীরূহের আকার ধারণ করল।

এই সংগঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সর্বভারতীয় একতার আদর্শ-গ্রহণ। এই পর্বের সাহিত্যেও এই আদর্শের অনুরণন শুনতে পাই। দেশপ্রীতি আর ব্যক্তির একক সাধনার উপলব্ধি রইল না—দেশের সকল মানুষের মধ্যে দেশপ্রীতির সঞ্চার ও দেশব্রতে সকল মানুষের সম্মিলিত সাধনা এযুগের স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্যরূপে পরিস্ফুট হ'ল। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৮৬) রবীন্দ্রনাথ রচিত গান—'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'। এই গানে কংগ্রেসযুগের জাতীয় ঐক্যের সুরটি ধ্বনিত হয়েছে। হিন্দুমেলাযুগের অখণ্ড ভারতের কল্পনায় এযুগে কিছুটা অভিনবত্বের স্পর্শ লেগেছে। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান ভারতবাসীর বৈশিষ্ট্য। জাতি, ধর্ম, ভাষার এই বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়েই ভারতের অখণ্ড সত্তাটি গড়ে

উঠেছে। এই অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের সুর অনুসন্ধানের অতীত ঐতিহ্যকে এযুগের কবি গীতিকার স্বীকার করেছেন। সরলাদেবী চৌধুরানীর 'নমো হিন্দুস্থান' গানটিতে সেই সুরেরই আত্মপ্রকাশ ঃ

"বঙ্গ বিহার উৎকল মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জর, পাঞ্জাব, রাজপুতান।
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান।
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে—'নমো হিন্দুস্থান'।"

দেশবাসীর মধ্যে এই একতার বন্ধন দেশব্যাপী জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনের পরিচায়ক। হিন্দুমেলা থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিমযুগ পর্যন্ত স্বদেশপ্রেম মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষের উপলব্ধি ও চিন্তার বিষয় ছিল। কংগ্রেসযুগেই তা ক্রমশ দেশের অসংখ্য মানুষের মধ্যে বিস্তৃত হবার প্রথম সুযোগ পেল। "ভেদরিপু বিনাশিনি মম বাণি। গাহ আজি ঐক্যগান।" বিভেদ ভুলতে পারলে তবেই মহাবল জাগবে, এই বিশ্বাস এযুগের স্বদেশচিন্তা ও গানে সমভাবে বিধৃত। এই পর্বের স্বদেশী গানে জনচিত্ত-আলোড়নকারী যে নূতন তান ধ্বনিত হয়েছে, তা 'মহাজাতি সংগঠনে'র কথা। কংগ্রেসের আদর্শেরই গীতিরূপ বলা যেতে পারে সরলাদেবীর এই গানটিকে।

জাতীয় ঐক্যচিন্তা যেমন আরো দৃঢ়তা লাভ করেছিল অপর পক্ষে কংগ্রেসী প্রভাবে 'জাতিবৈর'র চিন্তা এযুগে অনেকটা তরল হ'য়ে এসেছে। একদিকে শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষের তীব্রতা কম। আইন ও অধিকারের ভিত্তিতে ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টায় স্বদেশপ্রেমিক সচেষ্ট। তাই আত্মপ্রতিষ্ঠার আদর্শ তেমন গুরুত্ব পেল না। অন্যদিকে, কংগ্রেসের পতাকাতলে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ সমবেত হওয়াতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা ভিন্ন জাতির প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা কম। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ও সম্প্রীতির কথাও স্পষ্ট প্রকাশ পেল স্বদেশপ্রেমের চিন্তায়। হিন্দুত্বসূচক শব্দ ও শব্দগুচ্ছও কম। কংগ্রেস অধিবেশনে "সভার কার্য আরম্ভ হইবার পূর্বে প্রতিদিনই জননী জন্মভূমির গৌরবগাথা গীত

হইত।"[১] সম্মিলনের উদ্বোধন হ'তো বন্দেমাতরম্ গান দিয়ে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস অধিবেশনে গীত হয়েই রচনাকালের ১৫ বৎসর পরেই গানটি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গানটিও দেশমাতৃকার স্তবগীত।

'জনগণমন অধিনায়ক' (১৯১১) ও 'দেশ দেশ নন্দিত করি' (১৯১৭) গান দুটিও কংগ্রেস সভায় গীত, জন্মভূমির গৌরবগাথা। সেদিক থেকে বাংলা গানে স্বদেশপ্রেমের চেতনা হিন্দুমেলা পর্ব, বঙ্কিমযুগের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিল, এ পর্বে তা পরিণতির পথে আরও কিছুদূর এগিয়ে এসেছে।

কংগ্রেস সংগঠন স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয় এবং ভারতপ্রেমিক অভারতীয়দের সক্রিয় সহযোগিতা এবং অবদানে পরিচালিত হচ্ছিল। ফলে এযুগের জাতীয়তাবোধে আর একটি বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে—যা হিন্দুমেলাপর্বে বা পরবর্তীকালে স্বদেশীযুগে লক্ষিত হয় না। জাতীয়তাবোধ এখানে সংকীর্ণ অর্থে গৃহীত না হয়ে উদার বিশ্বজনীন আদর্শে পরিণত হয়েছে। জাতীয়তাবোধ আন্তর্জাতিক উপলব্ধির পরিপন্থী নয়, বরং স্বদেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে সমর্থ, এই চেতনা দেশপ্রেমিকের হৃদয়কে প্রশস্ত করেছে। কংগ্রেসযুগের এই উদার, মানবিক আদর্শ হিন্দুমেলার যুগের গানে অনুৎপন্ন, আবার স্বদেশী যুগের ভাবোন্মাদনার স্রোতে এই আদর্শ কিছু পরিমাণে অস্পষ্ট। ভারতের স্বদেশপ্রেমের ধারায় কংগ্রেসের প্রথম যুগের স্বাতন্ত্র্য এখানে স্পষ্টতঃ চোখে পড়ে।

৫

কংগ্রেসের প্রথম যুগে দেশাত্মবোধের ক্ষেত্রে যে জনজাগরণ ঘটল, তা দেশবাসীর সামনে এক চরম পরীক্ষা নিয়ে এল। ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব বাঙালীর কাছে দেশপ্রেমের পরীক্ষারূপে

১। 'ভারতী', মাঘ, ১৩১৮। ১৯১১ পৃঃ ৯৯৬-৯৯৭; প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় —পৃঃ উঃ (খ) পৃঃ ৫২৮এ উদ্ধৃত।

ধরা দিল। এই প্রস্তাবের বিরোধিতায় দেশব্যাপী যে আলোড়ন ও আন্দোলন চলল, তা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনামাত্রই নয়, ভারতের জাতীয়তাবোধের বিকাশ এবং জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। স্বদেশ-প্রেম এই পর্বে এক নূতন দিগন্তকে স্পর্শ করল। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব বর্জনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হ'লেও ক্রমে তা স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দেশবাসীকে উদ্বোধিত করে দেশব্যাপী স্বদেশপ্রেমের এক অপূর্ব বন্যা এনে দিয়েছিল। তারই সাহিত্যিক প্রকাশ ঘটেছিল বিশেষভাবে এযুগের কবিতা ও গানে। বাংলা স্বদেশী গানের ইতিহাসে দেখা যায় যে হিন্দুমেলাযুগে স্বদেশী গানের উদ্ভব, কিন্তু তার সার্থক বিকাশ ঘটেছে বঙ্গভঙ্গের যুগে।

হিন্দুমেলা ছিল মূলতঃ শিক্ষিত, নাগরিক বাঙালীর স্বদেশানুভূতি প্রকাশের প্রথম প্রয়াস। একে কেন্দ্র করেই কোলকাতার শিক্ষিত তরুণের স্বদেশচেতনা, জাতীয় ভাবনা প্রকাশ পেয়েছিল। ভারতবর্ষ সম্পর্কে নবজাগ্রত এক শ্রদ্ধাবোধ সেযুগের স্বদেশপ্রেমিককে দেশের অস্তিত্ব, দেশের অবস্থা—তার অতীত গরিমা ও বর্তমান দৈন্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল। ভারতমাতার 'মলিন মুখচন্দ্রমা' দেখে দেশবাসী কখনও কাতর হয়েছে, কখনও বা দীনতাবোধ, লজ্জা কাটিয়ে উঠে ভারতের জয়গানে মুখর হয়েছে। কিন্তু এই স্বদেশপ্রেম তখনও ভাবকুহেলি কাটিয়ে আন্দোলনরূপে চিহ্নিত হ'তে পারেনি। তাই এযুগের গানগুলিতে ভাবাবেগের প্রাবল্য থাকলেও তা যথার্থ জাতীয়-সংগীতে পরিণত হতে পারেনি। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ফলে স্বদেশপ্রেম রাজনৈতিক চেতনার অপেক্ষাকৃত কঠিনভূমির উপর আশ্রয় গ্রহণ করল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গকে অবলম্বন করে স্বদেশপ্রীতি নিছক ভাবানুভূতির সংকীর্ণ পরিমণ্ডল ছাপিয়ে কর্মে রূপায়িত হল। এই ধারারই অনুসরণে অসহযোগ, আইন অমান্য, প্রভৃতি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্নরূপ লাভ করে, জাতীয় আন্দোলন সম্পূর্ণতা লাভ করল।

অপরদিকে জাতির চৈতন্য বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবে সবেগে নাড়া খেয়ে জেগে উঠেছে। আকস্মিক জাগরণের আবেগ অভিভূত করেছে দেশবাসীকে। এই আবেগের জোয়ারে এযুগে স্বদেশপ্রেমের গান রচনার উৎসমুখ খুলে গিয়েছে। বঙ্গভঙ্গের ফলে সমগ্র বাংলাদেশে আন্দোলন এবং আন্দোলনের ফলে দেশাত্মবোধের জাগরণ ঘটেছে।[১] সেই হিসেবে এযুগের রচনার সাহিত্যিক মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক মূল্যও বিচার্য্য।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাংলাদেশের জনগণের বিরাট অংশ দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংঘবদ্ধভাবে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে—এটা ভারতীয় জাতীয়তাবোধের ধারায় এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এছাড়া দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে স্পষ্ট, নির্দ্দিষ্ট কর্মপন্থা নিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে যাত্রা শুরু হয় এই পর্ব থেকেই। এই যাত্রাপথের পাথেয় ছিল স্বদেশী গানগুলি। এই গানই দেশবাসীকে আন্দোলনে শক্তি জুগিয়েছে, তাদের চিত্তে জাগিয়েছে দেশের প্রতি ভক্তি। পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনের সকল ভাবেরই উৎস রয়েছে এযুগের গানগুলিতে। সেদিক থেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে রচিত ও গীত গানগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের ঘোষিত বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের রাজনৈতিক পটভূমিকায় এই আন্দোলনের উদ্ভব। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব ইংরাজ শাসকগোষ্ঠীর আকস্মিক চিন্তাপ্রসূত নয়। বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ে নানা পরিকল্পনা তাঁরা বেশ কিছুকাল যাবৎ করেছিলেন। ১৮৬৬ খৃঃ উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের পরই শাসনের সুবিধার্থে বাংলাদেশের আয়তন ছোট করার কথা হয়। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার সঙ্গে বিহার, আসাম ও উড়িষ্যাও যুক্ত ছিল। এর আয়তন ছিল

১। বারাণসীতে (১৯০৫) কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখেলের মন্তব্যের অনুবাদ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'কংগ্রেস ও বাংলা' (১৯৩৫) তে আছে। পৃঃ ২৫-১৬।

১৮৯,০০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল ৭'৮ কোটিরও বেশী। এত বিশাল একটি প্রদেশের শাসনভার একজন শাসকের (Lt. Governor) পক্ষে গুরুভার ছিল। কাজেই এক্ষেত্রে দায়িত্বলাঘবের চিন্তা অসঙ্গত ছিল না। কিন্তু শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য রাজ্যবিভাগ ছাড়া অন্য কোন উপায় বা বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণে কর্তৃপক্ষ অসম্মত হলেন। তৎকালে বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রচলিত *Governor-in-Council System* ও বাংলাদেশের জন্য কার্জনের কাছে মনঃপুত হ'ল না। তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, তিনজন শাসকের দ্বারা দেশ শাসন অপেক্ষা একজন শাসকের ওপর শাসনক্ষমতা ন্যস্ত করা শতগুণে ভাল হ'বে। কাজেই বঙ্গভঙ্গকেই সমীচীন বলে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কিন্তু এই পরিকল্পনার পিছনে এক গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ছিল। তৎকালীন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর স্যার ফ্রেজার পূর্ববাংলাকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলেন। কেননা, বাংলাদেশ শাসন বিষয়ে বাঙালীরা যে আন্দোলন গড়ে তুলছিল সেটা শাসকদ্রোহী আন্দোলন না হ'লেও ইংরেজের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রসূত ছিল। এই আন্দোলনের বীজ বপন করা হয়েছিল পূর্ববাংলায়। কাজেই পূর্ববাংলাকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে এই আন্দোলনকে দমন করা সম্ভব হ'বে—এরকম মনোভাব কর্তৃপক্ষের ছিল অনুমান করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানও শাসকবর্গের এই নিগূঢ় অভিপ্রায়ের সাক্ষ্য দেয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুমিত সরকারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। "Home proceedings and private papers alike vividly reveal the importance of political factors in moulding the final contours of the partition plan and in ruling out alternatives which on administrative grounds alone would have been at least equally viable."[১] শাসনব্যবস্থার সুবিধার নামে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষ

১। Sarkar, Sumit—*op. cit.*, p. 14

অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ করলেন। এমনকি, জাতীয় নেতৃবৃন্দের বা ভূতপূর্ব শাসকদের—হেনরী কটন, স্টিভেন্স, বাকল্যাণ্ড প্রভৃতির বিকল্প প্রস্তাবগুলিও বিবেচনা করে দেখা হল না। পূর্ব ভারতে বাঙালীর নেতৃত্বে যে ইংরাজবিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছিল, তাকে অঙ্কুরে বিনাশ করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই ছিল এই প্রস্তাবের প্রকৃত কারণ। ১৮৯৯-১৯০১ সালের কয়েকটি ঘটনাতে দেখি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালীর অধিকার খর্ব করতে কার্জন ছিলেন অকুণ্ঠিত। ১৮৯৯'র ডিসেম্বর মাসে নাগরিক ক্ষমতা হ্রাস করে 'কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট' পাশ হ'ল। ১৯০১ সালে কার্জনের 'ইউনিভার্সিটি বিল' দেশবাসীর উচ্চশিক্ষার পথ দুরূহ করে তুলল। সমস্ত দেশ এই প্রস্তাবিত আইনের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়[১] প্রকাশিত নানা প্রবন্ধে এই আইনের প্রতি নিন্দা ও ধিক্কারবাণী উচ্চারিত হ'ল। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "আমাদের ভাবনার বিষয় এই যে দেশের বিচার দুর্মূল্য, অন্ন দুর্মূল্য, শিক্ষাও যদি দুর্মূল্য হয়, তবে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে নিদারুণ বিচ্ছেদ আমাদের দেশেও অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিবে।"[২] উচ্চশিক্ষার পথ দুর্গম করে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাধীনতাস্পৃহা স্ফুরণের পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা হ'ল। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে করা হ'ল শাসনব্যবস্থার সুবিধার নামে দেশবিভাগের প্রস্তাব (১৯০৩)।

কার্জন নিজ প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে কিছু মানুষকে স্বদলে আনতে উদ্যোগী হলেন। ১৯০৪ সালে পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণকালে, দেশবিভক্ত হ'লে পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এই

১। "সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী', নরেন্দ্রনাথের 'ইণ্ডিয়ান মিরর', 'অমৃতবাজার', রামানন্দের 'প্রবাসী', রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গদর্শন', কাগজের পাতায় পাতায় কালো কালো অক্ষরে ফুটে বেরুল সমগ্র জাতির নিন্দা"...। সমুদ্রগুপ্ত– বঙ্গভঙ্গ, ১৯৬৮, পৃঃ ২০

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'য়ুনিভার্সিটি বিল', আত্মশক্তি, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৩য় খণ্ড, ১৯৫৭, পৃঃ ৫৯৬।

আশ্বাস দিয়ে তিনি মুসলমান সমাজকে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সমর্থনে প্ররোচিত করেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধ জাগিয়ে তুলে জাতির ঐক্য নষ্ট করার সরকারী মনোভাবের পরিচয় বহন করে সরকারী নানা চিঠিপত্র।[১] বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাববিরোধী আন্দোলনকে তিনি নেতাদের 'সাজানো' বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেন, যদিও বাংলাদেশের শহরে, গ্রামে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সভা-সমিতি আহূত হয়। ১৯০৩ ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ অক্টোবর—এই অল্পসময়ের মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় তিন হাজার জনসভা আয়োজিত হয়েছিল। ১৯০৪ সালে দেশবিভাগের প্রস্তাব বাতিল করার জন্য যে আবেদনপত্র পাঠানো হয়েছিল, তার কোন মর্যাদা দেওয়া হলো না। ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই-এর সংবাদপত্রে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়ে প্রকাশ পেল এবং এই ঘোষণা প্রচারিত হ'ল যে ১৬ই অক্টোবর থেকে তা কার্য্যকরী হ'বে। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশ এই ঘোষণার বিরোধিতা করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বুচ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "The agitation against the partition ...set the nation ablaze ...A wave of true national feeling swept first over Bengal and then all over India."[২] বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের ঘটনা উপলক্ষ হ'লেও পরিণামে দেশব্যাপী ইংরাজবিরোধী মনোভাব গড়ে উঠে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করল। এখন আর আন্দোলন শুধু শহরের শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, "The people of Bengal of all ranks, from the Nawabs, Maharajas, Rajas and big Zamindars down to the common man, unanimously decided to carry on sustained and

১। Sarkar, Sumit—*op. cit.*, pp. 18-19

২। Buch, M.A.—*Rise and Growth of Indian Militant Nationalism*, Baroda, 1940, p. 43

systematic opposition to the scheme of partition."[১]

দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ দেখলেন, আবেদন-নিবেদন, প্রতিবাদ-নিন্দা, কোন কিছুতেই সরকারী পরিকল্পনার পরিবর্তন হ'ল না। তাঁরাও, প্রস্তাব ঘোষিত হ'লে তা স্বীকার করে নিতেই হ'বে, এমন আনুগত্য দেখাতে রাজী হলেন না। কাজেই বঙ্গভঙ্গের *settled fact* কে *unsettle* করার চেষ্টা চলল সংঘবদ্ধভাবে দেশের সর্বত্র। Sedition Committee Report এ উল্লেখ পাই,—

"Through the volume and intensity of a general and thoroughly organized movement it might still be possible to procure a reversal of the obnoxious measure. An agitation of unparalleled bitterness was started in both provinces and especially in the eastern."[২]

বঙ্গবিভাগের এই প্রচণ্ড আঘাত না এলে দেশজুড়ে এমন উত্তেজনা ও আবেগ জাগতো না। সুতরাং "...one of our main objects is to split up and thereby weaken a solid body of opponents to our rule."[৩] ...ইংরেজ-শাসকের এই ধারণা অচিরেই ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হ'ল।

এই আন্দোলন প্রসঙ্গে ১৯০৫ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি গোখেল বলেছিলেন যে এই—

"...an opposition in which all classes of Indians high and low, uneducated and educated, Hindus and Mohammedans, had joined, an opposition that which nothing more intense, nothing more widespread, nothing more spontaneous had been

১। Mazumdar, R. C. & Mazumdar, A. K.—*The History and Culture of the Indian People—Struggle for Freedom*, Bombay 1969, p. 19

২। *Sedition Committee Report*, Government of India, 1918, p. 19

৩। Risley's letter quoted by Sarkar, Sumit—*op.cit.*, p. 18

> seen in the country in the whole of our political agitation."[১]

এই পটভূমিকায় বঙ্গভঙ্গের আলোড়নের আবেগ জন্ম নিল অসংখ্য দেশপ্রেমের গান। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন,

> "The newborn patriotism and national sentiments found expression in, and were deeply stimulated by a number of beautiful national songs which have survived to the present day."[২]

স্বদেশী যুগের গানের প্লাবন সম্বন্ধে সাহানা দেবী লিখেছেন: "বাংলার ঘরে ঘরে তখন কী উন্মাদনা। ...স্বদেশীসঙ্গীতে মুখরিত পথঘাট"। রাস্তায় রাস্তায় নানা শোভাযাত্রায় সমবেতকণ্ঠে এসব স্বদেশী গান গাওয়া হ'ত। "দিকে দিকে শোনা যাচ্ছে দেশমাতৃকার বন্দনাসঙ্গীত—নানা সম্মিলিত কণ্ঠে, সুরে। তাদের আকুল-করা গানে আমাদের পাগল করে দিচ্ছে।"[৩] এযুগের গীতিকার ও কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল. অতুলপ্রসাদ, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, মুকুন্দদাস প্রভৃতি। এঁদের রচিত গান তখন পথে-ঘাটে, সভাসমিতিতে—সর্বত্র শোনা যেত। এই পরিচিত কবিরা ছাড়াও অন্যান্য অনেকে এ সময়ে গান রচনা করেছেন। বহু পল্লীকবিও গান বেঁধেছিলেন যার দু'চারটি এখনও পুরোনো সংগীত সংগ্রহের মধ্যে বেঁচে আছে। কোলকাতার বাইরে বাংলাদেশের অন্যান্য শহরে ও গ্রামেও যে এঁদের গান পরিচিত ছিল, বঙ্গভঙ্গ যুগে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর থেকে প্রকাশিত স্বদেশী গানের সংগ্রহ গ্রন্থের প্রকাশ তারই সাক্ষ্য দেয়।

হিন্দুমেলা ও বঙ্গভঙ্গ যুগের কালগত ব্যবধানে ভারতের রাজনীতিতে যেমন পট পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি দেশাত্মবোধও

১। Gokhale, G. K.—*Congress Presidential Address*, 1905
২। Majumdar, R. C—*op. cit.*, p. 343
৩। সাহানা দেবী—পূঃ উঃ, পৃঃ ৫৭-৬১

সেইসঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে। এযুগের স্বদেশপ্রেম দেশের অতীত চিন্তা নয়, তা বর্তমান ভাবনার দিকে মোড় নিয়েছে। বর্তমান চিন্তা দেশের বর্তমান দুর্দ্দশায় দুঃখবোধ, দুর্দ্দশার কারণ অনুসন্ধান, তার প্রতিকারের পথ খোঁজার মধ্যে প্রকাশ পেল। জাতির দুর্বলতা, পরাধীনতার গ্লানি, বিদেশী শাসকের শোষণ—ইত্যাদি দেশের দুরবস্থার কারণ এবং আত্মনির্ভরতা, জাতীয় উন্নতি, জাতীয় ঐক্য—প্রভৃতি এই দুর্দ্দশামোচনের উপায়। দেশপ্রীতি এখন কর্মসাধনার অঙ্গ। এই কর্মের দু'টি দিক—বিদেশীবর্জন ও স্বদেশী জিনিসের প্রতি অনুরাগ। এই ধারণা এযুগের গানে সুস্পষ্ট।

বঙ্গভঙ্গ পর্বের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল শাসকবিদ্বেষ। বঙ্কিম-যুগের জাতিবৈরের কল্পনা এযুগে প্রত্যক্ষতা লাভ করেছে। বঙ্গভঙ্গের ঘটনাতে দেশবাসী শাসকবর্গের হৃদয়হীন সিদ্ধান্ত প্রয়োগের ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছে। তাতে ইংরেজমহিমা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে ইংরেজের প্রতি এক বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠেছে। এই পরিবেশে রচিত গানে তাই স্বাভাবিকভাবেই ইংরাজবিদ্বেষ বা শাসকদ্রোহিতা ফুটে উঠেছে। শাসকের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে যেয়ে যে ইংরাজ-বিদ্বেষ জন্ম নিল, পরে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেলেও সেই বিদ্বেষ চরমে উঠে ইংরাজনিধন আরম্ভ হ'ল। সন্ত্রাসবাদীদের ও গুপ্ত সমিতির সদস্যদের কাছে 'হিন্দুমেলা' বা কংগ্রেস যুগের গানগুলির আবেদন ছিল বলে মনে হয় না। অথচ, 'বন্দেমাতরম্' গান ও স্বদেশী যুগে রচিত গানগুলিতে তাঁরা আপন কর্মের প্রেরণা পেয়েছেন।[১]

১। বিপ্লবীদের স্মৃতিকথায় স্বদেশী যুগের বিভিন্ন গানের প্রভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। চিন্মোহন সেহানবীশের 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ' প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়। ঐ প্রবন্ধ রঘুবীর চক্রবর্ত্তী (সম্পাঃ)—রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও বাংলাদেশ, ১৯৭২ গ্রন্থে নিবদ্ধ।

হিন্দুমেলার গানগুলির উৎসমূলে যে ভাবকল্পনা রয়েছে তাতে আবেগপ্রাবল্য বড় হয়ে ওঠেনি। দেশমাতৃকার অস্তিত্বের উপলব্ধি, আবেগহীন ভাষার মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে। সেদিক থেকে হিন্দুমেলার গানগুলিতে বিবৃতি বড় বেশী, কবিত্বময় বাক্যের সংখ্যা কম। অন্য দিকে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবে যে উত্তেজনা, আলোড়ন ও প্রতিবাদ দেশে উত্তাল হয়ে উঠেছিল, স্বদেশী যুগের অধিকাংশ গানের উৎস সেই আবেগ আতিশয্যেই। এই কারণে দুই যুগের দেশাত্ম-বোধক গানের কথাবস্তুতেও প্রভেদ দেখা দিয়েছে। আবার এই ভাবগত পার্থক্যের মধ্যেই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের স্তর পরম্পরা সজ্জিত হয়েছে। স্বদেশীয় যুগের গানের প্রধান চিন্তাগুলি হ'ল—আত্মনির্ভরতা, ঐক্যের আদর্শ, কর্মের আহ্বান, বাংলাদেশের সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া, দেশ সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্বীকার।

কিন্তু শুধু এই কথার দ্বারাই বঙ্গভঙ্গযুগের গানের যথার্থ পরিচয় সমাপ্ত হয় না। এযুগের গানে অসংখ্য বৈচিত্র্য—বিচিত্র সুর। কাব্যের দিক থেকে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট গান ইতিপূর্বে বা পরেও রচিত হয়নি—রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় এযুগের গানে যেমন সবচেয়ে বেশী প্রকট, তেমনই সাহিত্যিক গুণও এযুগের গানেই সবচেয়ে বেশী।

৬

রবীন্দ্রনাথ রচিত স্বদেশী গানগুলিই এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল। তাঁর স্বদেশী গানগুলির অধিকাংশই 'গীতবিতানে'র স্বদেশ পর্যায়ে সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া, এযুগের অন্যান্য সব সংগ্রহ গ্রন্থেই[১]

১। সরলাদেবী চৌধুরানীর শতগান (১৯০০), যোগীন্দ্রনাথ সরকার, বন্দেমাতরম্ (১৯০৫), জলধর সেন, জাতীয় উচ্ছ্বাস (১৯০৫), দুর্গাদাস লাহিড়ী, বাঙ্গালীর গান (১৯০৬), উপেন্দ্রনাথ দাস, জাতীয় সঙ্গীত (১৯০৬) কুন্তলীন প্রেস, মাতৃপূজা (১৯০৬), নরেন্দ্রকুমার শীল, স্বদেশীসঙ্গীত (১৯০৭), অতুলচন্দ্র ঘটক, গীতিমালিকা (১৯০৭)।

রবীন্দ্রনাথ রচিত গান স্থান পেয়েছে। তাতে সহজেই বোঝা যায় যে স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গানগুলি কত জনপ্রিয় ছিল।

রবীন্দ্রনাথ এই পর্বের প্রথমাবধি গান রচনা করেছেন—বঙ্গভঙ্গ রদ হবার পর পর্যন্ত তাঁর দেশাত্মবোধক গানের ধারা সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ রচিত স্বদেশী গানগুলিকে মোটামুটি তিনটি পর্বে বিন্যস্ত করা যায়।

(ক) প্রাক্-বঙ্গভঙ্গ যুগের দেশাত্মবোধক গান—(১৮৮৬-১৯০৪)

(খ) বঙ্গভঙ্গ যুগের গান—(১৯০৫-১৯১১)

(গ) বঙ্গভঙ্গ যুগের পরবর্তী গান—(১৯১১-১৯১৪)

এই দীর্ঘসময়ের মধ্যে রচিত গানে দেশপ্রেমের সমসাময়িক ভাবনার প্রধান সূত্রগুলি ধরা পড়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের গানে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা অপেক্ষা স্বাদেশিকতার ভাবটি বড়। সম্ভবত সে কারণেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান কালোত্তীর্ণ মহিমায় ভাস্বর। প্রাক্-বঙ্গভঙ্গ যুগের গানগুলির সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ যুগের গানের কালগত ব্যবধান থাকলেও ভাবগত দিক থেকে সেগুলি ঐক্যসূত্রে বাঁধা। দেশের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশের নদনদী, পাহাড়-প্রান্তর গাছপালার প্রতি মমতা তাঁর প্রথম যুগের গানেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ১৯০৫ সালের আলোড়ন ও উন্মাদনায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে তিনি যে অজস্র গান রচনা করলেন, নিছক শিল্প বিচারেই সেগুলি শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-সংগীতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং বাংলা স্বদেশী গানের ধারায় এই গানগুলি স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীতগুলির মধ্যে কয়েকটি দেশবন্দনা। কিন্তু তাঁর দেশবন্দনায় একদিকে যেমন রয়েছে দেশের প্রতি মমত্ব ও গৌরববোধ, যেমন তাঁর 'সার্থক জনম আমার' ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে তাঁর দেশপ্রেম নিছক *nationalism* মাত্র নয়, তা বিশ্বপ্রেমেরই অন্তর্গত। দেশমাতা সেখানে বিশ্বমাতারই রূপ। রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন,

"তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

তাঁর এইসব গানে উত্তেজনা নেই, কোলাহল নেই—কিন্তু তার শক্তি গভীর এবং মর্মস্পর্শী। তাই

> "আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
> ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।"

কবির এই প্রার্থনা পরবর্তীকালে বিপ্লবীদের কাছে কর্মের আদর্শ ও প্রেরণার উৎস বলে গৃহীত হয়েছিল এত সহজে।

জন্মভূমি জননীর প্রতি নিবিড় ভালোবাসা প্রকাশিত হ'ল দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের নানা চিত্রে। বন্দেমাতরম্ গানের সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা মাতৃভূমি এখানে সোনার বাংলার শ্যামল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। বঙ্গমাতার সৌন্দর্য্য বর্ণনামূলক স্বদেশী গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' ও 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' গান দুটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমমূলক সংগীতের মধ্যে আছে নানা বৈচিত্র্য। একদিকে যেমন দেশবন্দনা বা দেশের প্রকৃতির নিপুণ রূপাংকন, অন্যদিকে রয়েছে জাতীয় আন্দোলনে প্রেরণা সঞ্চারের বাণী। কবি গানে স্বদেশমুর্তির ধ্যানমন্ত্রমাত্র রচনা না করে দেশের জন্য কর্মের আদর্শও ব্যক্ত করলেন। কর্মের পথ দুঃসহ বেদনায় বন্ধুর, নিষ্ঠা ও সাধনবেগ এই পথের পাথেয়, আত্মবিশ্বাসই এই সাধনার মূল শক্তি। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গানে তিনি স্বদেশপ্রেমকে বিপদ, আঘাতের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে নেবার আহ্বান জানিয়েছেন। দুঃখের তপস্যাই দেশপ্রেমিকের স্বদেশানুরাগের কষ্টিপাথর। আত্মবিশ্বাস ও নিষ্ঠার জোরে দুঃখকে জয় করতে হ'বে। দ্বিধা দুর্বলতা পরিত্যাগ করতে না পারলে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে না। তাঁর গান—

> "বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস্ নে ভাই।
> শুধু তুই ভেবে ভেবেই হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস নে ভাই॥"

রবীন্দ্রনাথের এই গানের অনুরূপ আদর্শের প্রকাশ দেখি অতুলপ্রসাদ রচিত গানটিতে, যদিও সেই গানের সাহিত্যিকগুণ অনেক নিম্নস্তরের।

গানটি হ'ল—

"হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর,
হও উন্নত-শির, নাহি ভয় !
... ...
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে, বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে ;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে—সত্যের নাহি পরাজয় ॥"

প্রকৃতপক্ষে সমসাময়িক গীতিকারদের ওপর রবীন্দ্রনাথের গানের প্রভাব প্রচুর। দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্য পুষ্পভরা' ও কালীপ্রসন্নের 'স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি' গান দুটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' গানের ভাবগত সাদৃশ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

স্বদেশী যুগের আর একটি পরিচিত গানেও দেশের জন্য সর্বাধিক দুঃখবরণের আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে।

"মা গো, যায় যেন জীবন চলে,
শুধু জগৎ-মাঝে তোমার কাজে
বন্দেমাতরম্ বলে ॥"[১]

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা থেকে আরম্ভ করে বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত বাতিল হওয়া পর্যন্ত (১৯০৩-১৯১১) দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্বদেশানুভূতিকে বিদেশী শাসকবর্গ যখন পদদলিত করেছে, তখন এসকল গানের মধ্যেই দেশবাসী শক্তি ও আশ্রয় লাভ করেছে। তদুপরি স্বদেশীযুগের কর্মীদের প্রাণে কর্মের প্রেরণা জুগিয়েছে এই গানগুলি।

বঙ্গভঙ্গ যুগের গানের অপর একটি প্রধান সুর হ'ল ঐক্যের সুর। দেশবিভাগ প্রতিরোধে বাংলার সন্তানেরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এই

১। বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণের অপরাধে পুলিশী অত্যাচারে চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা, পীড়িত হয়েও "পুলিশ আমাকে যতবার প্রহার করিয়াছে, আমি ততবারই বন্দেমাতরম্ বলিয়াছি।" —এই ঘটনায় অনুপ্রাণিত হয়ে কালীপ্রসন্ন গানটি লেখেন। কিংসফোর্ডের এজলাসে সুশীল সেনের ওপর পুলিশের অত্যাচারের পরেও গানটি গাওয়া হয়।

জাতীয় উদ্দীপনা শুধু অভিনব নয়, এই একতার আদর্শও অপূর্ব এক অভিজ্ঞতা। কংগ্রেসযুগ পর্যন্ত শাসকবর্গের কাছে আবেদন-নিবেদন করে বা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ন্যায্য অধিকার লাভের চেষ্টা দেশবাসী করেছে। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর ইংরাজের ওপর সেই আস্থা আর নেই। তাই এযুগে স্বদেশপ্রেমিক মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সংকল্প নিয়েছে। "গুরুতর দুঃখকে শিরে বহন করিয়া কারাদণ্ডে অবিচল থাকিয়া, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।" এই ভাবের গীতরূপেই বঙ্গভঙ্গের বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি' গানটি।

"আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ, বহিব নির্ভয়

টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন॥"

সেদিন এই গান ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম নাটকের সৈন্যদের গান। এই গানের ভাব এযুগে প্রত্যক্ষ হয়েছিল, সম্ভবতঃ সে কারণেই এই গানের নূতন করে উজ্জীবন হয়েছিল এই যুগে।

একতার আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে স্বাবলম্বন ও আত্মশক্তির চেতনাও জাতির মনে জেগেছে। আত্মশক্তির উদ্বোধনই দেশের মুক্তির প্রকৃত পথ এবং স্বাবলম্বনই জাতীয় উন্নতির ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথ 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' কবিতায় বলেছিলেন, (১৮৯৮।১৩০৫, আষাঢ়)

"পর ধনে ধিক গর্ব—করি কর জোড়
ভরি ভিক্ষা ঝুলি।
পুণ্য হস্তে শাক-অন্নে তুলে দাও পাতে,
তাই যেন রুচে।
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।"

তাঁর গানেও এই ভাবই পরিস্ফুট হয়েছে। —

"আমি পরের ঘরে কিনব না আর, মা, তোর
ভূষণ বলে গলার ফাঁসি।"

আত্মনির্ভরতার প্রথম কথা হ'ল পরানুকরণমোহ পরিত্যাগ, এবং বিদেশী শিল্পদ্রব্য বর্জন। কবির দৃঢ় পণ তাই—

"নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা—
তব আশ্রমে তোমার চরণে, হে ভারত, লব শিক্ষা।
পরের ভূষণ, পরের বসন, তেয়াগিব আজ পরের অশন—
যদি হই দীন না হইব হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা।"

স্বাবলম্বনের আদর্শ থেকেই 'বয়কট' বা বিলাতি বর্জন স্বদেশী আন্দোলনের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হ'ল। এযুগের অন্যান্য গীতিকারদের গানেও এই প্রসঙ্গটি গুরুত্ব লাভ করেছে।

বঙ্গভঙ্গের যুগে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাবে এবং পরিস্থিতির ভাবাদর্শেও কিছু স্বদেশী গান রচিত হয়েছে। হিন্দু-মেলার গানে সাময়িক প্রভাব তেমন কার্য্যকরী হয়নি। কংগ্রেস-যুগের 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি ছাড়া অন্য কোনটিকেই সাময়িক ঘটনা প্রভাবিত গান বলে চিহ্নিত করা যায় না। কিন্তু এই পর্বে ঘটনাবলীর গুরুত্ব দেশবাসী উপলব্ধি করেছে। ফলে, তা নিয়ে প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছে। স্বদেশী গানের প্রেরণারূপে এই প্রতিক্রিয়ার আবেগ কার্য্যকরী হয়েছে সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই।

সরকারীভাবে বঙ্গচ্ছেদঘোষণা কার্য্যকরী করার দিনটিকে (৩০শে আশ্বিন, ১৩১২। ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫) জাতির দুর্ভাগ্যের দিন বলে চিহ্নিত করে, বিশেষভাবে স্মরণীয় করে তুলতে চাইলেন দেশের নেতৃবৃন্দ। একদিকে অরন্ধনব্রত পালন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রচিত 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা পাঠ'—অন্যদিকে গঙ্গাস্নান ও রাখীবন্ধন উৎসব পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই বিশেষ দিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি রচনা করেন। "বাংলার সৌন্দর্য্য, বাংলার সম্পদ, বাঙালির শক্তি, বাঙালির ভাষা

—এককথায় বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে সর্বতোভাবে উজ্জ্বল করিয়া দেখিয়া কবি বিধাতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন।"[১]

"বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা, বাঙালীর কাজ,
বাঙালীর ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান।"

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই রাখীবন্ধন উৎসবের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছেন তাঁর 'ঘরোয়া' গ্রন্থে—সকালবেলা গঙ্গাস্নান করে সবার হাতে রাখী পরানো হ'বে। "রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দুধারে বাড়ীর ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাত অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে—মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁক বাজাচ্ছে, মহা ধূমধাম—যেন এক শোভাযাত্রা। দিনুও ছিল সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।"[২]

এই রাখী উৎসবে বীরু মল্লিকের আস্তাবলের মুসলমান সহিস থেকে চিৎপুরের বড় মসজিদের মৌলবী পর্যন্ত কাউকে রাখী পরাতে বাকী রইল না। বাংলার শহর গ্রামে উষার সংকীর্তন, শোভাযাত্রা সহকারে স্বদেশী গান, এক নূতন আবেগের চাঞ্চল্য সর্বত্র দেখা গিয়েছিল।

সেদিন বিকেলে সার্কুলার রোডের মাঠে ফেডারেশন হলের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে জনসভা হয়। সভা শেষে জনতা বঙ্গবিভাগের আদেশের প্রতিবাদ করার শপথ গ্রহণ করে এবং শোভাযাত্রা করে শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ীতে উপস্থিত হয়। এই শোভাযাত্রায় রবীন্দ্রনাথের 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' গানটি

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—পূঃ উঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৯
২। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পূঃ উঃ পৃঃ ২৫

সমবেত কণ্ঠে গীত হয়।[১] এই গানে দেশবাসীর জনমতকে উপেক্ষা করে শাসকের স্পর্ধিত, উদ্ধত আচরণকে ধিক্কার দিয়েছেন কবি। তাঁর স্থির বিশ্বাস—

"চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নীচে—
এত বল নাই রে তোমার, সবে না সেই টান॥
... ...
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,
বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান॥"

৭

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এযুগের গীতিকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, মুকুন্দদাস প্রভৃতি। স্বদেশী গানের যে সকল বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের গানে পরিস্ফুট, সে সকল লক্ষণ এঁদের গানেও মোটামুটিভাবে রক্ষিত হয়েছে। স্বদেশপ্রেমের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন গীতিকারদের বঙ্গভঙ্গ যুগের রচনাকার-রূপে আখ্যাত করা যায়। তবে কবিমানসের স্বাতন্ত্র্যের ফলে বিভিন্ন কবির গানের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এযুগের গানে এনে দিয়েছে ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশী গানে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে ও ভাষায় দেশমাতৃকার বন্দনা, জন্মভূমির মহিমা ঘোষিত। দেশবাসীর সামনে দেশের অতীত গরিমা, গৌরবময় ঐতিহ্য তুলে ধরে জাতিকে অনুপ্রাণিত করতে এই গানগুলির প্রভাব অপরিসীম। 'চির-গরীয়সী' মাতৃভূমি, 'মহিমা-গরিমা-পুণ্যময়ী' ভারতবর্ষ কবির কাছে শুধু 'সকল দেশের রানী'—শ্রেষ্ঠ দেশ নয়, তা মহিমার জন্মভূমি, 'এশিয়ার তীর্থক্ষেত্র'রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর 'ধনধান্য

১। *Calcutta Municipal Gazette, The* Vol. LXXV, No. 21, Tagore Birth Centenary Supple. Issue, p. 159

পুষ্পভরা' গানটি যেন ধ্যানগম্ভীর মন্ত্র। 'বঙ্গভূমির বন্দনামূলক দ্বিজেন্দ্রলালের যে গানটি একসময় বাংলার বুকে উত্তেজনার জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল সে গানটি এই—'বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ!"[১] 'বন্দেমাতরম্' গানে দেশকে জননীরূপে, দেবীরূপে কল্পনার সূত্রপাত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের ঘটনার আঘাতে এই চেতনা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের গানে দেশজননী ভারতবর্ষ সমুদ্রোত্থিতা দেবীমূর্তিরূপে আবির্ভূতা— "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ।" তাঁর গানে সাময়িক ঘটনার আলোড়নের স্পন্দন নেই, দেশপ্রেমের নিষ্ঠা এখানে স্থির, অবিকম্প।

রজনীকান্ত সেনের গানে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশবন্দনা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা আবেগময়ী ভাষায় সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের তুলনায় তিনি দেশের বর্তমান দুঃখদুর্দশায় সমধিক বেদনাকাতর হয়েছেন এবং এই দুর্দশা প্রতিকারের উপায় অনুসন্ধান করেছেন। 'বয়কট' আন্দোলনের মর্মবাণী—স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জন—রজনীকান্তের গানে প্রাণস্পর্শী ভাষায় ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' অথবা 'তাই ভালো মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত' গানের স্বদেশপ্রেমের আদর্শ তৎকালীন বাঙালী মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন,

> "১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ ঘোষণার কয়েকদিন পরে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ধরিয়া কতকগুলি যুবক নগ্নপদে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান গাহিয়া যাইতেছিল। এখনো মনে আছে, গান শুনিয়া আমার রোমাঞ্চ উপস্থিত হইয়াছিল।"[২]

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই গানটি সম্বন্ধে বলেছেন, এই "প্রাণপূর্ণ

১। প্রভাতকুমার গোস্বামী (সম্পাদিত) হাজার বছরের বাংলাগান, ১৯৭০, পৃঃ ৩৩

২। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—পূঃ উঃ গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃঃ ৫৪

গানটি স্বদেশী সংগীত সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে।"[১] প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "এই উন্মাদক ধ্বনি প্রথম যেদিন আমার কানে প্রবেশ করিল, সেইদিন হইতেই গীতরচয়িতার সঙ্গে পরিচিত হইবার ইচ্ছা মনোমধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল।"[২]

স্বদেশের প্রতি প্রেম ও ভক্তিই শুধু নয়, স্বদেশী যুগে দুর্ব্বল, ভগ্নহৃদয়, নৈরাশ্যকাতর বাঙালীর প্রাণে তিনি আশা, আশ্বাস ও শক্তি সঞ্চার করে দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে উদ্দীপিত করেছিলেন। স্বদেশীকর্ম সাধনার কথাও যেমন তাঁর গানে প্রকাশিত, তেমনি সমকালীন ঘটনা দ্বারা বিচলিত ও অভিভূত হয়েও তিনি গান লিখেছেন। তাঁর 'ফুলার কল্লে হুকুমজারি' গানটি ব্যামফীল্ড্ ফুলারের 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি নিষিদ্ধ করার আদেশ অবলম্বনে রচিত। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে রজনীকান্তের কবিমানসের পার্থক্য এখানেই সূচিত হয়।

অতুলপ্রসাদের স্বদেশী গানে এযুগের অন্যান্য রচয়িতার গানের মত দেশের অতীত মহিমায় গৌরববোধ, দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়ে দেশের অস্তিত্বের উপলব্ধি—ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। তবে তিনি তাঁর গানে ভারতের স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি তুলে ধরেছেন দেশবাসীর সামনে। তাঁর 'বল বল বল সবে, শতবীণবেণুরবে' 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী, উঠ আদি জগতজনপূজ্যা' গানে দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে, দেশের অতীত গরিমার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার সুর ঝঙ্কৃত করে তিনি আপন স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

হিন্দুমেলার যুগ থেকে দেশীয় শিল্প, সাহিত্যের চর্চ্চা ও উন্নতির দিকে দেশবাসী মনোযোগী হয়েছে। বঙ্গভঙ্গের আঘাতে স্বদেশের মহিমা দেশভক্ত মানুষের কাছে নানা দিক থেকে আরও উজ্জ্বলরূপে

১। তদেব, পৃঃ ৫২
২। তদেব, পৃঃ ৫৩-৫৪

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এযুগে তাই মাতৃভাষার প্রতি গভীরতর অনুরাগ জেগেছে বাঙালীর মনে। অতুলপ্রসাদের গানে স্বদেশ-প্রেমিক কবি শুধু বাংলাভাষার শ্রুতিমাধুর্য্যে মুগ্ধ ন'ন, বাংলাভাষার প্রতি তাঁর প্রাণের যে নিবিড় সম্পর্ক, তা তিনি আজন্মকাল উপলব্ধি করতে চান। তাঁর প্রার্থনা হ'ল—

"এই ভাষাতেই বলব হরি,
সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা।"

৮

বঙ্গভঙ্গ যুগের স্বদেশপ্রেমের গানগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল তার সংগ্রামী মনোভাব। রাজশক্তির আঘাতের বিনিময়ে দেশবাসী আজ প্রত্যাঘাতে উদ্যত। অবনত ভারতের মানুষ অসুরনিধনকারী 'সুদর্শনধারী মুরারি'র কাছে শত্রুদলনের দীক্ষা নিয়েছে। কামিনী-কুমার ভট্টাচার্যের 'অবনত ভারত চাহে তোমারে', কিংবা 'শাসন-সংযত কণ্ঠ' গান অথবা বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'হবে পরীক্ষা, তোমার দীক্ষা, অগ্নিমন্ত্রে কিনা'—প্রভৃতিতে দেখি দেশপ্রেমের এক নবীন তন্ত্র, নবীন মন্ত্র রচিত হয়েছে এযুগে।

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে কোলকাতায় যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, ক্রমে তা বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কোলকাতার বাইরে আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল বরিশাল, নেতা ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। শাসকবর্গের দুর্নীতি সম্পর্কে দেশবাসীকে সজাগ করা, স্বদেশী গ্রহণ, বিদেশী বর্জন—ইত্যাদি আদর্শ প্রচার এবং দেশাত্মবোধক গান রচনা দ্বারা স্বদেশী আবহাওয়াকে উত্তপ্ত রাখার দায়িত্ব বরিশালে যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, মুকুন্দদাস ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান। "দেশকে জড় না ভাবিয়া, বাংলার আরাধ্যা চৈতন্যময়ী কালী দুর্গামূর্তিতে আঁকিয়া সুরসংযোগে"[১] মাতৃপূজার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলেন মুকুন্দদাস।

১। সুরেশচন্দ্র গুপ্ত—অশ্বিনীকুমার, বরিশাল, ১৯২৮, পৃঃ ৪৭৬

মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে, স্বদেশসেবায় আত্মবলিদানের সংকল্প নিয়ে, যোদ্ধার মত তিনি বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'তে চান। তাঁর 'আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম' কিংবা 'বন্দেমাতরম্ বলে নাচ রে সকলে, কৃপাণ লইয়া হাতে' প্রভৃতি গানে সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ অভিব্যক্ত। জাতীয় উন্নয়ন, আত্মশক্তির উদ্বোধন, নৈতিক উন্নতির কথা—মুকুন্দদাসের গানে যেমন আছে, তেমনি স্বদেশপ্রেমকে কার্য্যে রূপান্তরিত করার কর্ম-সূচীও তাঁর গানে বিধৃত। এখানেই মুকুন্দদাসের যাত্রা ও গানের বৈশিষ্ট্য।

সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা পরিহারের আদর্শ মুকুন্দদাসের গানের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। তাঁর 'রাম রহিম না জুদা কর' গানটি অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। জাতি, বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায়ের ভেদ তুচ্ছ করেছেন বলেই তাঁর গান হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রাণে উন্মাদনা জাগিয়েছিল এবং সকল শ্রেণীর কাছে জনপ্রিয় ছিল। হিন্দুমেলা যুগে এই ভাবনা অপরিণত ছিল। কংগ্রেস যুগে ঐক্যের আদর্শ ধ্বনিত হ'লেও এযুগে তা সার্বজনীন অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে।

বিদেশী শাসক কর্ত্তৃক দেশের সম্পদ শোষণের চিন্তা স্বদেশী যুগের গানের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। হিন্দুমেলাপর্বে জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনের সহায়করূপে স্বদেশী শিল্প, সাহিত্যচর্চ্চার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে দেশবাসী তখনও সজাগ হয়ে ওঠেনি। বঙ্গভঙ্গ যুগে বিদেশী শাসকের অন্যায় আচরণ হিসেবে দেশের সম্পদ শোষণের দিকটিও দেশপ্রেমিকের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ আদেশের প্রতিবাদস্বরূপ তারা তাই 'বয়কট'এর হাতিয়ার হাতে তুলে নিয়েছে। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের বাংলা ও হিন্দীতে লেখা কয়েকটি গান—যেমন, 'ভাই সব দেখ চেয়ে বাজার ছেয়ে' অথবা 'দেশ্ কা এ ক্যায়া হাল'—এযুগে যেমন জনপ্রিয় ছিল, তেমনি মুকুন্দদাসের গানও

অতি পরিচিত ছিল সাধারণ মানুষের কাছে। তাঁর 'ছেড়ে দাও কাচের চুড়ি বঙ্গনারী' গানটিতে বিলাতি বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের ভাবটি অতি স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ দ্রব্যের উল্লেখের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। 'বাবু বুঝবে কি আর ম'লে' গানটিতে বিদেশী শাসকের শোষণের নগ্নরূপটি উদ্ঘাটিত হওয়ায় মুকুন্দদাস রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ যুগের গীতিকারদের মধ্যে মুকুন্দদাসের গানেই স্বদেশ-প্রেমের উত্তেজনা সর্বাধিক প্রকাশিত হয়েছিল। দেশের সাধারণ মানুষের জন্য স্বল্প শিক্ষিত, গভীর সংবেদনশীল কবিগীতিকারের এই গানগুলি সরল ভাষা, সহজ আবেদন, মর্মস্পর্শী লৌকিক সুর—গানগুলিকে প্রাণবন্ত করেছে। এছাড়া মুকুন্দদাসের গান উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বিশেষ উদ্দেশ্য—আদর্শ প্রচারের উপযোগী আবেগ সঞ্চার করতে গানগুলি সমর্থ হয়েছে, সেখানেই গানগুলির সার্থকতা। রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ বা রবীন্দ্রনাথের গানের ভাবের মাধুর্য্য, ভাষার শিল্পশ্রী এখানে নেই। কিন্তু গান দিয়ে জনচিত্তকে উদ্বোধিত করায় সফলকাম হয়েই মুকুন্দদাস 'চারণকবি' আখ্যা লাভ করেছিলেন।

পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার কামনা বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে মুকুন্দদাসের গানে বিদেশী শাসকের নিধন ও রক্তপাতও কর্মপন্থার অন্তর্ভুক্ত।

"যদি দেশের মুক্তি চাও, ওদের দূরে সরিয়ে দেও—
লাল ফাগুয়ায় খেল রে হোলি, ছুটুক লালে লাল ফোয়ারা।"[১]

এসব গানের উত্তেজনা পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদীদের চিত্তে উন্মাদনা জাগিয়েছে। স্বদেশী যুগের অব্যবহিত পরে সন্ত্রাসবাদের

১। জয়গুরু গোস্বামী—চারণকবি 'মুকুন্দদাস' ১৯৭২ গ্রন্থের ৩০ নং গানে অনুরূপ ভাব ব্যক্ত। "পারিস্ যদি রে হতে বীরাচারী, সোমরস আবার করিতে পান ; রক্তগঙ্গার পুণ্য সলিলে, পূজিতে মায়ের মূরতি খান।"

সূচনাতে সশস্ত্র বিপ্লবের এই আদর্শ 'সন্ত্রাসবাদী জাতীয়তাবোধে'র জন্ম দিয়েছে। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের কাছে এসকল গান যে গভীর প্রেরণার উৎস ছিল, তা বিপ্লবীদের স্মৃতিকথায় উল্লিখিত নানা অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। নলিনীকিশোর গুহ 'জেলের এক অধ্যায়' অংশে অবনী-প্রসঙ্গে লিখেছেন, "অবনী আমাকে মুকুন্দদাসের গানটি গাহিতে বলিত এবং শিখিত—

"ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে।"[১]

বঙ্গভঙ্গ যুগে রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্ব করেছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ নেতারা। তবে "বাঙলার ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথই গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[২] তাঁর সঙ্গে ছিলেন এইসব গীতিকাররা।

বঙ্গভঙ্গের ঘটনাটি বজ্রাঘাতের মতো বাঙালী জাতির মাথায় ভেঙ্গে পড়েছিল, কিন্তু সেই বজ্রের আগুনই জাগিয়ে তুলল দেশব্যাপী শক্তি, সংগ্রাম ও বিদ্রোহের শিখা। "It was in 1905, then, that the Indian Revolution began."[৩] গান্ধীজীর মতে, বঙ্গভঙ্গেই ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। অরবিন্দের মতে বঙ্গভঙ্গ অভিশাপের ছদ্মবেশে বিধাতার আশীর্বাদ। "He (Aurobindo) regarded the partition of Bengal as the greatest blessing that had ever happened to India. No other measure could have stirred national feeling to deeply or roused it so

১। নলিনীকিশোর গুহ—বাংলায় বিপ্লববাদ, ১৯৬৯, পৃঃ ৫৭

২। প্রফুল্লকুমার সরকার—পূঃ উঃ, পৃঃ ৩৫

৩। Durant, Will—*A Case for India*, p. 123; সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পূঃ উঃ, পৃঃ ২৮এ উদ্ধৃত।

suddenly from the lethargy of previous years."[১] জাতীয় চেতনার উৎপত্তি হিন্দুমেলায় তবে বঙ্গভঙ্গের যুগে তা দেশব্যাপী রূপ নিয়েছে। বঙ্গভঙ্গের ঘটনাকে অবলম্বন করে বাঙালীর স্বদেশানুরাগকে শাসক বিরোধী সংগ্রামের দিকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে স্বদেশী গানগুলির মহত্ত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। ঐযুগে রচিত গানগুলি শুধু যে সমকালীন জনমানসে উন্মাদনার স্পর্শ জাগিয়েছিল, তা নয়। পরবর্তী যুগেও নূতন নূতন ভাবাদর্শে সঞ্জীবিত হয়ে গানগুলি নূতন তাৎপর্য্যমণ্ডিত হয়েছে—এদিক থেকে এযুগের স্বদেশী গানগুলির যুগাতিক্রান্তি শক্তি লক্ষণীয়।

৯

হিন্দুমেলার যুগ থেকে আরম্ভ করে স্বদেশী যুগ পর্যন্ত বাঙালীর স্বদেশ চেতনা প্রধানতঃ গানের মধ্য দিয়েই মূর্ত হয়েছিল। চল্লিশ বছরেরও বেশী এই সময়কালে (১৮৬৭-১৯১১) অসংখ্য কবি, গীতিকার এমনকি চিন্তাশীল মনীষীরাও—যেমন, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তি—গান রচনা করেছেন।

কিন্তু কিছুটা আশ্চর্যের বিষয় যে, অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশপ্রেমমূলক গান বিশেষ রচিত হয়নি। বাংলাদেশের প্রধান কবি বা গীতিকারগণ অসহযোগের আদর্শ ব্যক্ত করে কোন গান রচনা করেননি। চরকা বা সত্যাগ্রহ বিষয়ে অল্প কয়েকটি কবিতা অবশ্য রচিত হয়েছে। এছাড়া মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রার[২] কাহিনীতে অসহযোগের আদর্শ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। সত্যাগ্রহ সম্পর্কে চারণকবির ব্যক্তিগত ধারণাকে সার্বজনীন করে তোলার প্রয়াস এই যাত্রাগুলিতে দেখা যায়। 'কি আনন্দধ্বনি উঠল

১। Nevinson *The New Spirit in India* গিরিজাশংকর রায়চৌধুরীর 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ', ১৯৫৬, পৃঃ ৩৬৯এ উদ্ধৃত।

২। পল্লীসেবা, কর্মক্ষেত্র, পথ, প্রভৃতি যাত্রা চারণকবি মুকুন্দদাস, পৃঃ উঃ দ্রষ্টব্য।

বঙ্গভূমে'[১] গানে চরকা, খদ্দর, গান্ধীজীর স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নজরুলের 'চরকার গানে' অসহযোগের মূল আদর্শ ব্যক্ত হয়নি। গান্ধীজীর অসহযোগের আদর্শে তিনি স্বাধীনতার স্বাক্ষর পেলেন। চরকার শব্দে তিনি স্বরাজের আগমনী শুনতে পেলেন।[২] লিখলেন তিনি চরকার গান—

"তোর ঘোরার শব্দে ভাই
সদাই শুনতে যেন পাই
ঐ খুল্‌ল স্বরাজ-সিংহদুয়ার
আর বিলম্ব নাই।"

অসহযোগ আন্দোলনকালে হিন্দু-মুসলমান একত্রিত হয়ে যেভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আদর্শে আশান্বিত হয়েছিলেন কবি। এই কবিতাতেই এই মিলন কামনা করে তিনি লিখলেন, —

"হিন্দু মুসলিম দুই মোদের
তাদের মিলন-সূত্র ডোর রে
রচলি চক্রে তোর।"

সত্যেন্দ্রনাথের 'চরকার গানে' গান্ধীজীর অসহযোগের আদর্শের প্রশস্তি।

"ঘর ঘর দৌলত! ইজ্জৎ ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর হিম্মৎ, আপনায় নির্ভর!
গুজরাট-পাঞ্জাব-বাংলায় সাড়া,
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।"

চরকার মাধ্যমে স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরতা গড়ে উঠবে—এই বিশ্বাস পরিস্ফুট হয়েছে কবিতাটিতে। অসহযোগের আদর্শ কবিপ্রাণে আলোড়ন সৃষ্টি করেনি সত্য, তবে সমকালীন রাজনৈতিক কৌতূহল

১। জয়গুরু গোস্বামী—পূঃ উঃ-গা-৩৮, পৃঃ ২৩৭

২। আবদুল আজীজ-আল-আমান—নজরুল-পরিক্রমা. ১৯৬৯. পৃঃ ৮৮

ও আগ্রহ দ্বারা এঁরা যে ভাবিত হয়েছিলেন, কবিতাগুলি তারই পরিচয় দেয়। এই সময়ে এবং পরবর্তীকালে রচিত অনেক উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতিতে অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলন—ইত্যাদি প্রসঙ্গ বারবার ফিরে এসেছে। কিন্তু এযুগের ভাবাদর্শকে পরিস্ফুট করে গানের পসরা সাজাননি গীতিকারেরা। প্রকৃতপক্ষে নতুন গানের অনুপস্থিতিই এযুগের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

অসহযোগ আন্দোলনের যুগে গান রচনার স্রোত মন্দীভূত, কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের ধারা গতিশীল ও সক্রিয়। তাহলে বুঝতে হবে স্বদেশী যুগে যেমন রাজনৈতিক আন্দোলন ও গান রচনা হাত ধরাধরি করে চলেছিল, এযুগে তারা ভিন্ন পথ ধরে এগিয়েছে। স্বদেশী যুগে যে ভাব-প্লাবন দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত করেছিল, কালের নিয়মে তা একদিন স্তিমিত হয়ে আসবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু উন্মাদনার ফলে যে অনুভূতি, চিন্তা মানুষের মনে জেগেছে, তা কি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে পারে? এক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনার কথা ভাবা যেতে পারে। প্রথমত, স্বদেশী যুগে গান রচনার যে প্রেরণা এবং যে প্রয়োজনীয়তা ছিল, তা সম্ভবত এযুগে পরিবর্তিত হয়েছে। বঙ্গ-ভঙ্গের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশবাসীকে স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন কবি—

"এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
জয় মা বলে ভাসা তরী।"

অসহযোগ পর্যায়ে এই নতুন মন্ত্রে উদ্বোধিত করার প্রয়োজন মিটেছে। অর্থাৎ প্রাক্-অসহযোগকালে গান ছিল স্বদেশী চেতনা উন্মেষের একটি প্রধান অস্ত্র—এখন গানের সেই প্রয়োজন আর নেই। দেশবাসী এখন স্বদেশীভাবে জাগ্রত, প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা হ'ল যে স্বদেশী যুগ ও অসহযোগের অন্তর্বর্তী-কালের মধ্যে কয়েকটি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব এযুগের জাতীয়তাবোধকে প্রভাবিত করেছে। যে কোনও চিন্তার মত সাহিত্যও কালপটভূমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এযুগে উপন্যাস,

কবিতা, নাটকে জাতীয় আন্দোলনের কথা আলোচিত হয়েছে, গানে নয়। বরং গানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যুগের গানগুলিকেই নতুনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, নতুন গানের প্রয়োজন আর তাই ছিল না।

স্বদেশী যুগের শেষ ভাগ থেকেই (১৯০৭-০৮) ভারতের, বিশেষ করে বাংলাদেশের নানাস্থানে বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপ বিক্ষিপ্তভাবে চলতে থাকে। শাসকবর্গও তাদের ওপর কঠোর হস্তে দমননীতি চালালেন। শোভাযাত্রার ওপর লাঠি চালিয়ে, সভা-সমিতি ভেঙ্গে দিয়েও যখন জাতীয়তাবোধের কণ্ঠরোধ করা গেল না, তখন শাসন-দমনের পদ্ধতি আরও কঠোর হ'ল। বাংলাদেশে বহুলোককে বন্দী, বিনা বিচারে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল। এর ফল হ'ল বিপরীত। একদল দেশসেবী সন্ত্রাস সৃষ্টি করে শাসকবর্গের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে গোপন পথে আন্দোলন করে চলল। এই সময় থেকেই "... 'the anarchist movement' became a new factor to Indian Politics."[১] এই বিপ্লবী কর্ম সাধনা, দেশপ্রেমিকদের আত্মাহুতি, ত্যাগ, নিষ্ঠা—দেশবাসীর মনে বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলেছিল। ঘটনাগত দিক থেকে এসব বিপ্লবী ক্রিয়া-কলাপকে দেশবাসী সর্বদা সমর্থন না করলেও নৈতিক দিক থেকে দেশের জন্য দুঃখবরণের আদর্শকে সমর্থন অবশ্যই করেছে। পরবর্তীকালে বিপ্লবীর কর্মপন্থাকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার না করলেও 'বকসা দুর্গস্থিত রাজবন্দীদের প্রতি' উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথের 'প্রত্যভিনন্দন' কবিতা বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের আদর্শের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিকে প্রকাশ করে।

"মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী।

১। Majumdar, R. C., Roy Chowdhury, H. C. & Dutta, K. K.—*An Advanced History of India*, London, 1960, p. 981.

'অমৃতের পুত্র মোরা' কাহারা শুনাল বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।"

এই অন্তবর্তীকালের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি। স্বদেশী যুগের আন্দোলন বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হিন্দুর ছিল সংখ্যাধিক্য। কিন্তু বিপ্লবী কাজকর্ম এবার বাংলার বাইরেও আরম্ভ হ'ল। তার ওপর তুরস্কের সঙ্গে ইংরাজের যুদ্ধ[১] মুসলিম জনমানসে ইংরাজ বিদ্বেষ ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গড়ে তুলতে সহায়তা করল। ১৯১৬ সালের লক্ষ্মৌ কংগ্রেসে উভয়ের মিলিত অধিবেশন ও ঐক্যচুক্তি সেদিক থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, তেমনি ভারতের জাতীয়তাবোধের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব গভীর। এযুগে স্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধকে 'হিন্দু জাতীয়তা' বলে চিহ্নিত করার অবকাশ রইল না। মুসলমান সম্প্রদায় জাতীয় আন্দোলনে অধিকতর সংখ্যায় যোগ দিতে লাগলেন। এভাবে, স্বদেশী যুগ থেকে এযুগের জাতীয়তাবোধ বিবর্তিত হয়ে প্রকৃতপক্ষে 'জাতীয়' রূপ ধারণ করল।

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধে ইংরাজ শাসকের সহযোগিতার পেছনে ভারতবাসীর যে প্রত্যাশা ছিল, যুদ্ধ শেষে তা মিটল না। শাসনতান্ত্রিক সংস্কারবিধিও ভারতবাসীর মনে হতাশাই জাগিয়ে তুলেছিল। তারই মধ্যে Rowlatt Committee Report (১৯১৮) প্রকাশিত হ'লে সেটিকে ভারতের স্বাধীনতা স্পৃহার চরম দমন ব্যবস্থা বলে মনে করা হয় এবং তারই ফলে দেশে পুনরায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে পাঞ্জাবের নির্যাতন

১। Turkey'র বিরুদ্ধে Britain এর যুদ্ধ। মুসলমান রাষ্ট্র আক্রান্ত হওয়ায় তাঁদের ধর্মগুরুর ক্ষমতা অপহৃত হবার আশঙ্কায় ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হ'ন। হিন্দুরাও মুসলমানদের এই ভাবনার অংশ গ্রহণ করল। খিলাফত আন্দোলন শুধু ধর্মীয় আন্দোলন মাত্র রইল না, তা শাসকের বিরুদ্ধে শাসিতের আন্দোলন হয়ে জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হ'ল।

ইংরাজ সম্পর্কে ভারতবাসীকে প্রতিবাদে মুখর করে তুলল। জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলীবর্ষণ, পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী ইত্যাদি ঘটনায় দেশবাসী প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ হ'ল। রবীন্দ্রনাথ এই অত্যাচারের প্রতিবাদে গভর্নমেণ্ট-প্রদত্ত 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করে বড়লাটকে লেখেন,

> "...the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen, surprised into a dumb anguish of terror."[১]

এই পর্বের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় দেশপ্রেমিক মানুষ দুইভাবে শাসক বিরোধিতা করেছে—এক, গান্ধীজীর নেতৃত্বে শাসকের সঙ্গে অসহযোগিতা করে ; দুই, বিপ্লবের পথে।

"ত্রিশকোটি কণ্ঠে মায়েরে ডাকিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে এ বিশ্ব নিখিলে"

একদিকে এই রোমাঞ্চকর উপলব্ধি, অন্যদিকে—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।"

এই আদর্শকে তারা নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছে।

স্বদেশী আন্দোলন ছিল জনজাগরণের প্রথম অধ্যায়। অসহযোগ পর্যায়ে জনজাগরণ আরও এক পদক্ষেপ অগ্রসর হয়েছে। দেশবাসীর মনে শাসক গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্রোহের মনোভাব গড়ে উঠেছে। বিদেশী শাসকের অত্যাচার উপেক্ষা করে, শাসক-বিরোধিতা করে সহস্র সহস্র মানুষ কারাবরণ করছে। স্বদেশী যুগে দেশের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও মমতা জন্ম নিয়েছিল, এযুগে তা দুঃখসহা ও তপস্যার আগুনে পুড়ে আরও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে, স্বদেশী যুগের মনোভাব আরও ব্যাপকতা ও দৃঢ়তা লাভ করেছে। বস্তুতঃ স্বদেশী

১। প্রফুল্লকুমার সরকার—পূঃ উঃ, পৃঃ ১০২এ উদ্ধৃত।

ও অসহযোগের মধ্যে ভাবগত কোন বিরোধ নেই, উভয়ে একই আন্দোলনের সোপান-পরম্পরা মাত্র। এক স্তরে আত্মমুখীন ভাবনার প্রাধান্য, তাই অনুভূতি প্রবণতা স্বাভাবিক এবং এই কারণেই এই স্তরে অসংখ্য গান ও গীতিকবিতার জন্ম হয়েছে। অন্য স্তরে, বহির্মুখীন কর্মের আদর্শ গৃহীত হয়েছে। চিন্তা এখানে কর্মে রূপায়িত। মন্ময়তা থেকে দূরে সরে যাওয়ায় সম্ভবত এযুগে স্বদেশপ্রেমের তেমন কাব্যিক অভিব্যক্তি ঘটেনি।

অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শ স্বদেশী আন্দোলনের বিবর্তন পথে সঙ্গত কারণেই দেখা দিয়েছিল। জাতীয় আন্দোলন প্রবাহে এই চিন্তা আকস্মিকভাবে দেখা দেয়নি। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে আইনভিত্তিক, নিয়মতান্ত্রিক পথে জাতীয় আন্দোলনকে পরিচালিত করে নেতৃবৃন্দ সবদিক থেকেই হতাশাময় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। এবার তাই সেই পথ ছেড়ে সম্পূর্ণ নূতন পথের সন্ধান করা হ'ল। তাহ'ল এই গণ-আন্দোলনের পথ। ভারতের স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে নূতন আদর্শ, নূতন কর্মপ্রণালী নিয়ে আবির্ভূত হলেন গান্ধীজী। তাঁর নেতৃত্বকালেই (১৯১৯-১৯৩৪) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস জনসমর্থন লাভ করে প্রগতিশীল সংস্থায় পরিণত হ'ল।

স্বদেশী যুগের মনীষীবৃন্দের মধ্যে অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, অনেকেই আন্দোলনের আবেগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর ব্যক্তিমানস এঁদের থেকে স্বতন্ত্র। এই আন্দোলনের মর্মস্বর তাঁদের গানে ঝংকৃত হ'য়ে ওঠার অবকাশ পায়নি।

ঐতিহাসিক কারণ বিশ্লেষণ করে যেমন অসহযোগ পর্যায়ে স্বদেশী গানের অনুপস্থিতি বিশ্বাসযোগ্য বলে অনুমিত হয়, তেমনি সাহিত্যিক নানা কারণেও এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাঙালীর স্বদেশী গানের একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বন্দেমাতরম্ গানটি তখন সর্বভারতীয়

জাতীয় সংগীতের মর্যাদা লাভ করেছে এবং 'বন্দেমাতরম্' শব্দটি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের স্লোগানে পরিণত হয়েছে। অনুরূপ কোনও গান রচনার প্রেরণা গীতিকারদের মনে জাগেনি। নতুন গান রচনার অনুপ্রেরণা এযুগে নেই বললেই চলে। প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথাও মনে রাখতে হবে। হিন্দুমেলা থেকে আরম্ভ করে বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত বহু গান সৃষ্টি হয়েছে। এই গানের ডালিতে বিবিধ ভাবের—প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, আত্মনির্ভরতা, দেশসেবার কর্মসাধনা—প্রভৃতি সবেরই অভিব্যক্তি ঘটেছে। অসহযোগ পর্যায়ের ভাবের সঙ্গে তাদের একাত্মতা থাকায় সেসব গানই নতুন করে বারবার গাওয়া হচ্ছে। এবং বহুগান পুনঃপুনঃ গীত হওয়ায় একটা বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিল, তা প্রধানত সাহিত্যিক বা শিল্পগুণের জন্য নয়, মূলত তাদের ঐতিহাসিক মূল্যের জন্য। তাছাড়া বঙ্গভঙ্গ যুগের অনেক গানকে তাদের ঘটনাগত তাৎপর্য্য ও উপযোগিতা থেকে বিশ্লিষ্ট করে নতুনভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এযুগে।[১]

এযুগের নতুন গানের অনুপস্থিতির অন্যতম প্রধান কারণ অনুমান করি অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে কবি-গীতিকারদের আত্মিক সংযোগের অভাব। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৮-এর পর থেকেই প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে সরে গেছেন। ভারতের নানা রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া, দেশের ও জাতির স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে অকুণ্ঠিত সহযোগিতা করলেও স্বদেশী যুগের আবেগে তিনি যে অসংখ্য স্বদেশী গান রচনা করেছিলেন, তার স্রোত এখন মন্দীভূত, প্রায় স্তব্ধ। স্বদেশী যুগের গানের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক ফসল রবীন্দ্রনাথের দান সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আবেগবন্যা দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ প্রমুখ কবি-গীতিকারের হৃদয় স্পর্শ করায় তাঁদের লেখনী মুখেও স্বদেশী গানের জন্ম হয়েছিল। এর ফলে এই

১। ক্রোড়পঞ্জী–৫ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২১১

পর্বে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের মিলিত দানে বাংলা গানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল।

যদি রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলন সর্বান্তঃকরণে সমথন করতেন, প্রত্যক্ষভাবে না হ'লেও পরোক্ষভাবে যোগ দিতেন তাহ'লে হয়ত তিনিই এযুগের জন্য নতুন গান রচনা করতেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শ রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেননি। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে 'শিক্ষার মিলন' ও 'সত্যের আহ্বান' নামে পর পর দুইটি বক্তৃতায় তিনি গান্ধীজীর অবলম্বিত পন্থার প্রতিবাদ করেন। প্রথম প্রবন্ধটিতে অসহযোগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোনো সমালোচনা না করলেও 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে তা স্পষ্টতর করলেন (১৩ই ভাদ্র, ১৩২৮।১৯২১)। স্বদেশী যুগের আন্দোলনের সঙ্গে অসহযোগের তুলনামূলক বিচার করে তিনি বলেন, "বঙ্গ বিভাগের আন্দোলনের পরে এবার দেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার পরিমাণ আরও অনেক বড়ো, সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তার প্রভাব। ··· মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরীবের দ্বারে—তাদেরই সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। ··· প্রেমের দ্বারা দেশের হৃদয়ের এই যে প্রেম উদ্বেলিত হয়েছে—এইটাই মুক্তি, এইটেই দেশের আপনাকে পাওয়া।" কিন্তু অসহযোগ নীতির সঙ্গে গান্ধীজীর দেশবাসীকে চরকা কেটে সুতা তৈরীর আদেশ দান এবং এক বৎসরকাল লোকে এই উপদেশ পালন করলে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ হস্তগত হ'বে—এই আশ্বাস দান রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেননি। কবির মতে, "কোনো একটা বাহ্যানুষ্ঠানের দ্বারা অদূরবর্তী কোনো একটা বিশেষ মাসের বিশেষ তারিখে স্বরাজ লাভ হবে একথা যখন অতি সহজেই দেশের অধিকাংশ লোক বিনা তর্কে স্বীকার করে তখন বুঝতে হবে তারই মধ্যে দেশের অস্বাভাবিক মনোবিকারের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।" গান্ধীজীর আদর্শকে কঠোর আঘাত করে তিনি বললেন, "এ যেন সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাস। ··· অতি

সত্বর অতি দুর্লভ ধন অতি সস্তায় পাবার একটা ··· আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজের বিচার-বুদ্ধি অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতে পারে।" বিদেশী-কাপড় 'অপবিত্র' কাজেই তা পুড়িয়ে ফেলা হোক—মহাত্মাজীর এ নীতিও কবি অমান্য করলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্র সীমিত থাকলেও জাতির বিচিত্র শক্তি একে কেন্দ্র করেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। অন্যদিকে অসহযোগের ক্ষেত্র ব্যাপকতর হয়েও এই আদর্শ থেকে দূরে সরে যাওয়ায় দেশপ্রেম রবীন্দ্রনাথের মতে এক সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল—এই কারণেই তিনি এই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করলেন না। কর্মের দিক থেকে যেমন তিনি এই আন্দোলনের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চললেন, তেমনি এর ভাবাদর্শও তাঁর সংগীতের প্রেরণা হ'তে পারল না। ঐ সময়েই (১৭, ১৮ই ভাদ্র, ১৩২৮।১৯২১) বর্ষার আগমনে তাঁর অন্তরে সাড়া জেগেছে, 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠানের জন্য তিনি গান রচনা করে চলেছেন, সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন, কিন্তু দেশপ্রেমের নতুন আদর্শ তাঁর গানে বাণীরূপ পেল না। এযুগে কবির অন্তরের গীতশ্রী ও রাজনৈতিক ভাবনা যুক্তবেণী রচনা করে সংগীতধারায় উৎসারিত হয়নি।

স্বদেশী যুগের প্রধান গীতিকারদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল (১৯১৩) রজনীকান্ত (১৯১০) ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৯০৭) এযুগে মৃত। অতুলপ্রসাদের গীতধারা স্বদেশপ্রেমের প্রবাহ পরিত্যাগ করে অন্য পথগামী। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার এবং আধুনিক কবি সম্প্রদায় কেউই রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলালের মত গীতিকার ছিলেন না। প্রবীণ গীতিকারেরা এই আন্দোলনের সঙ্গে ভাবের একাত্মতা খুঁজে না পেয়ে দূরে সরে গেলেন। নবীন কবিরা কেউ গীতিকার নন—ফলে এই গণ-আন্দোলন কর্মেরই আন্দোলন হ'য়ে রইল, নবীন সংগীতধারার উৎস হ'য়ে উঠল না।

কিন্তু সমস্ত কিছুরই ব্যতিক্রম আছে। এবং এখানে ব্যতিক্রম রূপেই একটি নাম উল্লেখ করতে হয়—তিনি কাজী নজরুল ইসলাম।

তিনি ছিলেন এযুগের একজন জনপ্রিয় গীতিকার। অসহযোগ আন্দোলনকালে একদিকে তিনি গান রচনাও করেছেন, অন্যদিকে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে কারাবরণও করেছেন। কিন্তু তাঁরও মানসিক ঐক্য ছিল না অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে। গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিলেও নজরুলের যে আদর্শ "তাহা নৈষ্কর্ম্য অসহযোগ নহে—সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিদ্রোহের বাণী প্রচার হইল তাহার কর্মরূপ।"[১] এই সময়ে লেখা (১৯২৬, এপ্রিল) তাঁর বিখ্যাত গান—'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।' এই গানের—

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে
লংঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।
... ...
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান ?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার॥"[২]

বিদ্রোহী কবির অশান্ত তূর্য্যের গর্জ্জন শুনি এসকল গানে। তাঁর দেশাত্মবোধক গানগুলিতে শাসকের বিরুদ্ধে বিপ্লবের, বিদ্রোহের

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—পূঃ উঃ, পৃঃ ১৩৬

২। ১৯২৬-এর এপ্রিলে কোলকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার আবহাওয়ায় মে মাসে কৃষ্ণনগরে তিনটি সম্মেলন হয়। এই তিনটি সম্মেলনের জন্য ব্যস্ততা সত্ত্বেও "সে সম্মেলনের উদ্বোধনী সংগীত শুধু রচনা করেনি, সেই সংগীতগুলিতে সুর দিয়েছিল এবং সম্মেলনগুলিতে গানগুলি সে গেয়েও ছিল। ... বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য সে লিখেছিল 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'।" মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ (ক)—কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা, ১৯৬৯, পৃঃ ৩৬৮

ভাবই ফুটে উঠেছে। তাঁর বিদ্রোহী সত্তার যোগ ছিল তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে। নজরুলের স্বদেশী গান তাই রণঝংকার।

অসহযোগ পর্যায়ে স্বদেশানুরাগে উদ্বুদ্ধ দেশবাসীর সামনে সুনির্দিষ্ট কর্মপ্রণালী তুলে ধরে সুস্পষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করার প্রয়াস হ'ল। বিদেশী বর্জন সেই কর্মের একটি অঙ্গ। এই বিষয়ে গান রচনা করা হয়েছিল স্বদেশী যুগেই। এযুগে ঐ বিষয় নিয়ে নতুন গান রচনার আর প্রয়োজন হয়নি। অবশ্য অসহযোগ পর্বে বিলাতি পণ্য বর্জন বা বিলাতি বস্ত্র বর্জনই নয়—বিদেশী শাসকের সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগিতার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ইংরাজের বিচারালয়, সরকারী স্কুল-কলেজ, রাজ্য পরিষদের নির্বাচন, সরকারী সম্মানসূচক উপাধি, বিদেশী পণ্য, বিলিতি মদ—ইত্যাদি বর্জন করে শাসক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগিতার এই আদর্শ দেশপ্রেমী কর্মীদের মনে উন্মাদনা জাগিয়েছে। জওহরলাল নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতে এই অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> "Many of us who worked for the Congress programme lived in a kind of intoxication during the year 1921. We were full of excitement and optimism and a buoyant enthusiasm. We sensed the happiness of a person crusading for a cause .... Above all we had a sense of freedom and a pride in that freedom. The old feeling of oppression and frustration was completely gone."[১]

এই আদর্শ রূপায়ণের সাফল্য তাদের মনে গর্ব ও পরিতৃপ্তিবোধ জাগিয়ে তুলেছে। কিন্তু এই নতুন উন্মাদনা থেকে নতুন গানের জন্ম হয়নি।

১। Nehru, Jawaharlal—*An Autobiography* London, 1955, p. 69.

১০

অসহযোগ আন্দোলনকে অবলম্বন করে যেমন নতুন গানের সৃষ্টি হয়নি, তেমনই বিপ্লবীদের কর্ম ও আদর্শ অবলম্বনে বিশেষ গানের সৃষ্টি হয়নি। ১৯০৫ সাল থেকে বিক্ষিপ্তভাবে আরম্ভ হ'য়ে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত প্রায় পঁচিশ বছর ধরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বাংলার বুকে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত না থাকলেও তারই পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদের প্রবাহ গতিশীল ছিল। জনসাধারণ অবশ্য একে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম ধারা হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। নরহরি কবিরাজ লিখেছেন—"সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন পরিচালিত হত কতকগুলি গুপ্ত সমিতির উদ্যোগে। কাজেই এই আন্দোলনের মঞ্চ থেকে যে সাহিত্য প্রচার করা হ'ত তাও ছিল গুপ্ত সাহিত্য।"[১] গোপন ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে আন্দোলন পরিচালিত হওয়াতে সন্ত্রাসবাদী আদর্শ নিয়ে গান রচনার কোন অবকাশ ছিল না। তবে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী যুগে রচিত গানগুলির মধ্যে বিপ্লবীরা যে আপন বৈপ্লবিক কর্মসাধনার আদর্শ খুঁজে পেতেন, তা বিপ্লবীদের স্মৃতিকথায়[২] উল্লিখিত নানা অভিজ্ঞতাব বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। স্বদেশী যুগের মত প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশী গান রচনার সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও বিপ্লবীদের ওপর স্বদেশী গানের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব স্বীকার করতেই হয়।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ গান বিপ্লবীদের কাছে তাঁদের কর্মের আদর্শ ও প্রেরণার উৎস বলে গৃহীত

১। নরহরি কবিরাজ—স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা, ১৯৫৭, পৃঃ ২২৪

২। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নির্বাসিতের আত্মকথা (১৯৬০); ভূপেন্দ্র-কিশোর রক্ষিতরায়—ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব (১৯৭০); যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়—বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি (১৯৫৬); নলিনীকিশোর গুহ—পৃঃ উঃ প্রভৃতি।

হয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন,

"... they found their only solace in singing by brooke-side, in evenings or dark nights, those songs or poems which urged them to move forward, even if everyone deserted them, amid thunder and lightning, with a heart made of steel and an adament resolve."[১]

যখন আলিপুর বোমার মামলার বিচারে উল্লাসকর দত্ত ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয় তখন উল্লাসকর গান ধরেন "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।"

যে সকল গানে স্পষ্টতঃ বিপ্লবের কথা ছিল, যেমন 'বন্দেমাতরম্' বা নজরুলের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গানটি—সেগুলি বিপ্লবীদের কাছে অতি জনপ্রিয় ও প্রচলিত ছিল। এছাড়া অন্যান্য গানও বিপ্লবীরা তাঁদের নিজস্ব চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত করে গ্রহণ করেছিলেন। "রবীন্দ্রনাথের অনেক গান বিপ্লববাদীরা তাহাদের কাজে লাগাইয়াছে। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে" কবি যে উদ্দেশ্যেই লিখুন, বিপ্লববাদী তাহার খোঁজ রাখিত না। সে তাহার নিজ প্রয়োজনেই তাহা ব্যবহার করিত।"[২] "...'অমল ধবল পালে লেগেছে' কবি কি উদ্দেশ্যে গানটি লিখিয়াছিলেন কবিই বলিতে পারিতেন, কিন্তু বিপ্লববাদীরা সেই গানের মধ্যেও তাহাদের কথাই শুনিল। কোন কোন বিপ্লববাদীর মুখে ব্যাখ্যা শুনিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথ গানটি লিখিয়াছিলেন নবীন বাংলার এই নূতন বিপ্লব পথের যাত্রাকে লক্ষ্য করিয়া। ...দেশের কাব্য, সাহিত্য, সকলই তাহারা তাহাদের বিপ্লবের দিক হইতে বুঝিতে চাহিত।"[৩]

স্বদেশী যুগের অজ্ঞাত কবি রচিত ক্ষুদিরামের ফাঁসির গানটিও মৃত্যুপথ যাত্রী বন্দী বিপ্লবীর অন্তরে শক্তি দিয়েছে। গয়া সেণ্ট্রাল

১। Majumdar, R. C.—*op.cit.*, Vol. II, pp. 475-76.

২। নলিনীকিশোর গুহ—পূঃ উঃ, পৃঃ ৫৭

৩। তদেব, পৃঃ ৬৯-৭৩

জেলের বৈকুণ্ঠ সুকুল ফাঁসির আগের রাতে বিভূতিভূষণ দাশগুপ্তের কাছে ক্ষুদিরামের গানটি শোনানোর অনুরোধ করেছিল। "...দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুরু করলাম গান। গরাদ ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে গাইছি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে—আর এক ক্ষুদিরাম শুনতে চাইছে সেই ক্ষুদিরামের গান...।"[১]

বন্দেমাতরম্ গান ও ধ্বনি শুধু বিপ্লবীদের কাছেই নয়, পরবর্তীকালের ৪২'র আন্দোলনেও দেশসেবীর প্রাণে শক্তি ও সাহস সঞ্চারিত করেছে।

নজরুল ইসলামের গানও বিপ্লবীদের প্রাণে উন্মাদনা, উৎসাহ, উদ্দীপনা জাগিয়েছে, তা নিঃসংশয়ে ধরে নেওয়া যেতে পারে। নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার সঙ্গে বিপ্লবীরা স্বতঃই একাত্মতা উপলব্ধি করতে পারেন। বিদেশী শাসকের অত্যাচার, পরাধীনতার বন্ধন—ইত্যাদির বিরুদ্ধে যেমন তাঁর বিদ্রোহ, তেমনি প্রত্যক্ষ আঘাত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রতি। এই দু'দিক থেকেই নজরুলের আদর্শ বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', 'কারার ঐ লৌহকপাট', 'শিকল পরা ছল'—প্রভৃতি গান ছিল তাঁদের নৈতিক শক্তির উৎস।

বাংলা স্বদেশী গানগুলি বিশেষ কোন যুগে রচিত হ'লেও স্থান-কাল নির্বিশেষে চিরন্তন মূল্য যে লাভ করেছে, স্বদেশী যুগের গানগুলির পরবর্তীকালের ব্যবহারের মাধ্যমে তাই প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সকল পর্যায়ে নতুন গান রচনা হয়ত সম্ভব হয়নি, কিন্তু স্বদেশী গানের সঙ্গে এই আন্দোলনের সংযোগসূত্র কোনও যুগেই ছিন্ন হয়নি।

সেইজন্যই বাংলা স্বদেশী গানের বিচার করতে হ'বে রাজনৈতিক পটভূমিকায়। সেই পটভূমিকার কথাই এখানে বলা হ'ল—এখন আমরা স্বদেশী গানের ভাববস্তু ও আঙ্গিকের আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি।

১। চিন্মোহন সেহানবীশ—পূঃ উঃ, পৃঃ ১৬৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বদেশী গানে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবনা

১

বাংলা দেশপ্রেমের গান, যাকে আমরা স্বদেশী গানরূপে অভিহিত করেছি, বিষয়বস্তুর দিক থেকে তা নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই গানগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই দেশের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার প্রকাশ। কিন্তু নিছক উচ্ছ্বাস বা কবিত্বময় অনুভূতির প্রকাশেই গানগুলির সম্পূর্ণ সার্থকতা নয়। এই গানগুলির মধ্য দিয়ে সমকালীন অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক চিন্তা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেইসব গানগুলি যে শিল্পের দিক থেকে সার্থক এমন বলা চলে না। কিন্তু স্বদেশী গানগুলি জাতির বিভিন্ন চিন্তা ও মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কতটা ব্যাপকতা ও ক্ষমতা অর্জন করেছিল তার প্রমাণ আছে এইসব গানে।

জনতার মনে জাতীয়তার ভাব উদ্বুদ্ধ করতে যেসব ঘটনা প্রত্যক্ষত দায়ী, তার একটি ছিল নীলচাষের হাঙ্গামা। সমগ্র ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিতে এই ঘটনাটি সামান্য হ'লেও এর বেদনা ও আবেদন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। মধ্যবিত্ত শিক্ষিতেরা যে এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ'ল দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ (১৮৬০) নাটক। পল্লীবাংলার সাধারণ চাষীর ওপর ইংরাজ নীলকরদের অত্যাচার ও লাঞ্ছনার ছবি এই নাটকে পরিস্ফুট হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন নীলদর্পণের "গানের ভাব স্বদেশী গানের ভাব হইতে ভিন্ন হইলেও দেশের দুর্দ্দশার কথা হিসাবে ইহার

ঐতিহাসিক মূল্য বড় কম নয়। এই প্রথম এক প্রকারের গণ-আন্দোলনের পথে গান রচিত হইল এবং তাহা গীত হইল। এ গানের বিষয় ইংরাজ আমলে দেশের দুরবস্থা।"[১] প্রকৃতপক্ষে 'ইংরাজ আমলে দেশের দুরবস্থা' ক্রমশই স্বদেশী গানের একটি শাখার অন্যতম উপাদানরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। হিন্দুমেলার যুগে কতকগুলি গানে তার প্রমাণ। দুরবস্থার জন্য বেদনা ও উষ্মা যেমন গানগুলির একটি দিক, অন্যদিকে এই দুরবস্থার জন্যই জাতীয় উন্নতির সংকল্প চিন্তা যেমন কর্মে তেমনই গানে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

হিন্দুমেলার বিভিন্ন অধিবেশন উপলক্ষে বা অন্য সময়ে যেসব দেশাত্মবোধক গান রচিত হয়েছিল, তাতে স্বাবলম্বন ও স্বাজাত্যবোধ —এই দু'টি আদর্শ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল। এসকল গানে ভারতের অতীত গৌরবের মহিমা ব্যক্ত হয়েছে, আবার দেশের বর্তমান দৈন্য, হতশ্রী, লুপ্তগৌরব, দীনমলিন অবস্থার চিত্রও অংকিত হয়েছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল যে কয়েকটি গানে এই দৈন্য-দুর্দ্দশার কারণ নির্ণয়ের চেষ্টাও করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে বিদেশী শাসন-শোষণ, দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের বিনষ্টি—ইত্যাদি দেশের দুরবস্থার কারণরূপে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'সম্পদ শোষণ' চিন্তা শিক্ষিত বাঙালীর মনে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেনি, কিন্তু রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের ভাষায়—

> "There was a kind of drain theory in Bengali patriotic songs before its sophisticated formulation by our economists. It was the drain theory of those who were the victims of the drain."[২]

১। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত—পূঃ উঃ, পৃঃ ১৯-২০

২। Das Gupta, R. K.—"Sakharam Ganesh Deuskar : The man and his work", Lecture delivered at India International Centre, N. Delhi, 1971 unpublished, p. 8.

হিন্দুমেলার গানে অর্থনৈতিক শোষণ মুখ্য চিন্তারূপে প্রকাশ পায়নি। কিন্তু হিন্দুমেলা পরবর্তী ও প্রাক্-স্বদেশী যুগের মনীষীদের চিন্তায় এটি একটি তত্ত্বে পরিণত হ'ল।

বস্তুতঃপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরের ভারতের জাতীয় চিন্তার মধ্যে এক নূতন সুর ধ্বনিত হয়েছিল। এই নূতন চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল—ঔপনিবেশিক দেশের অর্থনীতির পর্যালোচনা। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন,

> "Politics was ceasing to be an exercise in liberal rhetoric and demanded economic analysis as the most effective argument against colonial rule."[১]

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে দাদাভাই নৌরজীর লণ্ডনে প্রদত্ত "England's Duties to India"—ভাষণেই এই সম্পদ শোষণ চিন্তার সূত্রপাত ঘটে। বাঙালী অর্থনীতিবিদ্দের চিন্তায় অর্থনৈতিক শোষণ প্রসঙ্গটির সূচনা হয় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন মল্লিকের *A Brief Survey of Bengal Commerce* নামক গ্রন্থ প্রকাশের পর। এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে, 'ভারতবর্ষের বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, ভারতবর্ষ পূর্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইতেছে।

এই সময় ভোলানাথ চন্দ্র 'মুখার্জ্জিস ম্যাগাজিনে' সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখছিলেন। দেশের অর্থনৈতিক ও শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক কৃষ্ণমোহনের সিদ্ধান্তগুলি তাঁর কাছে ভ্রান্তিমূলক বলে মনে হয়। তাঁর মতে, "ইংরাজ বণিকগণই অধিকাংশ ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহারাই অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, স্বদেশীরা কিছুই পাইতেছেন না। অনেক স্বদেশীয় শিল্প একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিকের দৃষ্টিতে দেখিলে দেশ যে দিন দিন দরিদ্র ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছে, ইহাতে সন্দেহ থাকে না।"[২]

১। *Ibid.*, p. 6.

২। মন্মথনাথ ঘোষ—মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র, ১৯২৪, পৃঃ ১৬৮-৬৯

দাদাভাই নৌরজী ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করে বলেন,

"The drain of India's wealth on the one hand, and the exigencies of the state expenditure increasing daily on the other, set all the ordinary laws of political economy and justice at naught, and lead the rulers to all sorts of ingenious and oppressive devices to make the two ends, meet, ... Owing to this one unnatural policy of the British rule of ignoring India's interests, and making it the drudge for the benefit of England, the whole rule moves in a wrong unnatural and suicidal groove."[১]

নৌরজীর বক্তব্য ও ভোলানাথ চন্দ্রের যুক্তি সে যুগের কবিদের প্রাণেও সাড়া জাগিয়েছিল। পরবর্তীকালে গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'স্বদেশ' (নব্যভারত, পৌষ, ১৩১৪ | ১৯০৭) কবিতায় অনুরূপ চিন্তারই ছন্দোময় প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

"স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এ দেশ তোমার নয়,—
এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোমার ইহা হ'ত যদি,
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্ম্মা ভরা চুনি মণি,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয়?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়!"

দাদাভাই নৌরজীর মতে শুধু দেশীয় শিল্পের বিনষ্টিই দেশের দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ নয়। তিনি বলেন,

"The chief cause of India's poverty, misery and all material evils, is the exhaustion of its previous

১। Nauroji, D.—*Poverty and Un-British Rule in India* (London 1901) Indian Ed. 1962, p. 109.

wealth, the continuously increasing exhausting and weakening drain, from its annual production . and the burden of a large, amount a year to be paid to foreign countries for interest on the public debt, which is chiefly caused by the British rule."[১]

তিনি ভারতের কাছে ইংলণ্ডের ঋণের পরিমাণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেন যে বৃটেন ভারত-শাসনের মূল্যস্বরূপ ভারতের সম্পদ শোষণ করছে।

"...out of the revenues raised in India, nearly one-fourth goes clean out of the country, and is added to the resources of England, and that India was consequently 'being continuously bled'."[২]

ভারতবর্ষ থেকে বছরে চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বিলেতে চলে যায়। এছাড়া দেশের শিল্প প্রভৃতি বিনষ্ট হওয়াতে শ্রমিক, মজুরদের দৈনিক আয় আরও কমে যায়। এই অবস্থায় যে কোনও ধনী দেশই দরিদ্র হ'য়ে পড়ে, ভারতবর্ষের তো কথাই নেই।

"This annual drain of £ 3,000,000 on British India has amounted in 30 years, at 12 percent (the usual Indian rate) compound interest, to the enormous sum of £ 723,997,971 sterling or at so low a rate as £ 2,000,000 for 50 years to 8,400,000,000. So constant and accumulating a drain even on England would soon impoverish her ; how severe then must be its effects on

১। Nauroji, D. *op. cit.*, p. 123.

২। Chandra, Bipan—*The Rise and Growth of Economic Nationalism in India,* N. Delhi, 1966 p. 637.

India, where the wages of a labourer is from two pence to three pence a day" ?[১]

ইংরাজের পক্ষপাতপূর্ণ বাণিজ্য নীতি, শাসনের অজুহাতে অর্থশোষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে দাদাভাই নৌরজী তীব্র মন্তব্য করেন তাঁর 'Poverty of India' (১৮৭৩) প্রবন্ধের উপসংহারে ভারতের প্রতি ইংরাজ শাসকের অসম, ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী নীতি লক্ষ্য করে তিনি লিখেছিলেন,

"Nature's laws cannot be trifled with and so long as they are immutable, every violation of them carries with it its own Nemesis, as sure as night follows day."[২]

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীনে ভারতের অর্থ অপচয়ের যে পরিমাণ ছিল, ইংরাজ শাসনে তা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোলানাথ চন্দ্রও বলেন যে,

"Money then poured out through a single channel but now it pours away through a thousand outlet."[৩]

মুঘল বা মারাঠা শাসকদের দ্বারাও দেশবাসী শোষিত হয়েছে। কিন্তু তখন দেশের ধন দেশের বাইরে যায়নি। কিন্তু বৃটিশ শাসনে দেশের ধন বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ব্যয় করা হয়েছে নিজের

১। ফ্রান্সিস বুকাননের তদন্তের বিবরণের পাণ্ডুলিপির ওপর ভিত্তি করে মণ্টগমরি মার্টিন ৩ খণ্ডে যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তার ভূমিকা থেকে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের কংগ্রেস ও বাংলা গ্রন্থে উদ্ধৃত। ১৯৩৫, পৃঃ ৮৯-৯০

২। Quoted by Chandra, Bipan—*op. cit.*, p. 639.

৩। *Ibid.*, p. 641 Vide *Mukherjee's Magazine*, Vol. II, 1873, pp 89-90.

দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য। এ প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র লিখেছেন—

> "...in the case of British rule, the drain was a part of the existing system of government and was, therefore, ceaseless and continuous, increasing from year to year. The wounds were thus kept perpetually open and the drain was like a running sore."[১]

এই শোষণের পথ ছিল প্রধানতঃ ত্রিমুখী—(১) ভারতের সৈন্য, রেল ও শাসন বিভাগে ইউরোপীয় কর্মচারী নিয়োগ করা, (২) হোমচার্জ বা দেশ শাসনের জন্য প্রদত্ত কর, (৩) ভারতের শিল্প-বাণিজ্যে বিদেশের ধনীদের ব্যক্তিগত অর্থ বিনিয়োগ—এই ত্রি-ধারায় অর্থ অপচয়ের স্রোত ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হ'য়ে উঠেছে। এই শোষণের পরিমাণ সঠিক কত—তা নিয়ে অর্থনীতি-বিদ্‌দের মধ্যে মত পার্থক্য থাকলেও ১৮৩৫—১৮৭২ সালের মধ্যে তা যে ঊর্ধ্বমুখী গতি লাভ করেছিল, তাতে তাঁরা সকলেই একমত ছিলেন।

ভোলানাথ চন্দ্র দেশের আর্থিক দুরবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনুযোগ করেন যে, "ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের সম্বন্ধে কেহ বড় একটা আলোচনা করেন না। ...বাণিজ্যলব্ধ অর্থের অধিকাংশ বিদেশে যাইতেছে। দেশবাসী দিন দিন দরিদ্র হইতেছে। বাণিজ্য সম্বন্ধে গবর্নমেণ্ট কর্তৃক অনুসৃত নীতির পরিবর্তন আবশ্যক —আমদানী বাণিজ্য দ্রব্যের উপর কর বসাইয়া এবং রপ্তানী দ্রব্যের ওপর কর তুলিয়া দিয়া সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন না করিলে স্বদেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের ধ্বংস অনিবার্য্য।"[২]

১। (ক) Ganguly, B. N., *Dadabhai Nauroji and the Drain Theory*, Bombay, 1965, এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ; ও
(খ) Chandra, Bipan—*op. cit.*, p. 644.

২। মন্মথনাথ ঘোষ—পূঃ উঃ, পৃঃ ১৭৫

বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ম্যাঞ্চেষ্টারের সুলভ কাপড়ের আমদানীতে দেশবাসী উপকৃত হয়েছে—কৃষ্ণমোহনের এই অভিমতও ভোলানাথ চন্দ্র স্বীকার করেননি। কৃষ্ণমোহন দেশের অতীত শিল্পগৌরব শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য করেননি, তিনি সরকারী সিদ্ধান্তের পুনরুক্তি করেছিলেন শুধু। ভারতবর্ষ যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহায়তা ছাড়াই অতীতে শিল্পক্ষেত্রে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ভোলানাথ চন্দ্র লিখলেন,

> "To strip naked the disguised truth the English want to reduce us all to the condition of agriculturists....Let us receive a commercial and industrial education....and with, perhaps at starting, a bit of patriotism to refuse to buy foreign goods, the children of India will prove to the world whether providence has willed them to be mere agriculturists, or whether they cannot dethrone King Cotton of Manchester, and once more re-establish their sway in the cotton world."[১]

রমেশচন্দ্র দত্তও তাঁর *Economic History of India* (1901) গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন যে ভারতের রাজস্বের অর্ধেক টাকা ভারতের বাইরে চলে যায় এবং ভারতের ধনেই অন্যদেশ ধনী ও সমৃদ্ধ হচ্ছে।[২]

দেশের সাধারণ লোকের সামনে দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশার চিত্র উপস্থাপিত করে বিদেশী শাসকের প্রতি বিরূপ মনোভাব ও নিজের

১। মন্মথনাথ ঘোষ—তদেব, পৃঃ ১৮৭-১৮৮

২। Dutt, R. C.—*The Economic History of India*, Vol. 1 (Early British Rule) London (1901) গ্রন্থে লিখেছেন, "Verily the moisture of India blesses and fertilises other lands." London, 1969, p. XV.

দেশের প্রতি গভীর মমতা ও সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে এযুগের কয়েকটি তথ্যপূর্ণ অর্থ নৈতিক ইতিহাস গ্রন্থ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তারমধ্যে নৌরজীর *Poverty and Un-British Rule in India* (1901) ; রমেশচন্দ্র দত্তের *Economic History of India* (1901) ; ডিগবীর *The Prosperous British India* (1901) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলায় লিখিত দেশের কথায় (১৯০৪) সখারাম গণেশ দেউস্কর অর্থ নৈতিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন। ডিগবীর গ্রন্থে ভারতীয়দের জীবনযাত্রার মান যে ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে, তা দেখানো হয়েছে। "তাঁর প্রচ্ছদপটে লিখিত ছিল, ১৮৫০ অব্দে ২ পেনী, ১৮৮০ তে ১½ পেনী, ১৯০০ তে ¾ পেনী ; অর্থাৎ ভারতীয়দের মাথা পিছু আয়"[১] কীভাবে কমেছে, তাই তিনি ব্যঙ্গভরে 'সমৃদ্ধ ভারতে' দেখালেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে এই 'অপচয় নীতি' নিয়ে দেশে বিদেশে বহু তর্ক-বিতর্কের পর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কোলকাতা অধিবেশনে তা সরকারী-ভাবে গৃহীত হয় এবং দেশের দুরবস্থার জন্য বিদেশী শাসকের শোষণ নীতির নিন্দা করা হয়। এযুগের দেশের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা সম্পর্কে সচেতনতা ও দুর্দ্দশা মোচনের উপায়স্বরূপ বিদেশী পণ্য বর্জনের সিদ্ধান্ত এবং হিন্দুমেলা যুগের স্বাবলম্বন ও স্বদেশী শিল্পের উন্নয়নের নীতির সংযোগেই স্বদেশী যুগে ইংরাজ শাসকের বিরোধিতার প্রথম ও প্রধান অস্ত্ররূপে 'বয়কট্' প্রস্তাব সূচিত হয়।

অর্থনীতিবিদেরা এই শোষণের ফলে ভারতের আর্থিক দুর্গতি কোন সীমায় এসে পৌঁছেছে, তা নির্দ্ধারণে ব্যস্ত ছিলেন। এই অর্থ নৈতিক শোষণের পরোক্ষ প্রভাব কতটা এবং তা কীভাবে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছে, সেদিকে তাঁরা দৃষ্টিপাত করেননি তেমন। কিন্তু 'দেশের কথা'তে সখারাম এই শোষণ নীতির সর্বব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। নৌরজীর 'Moral Poverty

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—পূঃ উঃ, পৃঃ ৮৪, বর্তমান সংস্করণে নেই।

of India' প্রবন্ধের বক্তব্য

> "For the same cause of the deplorable drain, besides the material exhaustion of India, the moral loss to her is no less sad and lamentable. With material wealth go also the wisdom and experience of the country."[১]

সখারামের অভিমতের সঙ্গে অভিন্ন। দেশকে এই আর্থিক ও মানসিক অবনতি থেকে রক্ষা করার পথ নির্দেশ সখারাম দেউস্কর দিয়েছেন এইভাবে—"পাশ্চাত্য সংস্রবে আমাদিগের সমাজ শরীরে যে বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে ; যে জাতীয় ও নৈতিক অধঃপতনের বীজ সর্বত্র উপ্ত হইয়াছে, তাহার অনিষ্টকারিতা দূর করিবার পক্ষে স্বজাতি-প্রেমই একমাত্র উপায়।"[২] ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেম এভাবে অর্থনীতি চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শুধু ভাব-প্রবণতাতে আবদ্ধ রইল না, তা একটি স্থির কর্ম-পন্থা ঠিক করতে বাধ্য হ'ল।

২

হিন্দুমেলার ভাবের যুগ স্বদেশী আন্দোলনের সময় কর্মের যুগে রূপান্তরিত হ'ল। দেশকে দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে উদ্ধারের জন্য দেশবাসী আর পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে চাইল না। আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন করে দেশের অর্থনীতিকে স্বদেশী গঠন দেবার চেষ্টা আরম্ভ হ'ল। হিন্দুমেলায় এই আদর্শের সূচনা, স্বদেশী যুগে তার প্রতিষ্ঠা। হিন্দুমেলা ও পরবর্তী স্বদেশীর এখানে আদর্শগত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তবে এযুগে স্বাবলম্বন, আত্মপ্রতিষ্ঠার ওপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে বুচের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

> "The Swadeshi Movement was essentially a movement of self-reliance. It was the first

১। Das Gupta, R. K.—*op. cit.*, p. 18.

২। সখারাম গণেশ দেউস্কর—দেশের কথা, ১৯০৪, পৃঃ ৩১৯

serious attempt on the part of the Indians to take their economic destinies into their own hands."[১]

দুই যুগের আদর্শের এই সূক্ষ্ম ব্যবধান গানগুলিতেও ধরা পড়েছে।

হিন্দুমেলার সময় থেকে জাতীয় ভাবোদ্দীপক, স্বদেশী গানের একটি শাখায় এই অর্থনৈতিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। সংগীত-কারগণ অবশ্যই অর্থনৈতিক তত্ত্ব অবলম্বন করে গান রচনা করেননি—তাঁরা দেশের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা সম্পর্কে তাঁদের স্বাভাবিক বোধকে অবলম্বন করেই গানগুলি রচনা করতেন। এদের সংখ্যা বেশী নয়, কিন্তু এগুলি ঐতিহাসিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতি-বিদেরা যে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, সংগীতকারগণও তাঁদের স্বাভাবিক বোধ থেকেই অনুভব করেছিলেন যে দেশের দুর্দ্দশার অন্যতম প্রধান কারণ অর্থনৈতিক শোষণ। যে সকল গানে শোষণ চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে সেখানে দেশবাসীর সামনে দুঃখ-দুর্দ্দশার স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ দিকটি, কার্য্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিস্ফুট করা হয়েছে। নীলচাষের ফলে চাষীর দুরবস্থা, ইংলণ্ডের কলের কাপড়ের আমদানীর ফলে দেশীয় বস্ত্রশিল্প ও শিল্পীর দুর্গতি, কাঁচের ও অন্যান্য সৌখীন সস্তা জিনিসের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে দেশের সাধারণ ব্যবসায়ীর অভাব-অভিযোগ ও দেশের লোকের দারিদ্র্য বৃদ্ধি—ইত্যাদি প্রসঙ্গ গানের উপজীব্য বিষয় হয়েছে।

এছাড়া, দেশবাসীর আত্মবিশ্বাসের অভাব, আলস্য ও নিশ্চেষ্টতা পরানুকরণ ও পরমুখাপেক্ষিতাকে অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণরূপে গানগুলিতে ব্যক্ত করা হয়েছে। 'বন্দেমাতরম্' গ্রন্থের ভূমিকায় সখারাম গণেশ দেউস্কর বলেছেন,

"ইংরাজের আমল হইতেই ভারতে প্রকৃত পরাধীনতা ও

১। Buch, M. A.—*The Rise and Growth of Indian Liberalism*, Baroda, 1940, pp. 227-28.

পরতন্ত্রতার সূত্রপাত হইয়াছে। এই পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতার বিষময় ফলে দেশের লোকের আর পূর্বের ন্যায় সংকল্পের দৃঢ়তা নাই, কার্য্যে উৎসাহ নাই, জীবনে মহৎ উদ্দেশ্য নাই, সকলেই জড়পিণ্ডবৎ নিশ্চল ও নির্জীব অবস্থায় কালহরণ করিতেছে, দেশের জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ দেশের ও সমাজের এই দুরবস্থা দর্শনে হৃদয়ে ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছেন, নানা সঙ্গীত ও কবিতার আকারে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাই বর্তমানকালের স্বদেশ ভক্তি-মূলক সঙ্গীতগুলির উৎপত্তির কারণ।"[১]

এই গ্রন্থের যে দু'টি গানে অর্থনৈতিক শোষণচিন্তা প্রধানরূপে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে অর্থনৈতিক শোষণ ও নৈতিক দুর্গতির পারস্পারিক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি ফুটে উঠেছে। স্বদেশী যুগে রচিত এই গান দু'টি যে জনপ্রিয় ছিল বিভিন্ন গ্রন্থে তাদের উল্লেখেই তা প্রমাণিত।

এই গান দু'টির মধ্যে একটির রচয়িতা হলেন হিন্দুমেলার অন্যতম উৎসাহী সদস্য মনোমোহন বসু।

"দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে জীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনু ক্ষীণ।
... ...
অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এমনি কৈল দৃষ্টিহীন।
তুঙ্গদ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসাভূষি শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন।

১। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, (সম্পা) 'বন্দেমাতরম্', ১৯০৫, ভূমিকা, পৃঃ ৫

তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সূতা, জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় নাক আর
হলো দেশের কি দুর্দিন।"[১]

শোষণ বিষয়ক দ্বিতীয় জনপ্রিয় গানটি হ'ল গোবিন্দচন্দ্র রায়ের।

"কতকাল পরে বল ভারত রে,
দুখসাগর সাতারি পার হবে।
অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ওকি শেষ-নিবেশ রসাতল রে।
নিজ বাসভূমে, পরবাসী হ'লে,
পর দাস-খতে সমুদায় দিলে।
পর-হাতে দিয়ে, ধন রত্ন সুখে,
বহ লৌহ-বিনির্ম্মিত হার বুকে।
... ...
ঘুচি কাঞ্চন-ভাজন, শৌধ-শিরে
হ'লো ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে!
খনি খাত খুঁড়ে, খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে,
পুঁজি পাত নিলে যুটিয়ে লুটিয়ে।
নিজ অন্ন পরে কর পণ্যে দিলে,
পরিবর্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে।"...[২]

দেশের দুরবস্থার জন্য ইংরাজ শাসকের শোষণ নীতির ভূমিকা থাকলেও এখানে দেশবাসীর নৈতিক অবসাদ ও কর্মহীনতাকেই মুখ্যত

১। বাঙ্গালীর গান, বন্দেমাতরম্, সঙ্গীতকোষ, মাতৃবন্দনা, জাতীয় উচ্ছ্বাস, স্বদেশী সঙ্গীত, মনোমোহন বসুর গীতাবলীতে সংগৃহীত। মুখ্য আকর গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

২। বাঙ্গালীর গান, জাতীয় সঙ্গীত, বন্দেমাতরম্, সঙ্গীতকোষ, জাতীয় উচ্ছ্বাস, শতগান সংগ্রহে গৃহীত। মুখ্য আকর গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

দায়ী করা হয়েছে। বিদেশী পণ্যের প্রতি দেশবাসীর মোহ দেশীয় পণ্যের উন্নতির অন্তরায়। সমকালীন অর্থনীতিবিদ্‌দের তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণ শিক্ষিত জনমানসে ভারতের সম্পদ শোষণ চিন্তাকে মুদ্রিত করে দিয়েছিল। স্বদেশী গানে প্রকাশিত দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির চিত্রও অনুরূপভাবে দেশের সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলেছিল।

প্রাক্-বঙ্গভঙ্গ যুগে 'অর্থনৈতিক শোষণতত্ত্ব' স্বদেশী গানে অল্প পরিমাণে অভিব্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের ঘটনাতে এই ভাবনা প্রবল শক্তি লাভ করে স্বদেশী আন্দোলনকে বিশেষ গতিবেগ দান করল। ১৯০৩ সালের শেষে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব ঘোষিত হ'লে তার বিরোধিতায় দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়। আবেদন-নিবেদন, নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ জানিয়েও শাসক গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা গেল না। দেশবাসীর মতামত উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করে শাসন নীতি প্রবর্তনের অনমনীয় মনোভাব স্বদেশ প্রেমিককে শাসকের প্রতি বিদ্বেষভাবাপূর্ণ করে তুলল। এই বিদ্বেষ ও বিরোধের প্রকাশ ঘটল অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে। শাসক দেশবাসীর প্রতিবাদ না শুনলে, দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি দৃষ্টিপাত না করলে তার সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা রক্ষা করা হবে না। অর্থাৎ—শিল্প-বাণিজ্যে ইংরাজের নীতি মেনে নিতে ভারতবাসী অসম্মত হ'ল। ঘোষিত হ'ল 'বয়কট্' নীতি। স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আদর্শ সমগ্র দেশজুড়ে প্রচারিত হ'ল। দেশপ্রেমের অনুভূতি সুনির্দিষ্ট এক কর্মপন্থার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করল। স্বদেশী ভাবাদর্শে অভিভূত মানুষের আবেগচঞ্চলতার অতি সুন্দর বর্ণনা রয়েছে অবনীন্দ্রনাথের আত্মকথায়।

> "এই যে স্বদেশী যুগে ভাবতে শিখেছিলুম, দেশের জন্য নিজস্ব কিছু দিতে হবে, সেই ভাবটিই ফুটে বের হল আমার ছবির জগতে।···বিলিতি পোরট্রেট আঁকতুম, ছেড়েছুড়ে দিয়ে পটপটুয়া জোগাড় করলুম। যে দেশে যা কিছু নিজের শিল্প আছে, সব

জোগাড় করলুম। ...দেশী মতে দেশী ছবি আঁকতে শুরু করলুম।"[১]

স্বদেশী পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ দান ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে 'স্বদেশী ষ্টোর্স', 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', ও 'ইউনাইটেড্ বেঙ্গল ষ্টোর্স' প্রভৃতি দোকান খোলা হ'ল। দেশবাসী যাতে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করে সেজন্য আন্দোলনকারীদের দিক থেকে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। স্বেচ্ছায় যারা কিনবে না, তাদের বাধ্য করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়া হ'ল। ছাত্ররা মহা উৎসাহে তার সদস্য হয়ে শাঁখা-চুড়ি, ছুরি-কাঁচি, দেশলাই, ইত্যাদি জিনিস ফিরি করতে শুরু করল। এসব জিনিস ব্যবহারে আপত্তি জানালে সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবার ভয় দেখানো হতো। শুধু কোলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই নয়, বাংলাদেশের অন্যান্য মফঃস্বল শহরেও এর প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুভূত হল। পূর্ববাংলার বরিশাল অঞ্চল এই আন্দোলনে এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।[২] অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে বরিশালে বিদেশী বর্জন নীতি তীব্র আকার ধারণ করে। তাঁর 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি'র প্রচারের ফলে বরিশালের মানুষ 'স্বদেশী'র অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণে অগ্রণী হয়েছিল।[৩] এতে বাংলাদেশে বিদেশী পণ্য ব্যবসায়ীদের যেমন আথিক ক্ষতি হ'ল, বিদেশী শিল্পের বার্ষিক মুনাফাও ইংরাজ শাসক কম পেলেন।

স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জনের আন্দোলন যেসব স্থানে প্রবল হয়েছে, সেসব স্থানের কবিদের গানেও এই প্রসঙ্গটি প্রাধান্য লাভ করেছে। স্বদেশী গানে এই নূতন আদর্শ দেখতে পেয়ে সাধারণ

১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পূঃ উঃ, পৃঃ ২৮

২। বরিশালের সাহাদের বিলিতি কাপড় বিক্রীর জন্য 'একঘরে' করার কাহিনী পরিচিত।

৩। সমুদ্রগুপ্ত—পূঃ উঃ দ্রষ্টব্য।

মানুষ গানগুলিকে গ্রহণ করেছিলেন। স্বদেশী গ্রহণের আদর্শ নিয়ে রচিত গানগুলি কোলকাতা, বরিশাল, ইত্যাদি নানা স্থানের শোভাযাত্রা বা গানের আসরে গাওয়া হ'লে জনসাধারণ অপূর্ব্ব উত্তেজনা ও আবেগে অভিভূত হয়েছে। 'স্বদেশী'র কর্মস্চী প্রচার করে রচিত গানগুলির মধ্যে রাজনীকান্ত সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মুকুন্দদাস—প্রভৃতির রচনা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। "সে সময় যে কয়েকটি গান রণসঙ্গীতের মত দেশকে প্রেরণা দিয়েছিল"[১] তারমধ্যে রজনীকান্তের একটি গান ছিল অন্যতম। তাঁর—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই ;
দীন-দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সূতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই ;
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।
... ...
আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই—
পরের জিনিস কিনব না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।"

স্বদেশী শিল্প উন্নয়নের জন্য বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের দেশী কাপড়ের কল বাঙালীর জন্য মোটা কাপড় তৈরী করতে লাগল। মিহি বিলাতি বস্ত্র পরিধানে অভ্যস্ত মানুষ এই কাপড়কে 'মোটা

১। দীপ্তি ত্রিপাঠী (সম্পা)—পূঃ উঃ

কাপড়' বলে অবজ্ঞা করলে কবি মোহমুগ্ধ মানুষকে স্বদেশীর স্বদেশ-প্রেম ও সংকল্পের কথা মনে করিয়ে দিলেন। "মোটা সুতার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের অপার স্নেহের যে নয়ন-মনোরঞ্জন আলেখ্য তিনি ফুটাইয়া তুলিলেন, তাহা দেখিয়া বাঙালী হৃদয় ভক্তিবিহ্বল ও পুলকচঞ্চল হইয়া উঠিল।"[১]

রজনীকান্তের অন্য কয়েকটি গান—

"আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট"

"তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত"

"রে তাঁতী ভাই, একটা কথা মন লাগিয়ে শুনিস।"

প্রভৃতিতে স্বদেশীর ভাবাদর্শ অভিব্যক্ত হয়েছে। 'বয়কট্' বা বিলাতি পণ্য বর্জনের আদর্শকে অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত মানুষের উপযোগী করে তোলা হ'ল স্বদেশী গানে বিলাতি পণ্য দ্রব্য (এনামেল, কাঁচের চুড়ি) এবং দেশের শিল্পদ্রব্যের (কাঁসা, পিতল, অলংকার প্রভৃতি) উল্লেখের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য গানের মধ্যে কোথাও অর্থনীতি প্রসঙ্গে বিলাতি পণ্য বর্জনের কথা স্পষ্টতঃ ধ্বনিত হয়নি। একমাত্র 'সোনার বাংলা' গানে তিনি বলেছেন,

"আমি পরের ঘরে কিনব না আর,
ভূষণ বলে গলার ফাঁসি।"

এযুগের অপর দুই প্রসিদ্ধ গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদের গানে দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি চিন্তাটি অনুপস্থিত। দেশের অতীত গরিমাময় ঐতিহ্যের পটভূমিতে ভবিষ্যতের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনের কল্পনা তাঁদের গানে অভিব্যক্ত হয়েছে। বর্তমান দৈন্য, দেশবাসীর মানসিক নিশ্চেষ্টতা সেই প্রসঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উল্লেখিত হয়েছে।

বঙ্গভঙ্গ যুগের বিলাতি বর্জনের উন্মাদনাপূর্ণ আদর্শ প্রচারে রজনীকান্তের গানের মত উল্লেখযোগ্য গানের রচয়িতা হলেন

১। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—পূঃ উঃ, পৃঃ ৫৯

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। তাঁর স্বদেশ সঙ্গীত—

"এস দেশের অভাব ঘুচাও দেশে।
সবার আহার বিহার বিলাস বেশে।
... ...
ধুতি চাদর ম্যাঞ্চেষ্টারের চেয়ে দেখ সব সর্বনেশে
ভবে, জাহাজগুলো, তোদের তুলো
তোরাই কিনিস সেই জিনিসে॥
... ...
দিয়ে, সোনা হীরের খনি,
আমদানি কাঁচ রাঙ্গতা সীসে।
যত, বিদেশবাসী নে যায় শস্য,
আমরা আছি সমান বসে॥"[১]

গানটিতে অর্থনীতিবিদের স্বদেশের সম্পদ নিষ্ক্রমণ নীতির মূল বক্তব্য বিধৃত আছে। কবির অন্যান্য গানগুলির মূল ভাবও একই। অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন রচিত হিন্দী গানটি ভারতের ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের জন্যই হয়ত লিখিত হয়েছিল। কিন্তু বাঙালী শ্রোতার কাছেও তার আবেদন কম ছিল না।

"ভেইয়া দেশকা এ কেয়া হাল্।
খাক্ মিট্টি জৌহর হোতী সব্, জৌহর হ্যায় জঞ্জাল।
... ...
পীতল কাঁসা রহে ক্যায়সা, সোনা চান্দী শেষ।
অব্ ইনামেল্, গিল্‌টি শীসা, ঘর্ ঘর্‌মে প্রবেশ্।
... ...
দেশকে ধন্ সব্ চৌপট্ট কর্‌কে, লেতা পরদেশিয়া।
এহাঁকে লোগ সব্ ফকির্ বন্ যায় না পাওয়ে রূপৈয়া।

১। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত বাঙ্গালীর গান; জলধর সেন সম্পাদিত জাতীয় উচ্ছ্বাস; নরেন্দ্রকুমার শীল সম্পাদিত স্বদেশী সঙ্গীত গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। তার মধ্যে শেষ সংগ্রহটিতে রচয়িতার নাম নেই। পৃঃ উঃ

দীন বিশারদ্ গণই বিপদ্ ভনো দুঃখকো গীত্।
হো মতিমান, দেশ্‌কে সন্তান্, করো স্বদেশহিত।"

দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে দুর্দ্দশার প্রতিকারের উপায়ও নির্ধারিত করেছেন সংগীতকারগণ।

অশ্বিনী দত্ত লিখেছেন,

"আয় আয় সবে ভাই যাই দ্বারে দ্বারে
ভারতের ভাগ্য দেখি ফেরে কিনা ফেরে।
সোনার এরাজ্য ছিল, ক্রমে ক্রমে সকল গেল
এমন যে ভারতবর্ষ গেল ছারখারে।
... ...
এই দেশেতে তূলা হয়, এই তূলা বিলাতে যায়,
এই তূলাতে কাপড় তথায় বোনে মাঞ্চেষ্টারে।
মাঞ্চেষ্টার হতে এসে, ঘরের টাকা নেয়রে শুষে,
এদিকে দেশের তাঁতি অনাহারে মরে॥"...

স্বদেশ সেবায় আত্মনিয়োগ, স্বদেশের হিতচিন্তা দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি মোচনের সংকল্প নেওয়া হয়েছে। মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রার একটি অতি জনপ্রিয় গানেও অনুরূপ ভাব প্রচারিত।[১]

"ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর পরো না।
বলিতে লজ্জা করে, প্রাণ বিদরে,
বার লাখের কম হবে না;
পুঁতি কাঁচ ঝুটা মুক্তায়, এই বাংলায়—
দেয় বিদেশে কেউ জানে না।
ঐ শোন বঙ্গমাতা শুধান কথা,—"উঠ আমার যত কন্যা!

১। সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পূঃ উঃ গ্রন্থের পরিশিষ্টে গানটি মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর নামে গৃহীত। কিন্তু জয়গুরু গোস্বামী পূঃ উঃ এটিকে মুকুন্দদাসের রচনা বলে মনে করেছেন।

তোমা সব করিলে পণ, মায়ের এ ধন,
বিদেশে উড়ে যাবে না।"[১]

এই গানটিতে সহজ, সরল ভাষায়, বিদেশী পণ্য দ্রব্যের স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ উল্লেখ দ্বারা কবি দেশবাসীর মনে দেশীয় শিল্পদ্রব্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জাগিয়ে তুলতে এবং বিদেশী পণ্যের প্রতি মোহ দূর করতে সক্ষম হয়েছেন।

ইংরাজ শাসনকালে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণ একটি নয়—একাধিক। শাসক গোষ্ঠী ভারতের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির কোনও চেষ্টা করেননি। যে কোনও দেশের সম্পদই তার কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। ইংরাজ রাজত্বকালে ভারতবাসী এই তিনটির কোন একটি পথেও উপকৃত হয়নি, বরং নানাভাবে দেশের সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই এ ভাবনা স্বদেশী গানে উৎপন্ন হয়েছিল, মনোমোহন বসুর 'ভিক্টোরিয়া গীতি' তার নিদর্শন। কত বিবিধ উপায়ে ভাবতবাসীর 'রক্তশোষণ' ও 'লুঠ' চলেছে, তার বর্ণনা পাই গানটিতে।

প্রধান লুট দমকা কলে, যারে বলে,
হোম-চার্জ, আর 'কনট্রিবিউশন'।
তা ছাড়া যোজন-যোড়া লম্বা তোড়া,
সাহেব পাড়ার পেন্সন বেতন ॥

১। এইরকম আরো গান এই সময়ে রচিত হয়েছিল অনুমান করা অসংগত নয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য—বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, ১ম খণ্ড ১৯৬৬, পৃঃ ৪৬১-৪৬৩ উদ্ধৃত একটি গান এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। "বিলাইতি আর বোলে কিনন নাহি নাই"…চিত্তরঞ্জন দেব, পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ (১৯৫৩, পৃঃ ৩৩৬-৭) গ্রন্থের একটি গান উল্লেখযোগ্য "ত্যাজ বিলাতী বসন, বিলাতী ভূষণ, বিলাতী চিনি ও লবণ কেহ আর কোর না গ্রহণ।"

ম্যাঞ্চেষ্টার ধর্তে আব্দার কাপড় সূতার
ডিউটি অগ্নি হয় রেমিশন।
তাদের পেট পুরিয়ে তখন, দেখছি এখন
আয়-করের দায় মোদের মরণ।"

ইংরাজের সঙ্গে বাণিজ্য সংগ্রামে পরাভব, ভূমি রাজস্বের কঠোরতা, হোমচার্জ ব্যাপদেশে রুধির শোষণ, বেশী বেতনের পদে বিদেশীদের একাধিপত্য—ইত্যাদিই যে ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রধান কথা—মনোমোহন বসুর গানের এই বক্তব্যই রমেশচন্দ্র দত্তের মুখে অন্য ভাষায় শোনা গেল—

"British rule has given India peace ; but British Administration has not promoted or widened these sources of National wealth in India ... Over 20 millions sterling are annually drained from the revenues of India ; and it would be a miracle if such a process, continued through long decades, did not impoverish even the richest nation upon earth."[১]

এই চিন্তাটি বঙ্গভঙ্গোত্তর স্বদেশী গানে অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। যদিও শাসক-বিদ্বেষ, শাসক-বিরোধিতা তখন ভারতের জাতীয়তাবোধ এবং জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, কিন্তু এই বিরোধের পন্থা ছিল ভিন্ন। স্বদেশী গানের মধ্যে শাসক-বিরোধী সংগ্রামের নূতন কর্মসূচী তুলে ধরা হয়েছে।

এযুগের সংগীতকারদের মধ্যে স্মরণীয় নাম হ'ল নজরুল ইসলামের। তাঁর রচিত অজস্র স্বদেশী গান প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ শাসকের বিরুদ্ধে রণহুংকার। সেখানে শাসক-বিরোধী সংগ্রামে বিপ্লবের পথ নির্দ্দেশ রয়েছে, কিন্তু বিদেশী পণ্য বর্জন বা দেশীয় শিল্প গ্রহণের কথা সেখানে নেই।

১। Dutt, R. C.—*The Economic History of India in the Victorian Age*, (1901), 1950, p. VII-XIV.

স্বদেশী গানের প্রধান তিন পর্বে রচিত গানগুলি বিচার করে তাই অর্থনৈতিক শোষণ-চিন্তাকে এই শ্রেণীর গানের সর্বকালীন ও সর্বজনীন অনুভূতি বলে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না। কিন্তু স্বদেশ-প্রেমের জাগরণে এর অবদান বিশিষ্ট। শিল্পের দিক থেকে হয়ত এসব গানের কোন রসাবেদন নেই সংগীত-রসিক শ্রোতার কাছে। তবু বিশেষ কালপটভূমিতে, নূতন চিন্তা ও আদর্শের অভিব্যক্তিতে এই বিশেষ শ্রেণীর গানের মূল্য উপেক্ষনীয় নয়।

৩

শাসক-শাসিতের সম্পর্কের উপলব্ধি অথবা শুধু পরাধীনতার বোধকে 'রাজনৈতিক চেতনা' আখ্যা দেওয়া সঙ্গত নয়। দেশের প্রশাসন ও সে বিষয়ে শাসক গোষ্ঠীর গুণাগুণ বিচার, শাসন ব্যবস্থায় দেশীয় লোকের অধিকার দাবী সম্বন্ধে চেতনা রাজনৈতিক ভাবনার প্রধান উপাদান। উনিশ শতকের ভারতবাসীর মনে এই ভাবনা খুব সুস্পষ্ট চেহারা ধারণ করেনি। তাছাড়া ইংরাজ সম্পর্কে বাঙালী এক মিশ্র ধারণা পোষণ করেছে। তার ফলে দেশবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তা স্পষ্টই বিলম্বিত হয়েছে।

ইংরাজ জাতিকে শিক্ষিত বাঙালী একই কালে পরাধীন দেশের শাসকের ভূমিকায় এবং দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক দুর্দ্দশার পরিত্রাতারূপে দেখেছে। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের উপসংহারে সত্যানন্দকে মহাপুরুষ এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন, "ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ··· ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে।"[১] দেশব্যাপী অরাজকতার পটভূমিকায় ইংরাজ শাসককে বাঙালী স্বাগত জানিয়েছে। আবার ভারততত্ত্বে ইংরেজের আগ্রহ ও ইংরাজের প্রতি বাঙালীর সম্ভ্রমপূর্ণ

১। বঙ্কিমচন্দ্র—পূঃ উঃ, পৃঃ ৭৮৭

ধারণা গড়ে তোলার আর একটি কারণ। বস্তুতঃ ইংরাজের সান্নিধ্যে এসেই বাঙালীর মনে স্বদেশপ্রেমের বীজ উপ্ত হয়েছে। এছাড়া খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচারিত হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ধারণার প্রতিবাদ করতে গিয়ে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে প্রবৃত্ত হলেন একদল হিন্দু মনীষী। নেতিমূলকভাবে হলেও এখানেও ইংরাজের সঙ্গে সংযোগই ভারতবাসীকে স্বদেশের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী করে তুলে জাতীয়তাবোধ উন্মেষের উপযোগী পরিবেশ রচনা করছে।

শাসক-শাসিতের সম্পর্কের প্রথম স্তবে পরাধীন জাতির বেদনাবোধই ছিল প্রধান। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পরাধীনতার বেদনাবোধ থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াস দেখা দিল। মুক্তিলাভের সেই প্রচেষ্টার ফলে এবং অন্য নানা কারণে ইংরেজের সঙ্গে যে সম্পর্ক দেখা দিল তা জাতিবৈরতার। ইংরাজ সম্পর্কে পূর্বেকার শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব ধীরে ধীরে অপসারিত হ'তে শুরু করল। স্বদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প-সম্পদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধেও চেতনা ক্রমে স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। ঊনিশ শতকের শেষার্ধে হিন্দুমেলাতেই এই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটে। "সোনার ভারত আজ যবনাধিকারে।" ভারতের অবস্থা তাই—

"হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল।
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল।"

পরাধীন জাতি বৈদেশিক শাসন ও শোষণের অপমান জ্বালায় পীড়িত, মনুষ্যত্বের অবমাননায় কুণ্ঠিত। গণেন্দ্রনাথের গানে শোনা গেল—

"লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে।
লুন্ঠিতেছে পরে এই রত্নের আকরে॥
... ...
দেশান্তর জনগণ ভুঞ্জে ভারতের ধন,
এ দেশের ধন হায়, বিদেশীর তরে॥

আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা,
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে।"[১]

বিদেশীর অধীনতা স্বীকার করে জাতি হীনবীর্য, অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে ক্রমে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। শাসকের অন্যায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দেশবাসীর প্রতিবাদের ক্ষমতা নেই, অসহায়ভাবে তারা অন্যায় সহ্য করে। এই মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে গানে—

"না জানি জননী! কতদিন আর
নীরবে সহিবে হেন অত্যাচার,
উঠিবে কি কভু বাজিয়ে আবার
স্বাধীন ভারতে বিজয়-বিষাণ?"

কিন্তু তখনও ইংরাজের নৈতিক বুদ্ধি, বিবেচনার প্রতি ভারতবাসীর পূর্ণ অনাস্থা দেখা যায়নি। তাই বিদেশী শাসন-শোষণের সঙ্গে দেশবাসীর নিশ্চেষ্ট, অবসন্ন মনোভাব, অনৈক্য ইত্যাদিও দুর্দ্দশার কারণরূপে মেনে নেওয়া হয়েছে। 'ভারতসভা' এবং কংগ্রেস ইংরাজ চরিত্রের মৌলিক মহত্ত্ব মেনে নিয়েই আবেদন-নিবেদনের পথে দেশের শাসন ব্যবস্থায় আপন অধিকার দাবী করলেন। এই পর্বের গানে ইংরাজ বিদ্বেষের তীব্রতার কোনও চিহ্ন নেই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে শিক্ষিত ভারতবাসী রাজনীতি-সচেতন হয়ে উঠতে লাগল। দেশশাসন ব্যবস্থায়, চাকুরীক্ষেত্রে

১। গণেন্দ্রনাথ ছাড়া অন্যান্যদের রচিত গান: (ক্রোড়পঞ্জী, ৩, দ্রষ্টব্য)
মনোমোহন বসুর—(১) "নরবর নাগেশ্বর শাসন কি ভয়ংকর"
(২) "দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন"
গোবিন্দচন্দ্র রায়—"কতকাল পরে, বল ভারত রে"
রাজকৃষ্ণ রায়—"তোমাদের একি বিবেচনা"

আপন অধিকারের দাবী উপেক্ষিত হতে দেখে দেশবাসী ক্ষুব্ধ, অপমানিত। সেই সঙ্গে দেশবাসীর মতামত অগ্রাহ্য করে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত (১৯০৩) সরকারীভাবে গৃহীত হ'লে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের তিক্ততা চরমে উঠেছে। জাতীয়তাবোধে পরজাতি-বিদ্বেষ সোচ্চার হ'য়ে ইংরাজ শাসকের প্রতি সংগ্রামী মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী যুগে শাসকের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, বিপ্লবের আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ হয়েছে, সেই সঙ্গে স্বদেশী গানেও অগ্নিমন্ত্র, শক্তিমন্ত্রে দীক্ষার আদর্শ প্রচারিত হয়েছে। বিপ্লবী, বিদ্রোহী দেশপ্রেমিকের প্রাণে ধ্বংসাত্মক কর্মের অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে এই জাতিবৈরের অনুভূতি। দেশের সকল দুর্দ্দশা ও অবনতির জন্য ইংরাজ শাসককে দায়ী করা হয়েছে।

শাসকের অত্যাচার যখন 'রক্তধ্বজা' তুলেছে, অন্যায় উৎপীড়ন যখন 'স্ত্রী-পুত্র-সংহার' করতেও দ্বিধা করছে না, তখন আর 'আবেদন-নিবেদনের থালা ব'হে ব'হে নতশির' হয়ে থাকলে চলবে না। তাই দ্বিধা, ভয় ও অলসতার বেড়ী ভেঙ্গে ফেলে শাসক-বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার আহ্বান জানিয়েছেন কবি ও গীতিকার।

"জীবন-মায়া আজি কর হে ভিন্ন,
দয়া-বন্ধন কর হে ছিন্ন,
জাগাও সংহার জগত-পূর্ণ প্রলয়-পয়োধি-রাশি ॥
দলিত করহে চরণতলে,
সকল ভীরুতা সব দুর্ব্বলে,
ভীম অসি ধরে, শ্মশানে মশানে, ভীষণ সাজাও অসি ॥"[১]

১। বিপিনচন্দ্র পাল রচিত হাজার বছরের বাংলা গান, প্রভাতকুমার গোস্বামী সম্পাদিত পৃঃ উঃ গ্রন্থে।

কামিনীকুমার ভট্টাচার্য গেয়েছেন—

"এস অরি-শোণিতে মেদিনী রঞ্জিতে
নব বেশে ভীষণ অসিধারী।"[১]

'নিষ্ঠুর অরি সংহারে' কোন ত্রাস, লজ্জা, ভয় নেই। শত্রুর আচরণ যদি পাশবিক হয়, তবে—

"অসুর নিধনে কিসের তরাস্ পশুর নিধনে তোরা কি ডরাস ?
না গণি বিজন কানন ভীষণ বিপদ তরিবি কে ?"

শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ দেশবাসী দেশমাতৃকাকে প্রলয়কর্ত্রীরূপে কল্পনা করেছেন এবং বিদেশী শাসক গোষ্ঠী কল্পিত হয়েছেন অসুররূপে দানবরূপে। মাতৃভূমি দেশভক্তকে আহ্বান জানিয়েছেন—

আবাহন মার যুদ্ধঝননে
তৃপ্ত তপ্ত রক্তক্ষরণে
পশুবধে আর অসুর দমনে
মায়ের খড়্গ ব্যগ্রাধীর।" (বরদাচরণ মিত্র)

১। কামিনীকুমার ভট্টাচার্য—
অন্যান্য কবি রচিত এই বিষয়ের গান
(ক) বরদাচরণ মিত্র—"শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা অভয়াচরণে নম্র শির।"
(খ) বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১) "হবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা মাতৃমন্ত্রে কিনা" তদেব
(২) "আয় আজি আয় মরিবি কে ?" তদেব
(গ) অশ্বিনীকুমার দত্ত—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" (মনীন্দ্রকুমার ঘোষ (সম্পাঃ) অশ্বিনীকুমার রচনা-সম্ভারে, ১৯৬৭)
(ঘ) গোবিন্দচন্দ্র দাস—"বহুদিন হতে রে ভাই শ্রীহীনা অমরাপুরী" (জলধর সেন—পৃঃ উঃ)

পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের আদর্শ ও ক্রিয়াকলাপে শাসক বিদ্বেষের চূড়ান্তরূপ প্রকাশিত—মুকুন্দদাস এবং নজরুল ইসলামের গানে।

"আমি দশহাজার প্রাণ যদি পেতাম
তবে ফিরিঙ্গী বণিকের গৌরব-রবি
অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম।" (মুকুন্দদাস)

"কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙ্গে ফেল্ কর রে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী
ওরে ঐ তরুণ ঈশান, বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীন প্রাচীর ভেদি।
... ...
নাচে ঐ কাল-বোশেখী, কাটাবি কাল বসে কি
দে রে দেখি ভীমকারার ঐ ভিত্তি নাড়ি।
লাথি মার ভাঙ্গ্ রে তালা, যত সব বন্দিশালায়
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি।"
(নজরুল ইসলাম)

সন্ত্রাসবাদের যুগে আত্মবলিদানের আদর্শ দেশপ্রীতির অগ্নিপরীক্ষারূপে গৃহীত হয়েছিল। রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনের আদর্শ সুভাষচন্দ্রের প্রতিশ্রুতিতে বাণীরূপ পরিগ্রহ করেছিল—

"Give me blood, I will give you freedom."

৪

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বিপ্লবী কর্মধারা স্বদেশী যুগের ভাবাদর্শের মত ব্যাপক প্রসার লাভ করেনি, তবে বিপ্লবীদের চরিত্র ও আত্মত্যাগ জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। কাজেই ব্যাপক না হলেও এই আদর্শপুষ্ট চিন্তা বা গানকে স্বাদেশিকতা বিষয়ক আলোচনা থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব।

বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরবর্তীকাল থেকে আরম্ভ করে প্রায় পঁচিশ বছর কাল (১৯০৫-১৯৩০) ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপ চলতে থাকে। অন্যান্য রাজনৈতিক মতধারার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী চিন্তাধারাও বয়ে চলেছিল অব্যাহতভাবে। তার সঙ্গে আর একটি চিন্তাধারা দেখা যেতে লাগল—বিশ্ববিধাতার ন্যায়ের বিধানের ওপর আস্থা রেখে দেশবাসী যদি আত্মপ্রতিষ্ঠ ও ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, তবে বিদেশী শাসকের অন্যায় প্রভুত্বের কাল শেষ হবেই হবে। বিশ্ববিধান লংঘন করে, অন্যায় আচরণ করলে তা কখনও চিরজয়ী চিরস্থায়ী প্রভুত্ব দিতে পারে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অপহরণ করে, সম্পদ ঐশ্বর্য্য শোষণ করে ইংরাজ শাসকও তাঁর সিংহাসন অটল রাখতে পারবে না। অন্যায়ের রন্ধ্রপথ দিয়েই এই বজ্র-সুকঠিন রাজশক্তি একদিন ভেঙ্গে পড়বে। বিধাতার ন্যায়, সত্য ও ধর্মের অনুশাসন জয়ী হবেই—এই বিশ্বাস ফুটে উঠল গানে। এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি হলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর—

"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান
তুমি কি এমনি শক্তিমান।
আমাদের ভাঙ্গাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান—
তোমাদের এমনি অভিমান॥
... ...
শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও
হও-না যতই বড়ো আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,
বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান॥"

অথবা

"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে॥

তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু, জেগে আছেন জগৎপ্রভু—
ওরা ধর্ম যতই দলবে ততই ধুলায় ধ্বজা লুটবে,
ওদের ধুলায় ধ্বজা লুটবে।"

বিশ্ববিধাতার ন্যায়ের বিধানের ওপর বিশ্বাসের জোরেই দেশবাসী একদিকে বিদেশী শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতে পারে, অন্যদিকে নৈতিক শক্তিতে উদ্দীপিত হতে পারে—এই বিশ্বাসের কথা ধ্বনিত হয়েছে গানগুলিতে। এই বিশ্বাসেই বিদেশী শাসকের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন—

"সাবধান—সাবধান—
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড,
রুদ্র দৃপ্ত মূর্তিমান॥
... ...
অগণিত করে ঝলসে কৃপাণ তপ্ত রক্ত করিতে পান;
বলদর্পিত চরণাঘাতে
ত্রিভুবন ভীত কম্পমান।"[১]

ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাবের পূর্বেই, বিশেষত সত্যাগ্রহ, অসহযোগ, ইত্যাদি অহিংস আন্দোলন সংগঠিত হবার আগে থেকেই বাংলাদেশের একদল তরুণ যেন রবীন্দ্রনাথের ধনঞ্জয় বৈরাগীর মত মার খেয়ে মার জয়ের মন্ত্র নিয়েছিল।

বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনীর (১৩১৩ নববর্ষ, ১৪ই এপ্রিল ১৯০৬) অনুষ্ঠানে শাসকের নির্মম অত্যাচারের পরেও স্বদেশভক্ত তরুণেরা নীরব সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জনের ওপর পুলিশের নির্মম অত্যাচারের

১। ভণিতায় কারও নাম না থাকায় এবং বহু যাত্রা আসরে মুকুন্দদাস কর্তৃক গীত হওয়ায় গানটি মুকুন্দদাসের নামে অনেক স্থানে গৃহীত হয়েছে। রচয়িতা প্রকৃতপক্ষে হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দ্রষ্টব্য—'ভণিতাবিভ্রাট', জয়গুরু গোস্বামী, পূঃ উঃ. পৃঃ ৩০৭

বর্ণনা সুরেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায়।

> "Chittaranjan had been attacked by the police with their regulation lathis and thrown into a tank full of water. The assault was continued, notwithstanding the helpless condition of the boy, who offered no resistance of any kind, but shouted Bande Mataram with every stroke of the lathi. It was a supreme effort of resignation and submission to brutal force without resistance and without questioning."[১]

চিত্তরঞ্জনের আচরণে যে সহিষ্ণুতা, বলিষ্ঠ স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছিল, সে যুগের একশ্রেণীর দেশপ্রেমিকের তাই ছিল একান্ত অভিপ্রেত। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের অতি পরিচিত গানটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"মা গো, যায় যেন জীবন চলে,
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে
    বন্দেমাতরম্ বলে॥
...   .
আমায় বেত মেরে কি 'মা' ভোলাবে?
    আমি কি মার সেই ছেলে?
দেখে, রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
    কে পালাবে মা ফেলে?
...   .
আমি ধন্য হব মায়ের জন্য
    লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের বেত্রাঘাতে, কারাগারে
    ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলে।"

১। Banerjee, Surendranath—*A Nation in Making*, (1925) 1963 ed., p. 209.

ভারতের জাতীয়তাবোধের ক্ষেত্রেও যেমন চরম ও নরম পন্থা যুগপৎভাবে সক্রিয় ছিল, তেমনি সেই রাজনৈতিক ভাবাদর্শের প্রভাবে একই কালে উক্ত দুই আদর্শদ্যোতক স্বদেশী গান রচিত হতে দেখি।

৫

অর্থনৈতিক শোষণ, জাতিবৈর এবং নৈতিক শক্তিতে বিশ্বাসের মতই স্বদেশী গানে আর একটি প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে, তা হ'ল রাজনৈতিক ঐক্য। হিন্দুমেলার যুগ থেকেই ঐক্যচিন্তা জাতীয়তাবোধের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। হিন্দুমেলার একটি গানে পাই—

"যাহে দুখ ভার যায়, একতায় সে উপায়।
ত্যজ ত্যজ ঔদাস্য ভাব, রত হও নিজ কাজে॥
মিলনে হয় হীন সবল, মিলিলে অতি লঘু তৃণ দল,
পায় লৌহশৃংখল বল, বান্ধে গজরাজে।"[১] (অজ্ঞাত)

জন্মভূমির দীন-লজ্জিত অবস্থা দূর করার একমাত্র উপায় হ'ল দেশবাসীর মধ্যে ঐক্যবোধের প্রতিষ্ঠা। হিন্দুমেলার অপর একটি গানে কবি দেশের ভবিষ্যত সৌভাগ্যের স্বপ্ন দেখেছেন—

"সভ্যতা সরোজ লতা, প্রাপ্ত হবে প্রবলতা,
প্রস্ফুটিবে সুখাম্বুজ, মানস সরসে।
উন্নতি মরাল কুলে, ভ্রমিবে সলিলে কূলে,
প্রকৃতি প্রমোদে ভুলে, হাসিবে হরিষে॥
উৎসাহেরি উপবনে, একতার সুপবনে,
কামনা কুসুম কলি ফুটিবে সরসে;"[২] (অজ্ঞাত)

দেশবাসী দেশহিত সাধনে 'একমত ভাব ধরি, এক তানে' ব্রতী হলে তবেই কবির স্বপ্ন সফল হবে।

১। যোগেশচন্দ্র বাগল (ক)—পূঃ উঃ, পৃঃ ১১৬
২। যোগেশচন্দ্র বাগল (ক)—পূঃ উঃ, পৃঃ ১১৬

হিন্দুমেলা যুগের স্বদেশী গানে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথাও বলা হয়েছে।

"জাগরে জাগরে ভারত সন্তান।
হিন্দু মুসলমান, হয়ে এক প্রাণ,
স্বদেশের হিতে সবে কর আত্মদান।"[১] (অজ্ঞাত)

অজ্ঞাত কবি রচিত অন্য একটি গানেও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানানো হয়েছে।

"আয় আয় ভাই আয় রে সবে।
... ...
জয় জন্মভূমি জয় জয় রবে
শিখ মুসলমান হিন্দুর সন্তান কোটি কোটি ভাই এক হয়ে যাই
কি ভয় কি ভয় আর এ ভবে।"[২] (অজ্ঞাত)

কিন্তু তা সত্ত্বেও এযুগের মানুষের কাছে ঐক্যের আবেদন বহুল পরিমাণে পুঁথিগত তত্ত্ব হয়েই ছিল। কেননা, হিন্দুমেলার কোনও অনুষ্ঠানে অহিন্দু কোনও অংশগ্রহণকারীর উল্লেখ পাই না। শুধু তাই নয়, হিন্দুমেলার গানে অতীত ভারতের গৌরব প্রসঙ্গে স্বাধীন হিন্দু রাজত্বের মহিমা, আর্যগরিমা ও আর্যকীর্তির উল্লেখ থাকায় এযুগের জাতীয়তাবাদে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদে'র সংকীর্ণতার পরিচয় পেয়েছেন অনেকে। প্রকৃতপক্ষে, হিন্দুমেলার গানে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে বিদেশীর আক্রমণ থেকে স্বদেশ রক্ষার সহজ ও পরিচিত পথটি যেখানেই উল্লিখিত হয়েছে, সেখানেই হিন্দু-যবন সম্পর্কের আড়ালে 'স্বদেশী-বিদেশী' ভাবকে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু যাঁরা এই কাঠামোটিকে বুঝতে ভুল করেছেন, তাঁরাই এযুগের গানে সংকীর্ণ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান পেয়ে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম স্তরে তা থেকে দূরে ছিলেন। কিন্তু এই গানগুলি

১। মাতৃপূজা, ১৯০৬, গান—২১, পৃঃ ২২-২৩
২। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সঙ্গীতকোষ, ১৮৯৬, গা-৩১৮১, পৃঃ ৯৯০

অন্ততঃ প্রমাণ করছে যে হিন্দুমেলায় হিন্দু মুসলমানের ঐক্য চিন্তা গুরুত্ব পেয়েছে এবং মুসলমানবর্জিত হিন্দু ভারতের কথা ভাবা হয়নি।

বঙ্গভঙ্গ যুগে সাম্প্রদায়িক ঐক্য অন্ততঃ সাময়িকভাবে গড়ে উঠেছিল। বাইরের শক্তি প্রতিরোধ করতে গিয়ে দেশবাসী আত্ম-কলহ ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল। এযুগে তাই বহু গানেই হিন্দু মুসলমান ঐক্যের আদর্শ প্রচারিত হয়েছে। তবে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব দ্বারা মুসলমান সম্প্রদায়কে অনেক পরিমাণে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল। কাজেই এই সাম্প্রদায়িক ঐক্যের আহ্বানে সাড়া বিপুল ও বিরাট বলা চলে না। এই প্রসঙ্গে প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা আবুল মনসুর আহমদের লিখিত অংশটি স্মরণীয়—

> "১৯০৮ সালে লাটসাহেব কারমাইকেল ময়মনসিংহে আসেন। মুরুব্বিদের সাথে লাট-দর্শনে যাই। রাস্তার গাছে গাছে বাড়ি-ঘরের দেওয়ালে-দেওয়ালে ইংরাজীতে লেখা দেখি 'ডিভাইড্ আস্ নট্'। মুরুব্বিদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি ওসব 'স্বদেশী' হিন্দুদের কাণ্ড। মুসলমানদের খেলাকে দুশ্‌মনি।"[১]

স্বদেশী ও 'হিন্দুত্ব' অভিন্ন—এই ধারণার বশবর্তী হয়েই মুসলমান সমাজের অনেকে বঙ্গভঙ্গ বাতিল হওয়াতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। "ইংরাজ স্বদেশীদের কথায় বঙ্গভঙ্গ বাতিল করিয়াছে এবং তাতে মুসলমানদের সর্বনাশ হইয়াছে"[২] এভাবেই তাঁরা স্বদেশী আন্দোলনকে বিচার করেছিলেন। এই যুগে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা (১৯০৩)—সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের দিকটিকে উদ্‌ঘাটিত করে। কংগ্রেসকে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি দানে কুণ্ঠা যদি না থাকতো, তবে মুসলিম লীগ স্থাপনের কোনও প্রয়োজনই হ'তো না।

১। আবুল মনসুর আহমদ—আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, ১৯৭০ পৃঃ ২৬-২৭

২। আবুল মনসুর আহমদ—পৃঃ উঃ

স্বদেশী যুগের পর আবার একবার হিন্দু-মুসলিম সাময়িক সম্প্রীতি দেখা দিল খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে। কিন্তু এই ঐক্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি—১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের শাসনকালে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের তীব্রতা প্রকাশ পেল। 'বন্দেমাতরম্' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বা তার চিত্ররূপের প্রদর্শন বন্ধ করা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শ্রীপদ্ম' মনোগ্রামের বিরুদ্ধে অভিযোগ[১] ইত্যাদিও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত চিন্তারই ফল। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তাই প্রবীণ রাজনৈতিক কর্মীর স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়—

"এতকাল পরে পিছন দিকে তাকাইয়া একজন রাজনৈতিক কর্মী, লেখক ও সাংবাদিক হিসাবে আমার যা মনে পড়ে তার সারমর্ম এই যে ভারতের মুসলমানরা আগাগোড়াই একটা রাজনৈতিক স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবেই চিন্তা ও কাজ করিয়াছে। এটা তারা খিলাফৎ যুগের 'হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই' বলার সময়েও যেমন করিয়াছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় 'মারি অরি পারি যে প্রকারে' বলার সময়েও তেমনি করিয়াছে। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের পত্তন, ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট্, ১৯২৩ সালের বেঙ্গল প্যাক্ট্, ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেস হইতে ওয়াক্-আউট্, ১৯২৯ সালে সর্বদলীয় মুসলিম কন্‌ফারেন্স, জিন্নার চৌদ্দ দফা রচনা, ১৯৩০-৩৩ সালের রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সে যোগদান ইত্যাদি সবতাতেই মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারার এই দিকটা সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়িয়াছে।"[২] ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যেমন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি চিরস্থায়ী

১। আবুল কালাম সামসুদ্দীন—অতীতদিনের স্মৃতি, ঢাকা, ১৯৬৮, গ্রন্থের 'মুসলমানদের সাংস্কৃতিক চেতনা' অধ্যায়, দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১৭২-১৭৪

২। আবুল মনসুর আহমদ—পূঃ উঃ, পৃঃ ১৫৫

হয়নি, কিন্তু এই ঐক্য চিন্তা বাংলা স্বদেশী গানের ক্ষেত্রে বাংলার কবিদের উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাক্ষররূপে ইতিহাসে স্মরণীয় থাকবে। ১৯২৬-এর বিখ্যাত দাঙ্গার পর নজরুল ইসলামের রচিত বিখ্যাত 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু' গানটিতে—

"হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন্
কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।"

এই ছত্র দু'টিতে নজরুলের কণ্ঠে অজস্র বাঙালী কবির উক্তি প্রতিধ্বনিত হয়েছে।[১]

৬

স্বদেশী গানের রাজনৈতিক ভাবনার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল কখনও বিশেষভাবে বঙ্গচিন্তা, আবার কখনও ভারতচিন্তা। কখনও বঙ্গচিন্তা বিশেষ স্থান-কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ হয়ে কিছু পরিমাণে সংকুচিত হয়ে পড়েছে, কখনও 'বঙ্গ' ও 'ভারত' সমার্থক। বাঙালীর স্বদেশ চেতনায় 'ভাবতচিন্তা' ও 'বঙ্গচিন্তা' উভয়ই বর্তমান ছিল, স্বদেশী গানেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। স্বদেশপ্রেমিক সংগীতকারদের কাছে জন্মভূমি কখনও ভারতবর্ষ, কখনও বাংলাদেশরূপে উপস্থিত হয়েছে। হিন্দুমেলা যুগের স্বদেশ-ভূমি সমগ্র ভারতবর্ষ, কিন্তু বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় সেই জন্মভূমি বঙ্গজননীরূপে আবির্ভূত হলেন। আবার অসহযোগ পর্বের সর্বভারতীয় পটভূমিকা দেশের রাজনীতিকে আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক করে তুলল, সেই সঙ্গে স্বদেশভূমিও আঞ্চলিক সীমা ছাড়িয়ে ব্যাপকতর সত্তা লাভ করল। দেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হ'লে দেশ তার সুনির্দিষ্ট, ভৌগোলিক সীমা নিয়েই স্বদেশপ্রেমিকের কল্পনায় মূর্ত হ'য়ে ওঠে। স্বদেশী গানেও দেশ-সম্পর্কিত চিন্তা এসেছে কখনও সমগ্র ভারতকে অবলম্বন ক'রে, কখনও বা শুধু বাংলাদেশকে

১। Das, Sisir Kumar—'Communalism and Bengali Literature, 1917-1947', *Radical Humanist*, July, 1972.

অবলম্বন ক'রে। বিশেষ যুগের চিন্তার বৈশিষ্ট্যই গানের ক্ষেত্রেও এই স্বতন্ত্র চিন্তাকে পরিস্ফুট করে তুলেছে। যদিও দেশাত্মবোধে উদ্দীপিত কবি 'জন্মভূমি' অর্থে সমগ্র দেশকেই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বিশেষ পরিবেশে তা কখনও সঙ্কুচিত হয়ে দেশের অংশ বিশেষকে সমগ্রের স্থলাভিষিক্ত করেছে।

স্বদেশী গানে ভারতচিন্তা ও বঙ্গচিন্তার স্রোত কখনও পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে, কখনও বা যুগলধারায় প্রবাহিত হয়েছে। দেশ-মাতৃকার প্রতি সম্বোধন বা দেশবাসীকে সম্বোধন করে রচিত গানগুলির বিশ্লেষণে এই বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। হিন্দুমেলার গানের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি', কিংবা সত্যেন্দ্রনাথের 'গাও ভারতের জয়', গণেন্দ্রনাথের 'লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি করে'—ইত্যাদি গানের 'ভারত' শব্দ ব্যবহারের মধ্যে তৎকালীন জাতীয় আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রচনা করেই ভারতচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। ভারতবর্ষের অঞ্চল বিশেষের কোন সমস্যা বা আন্দোলন এযুগে গুরুত্ব পায়নি, তাই হয়ত স্বদেশ চিন্তায়ও সর্বভারতীয় কল্পনা স্থান পেয়েছে। অতীতচিন্তা বিষয়ক স্বদেশী গানে যে জন্মভূমির কথা বলা হয়েছে তা বঙ্গভূমি নয়, স্বদেশের অর্থ এখানে ভারতবর্ষ স্বদেশ-সম্পর্কিত গানের নাম 'ভারতগান'।[১]

অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গে জাতীয়তাবোধ বাংলাদেশের সাময়িক আলোড়নকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। তাই এযুগের গানে অনিবার্যভাবেই বঙ্গ চিন্তার প্রাধান্য দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের—

"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি,
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।"

অথবা 'সোনার বাংলা' গানে বাংলাদেশ থেকেই স্বদেশ জননীর মূর্তি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বঙ্গমাতা

১। রাজকৃষ্ণ রায় স্বদেশবিষয়ক একশ'টি গানের যে বই রচনা করেন, তার নাম ছিল 'ভারতগান' (১৮৭৮)।

ভারতমাতার বোধকে কিছুটা আচ্ছন্ন করেছিল। অক্ষয় সরকার ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে প্রশ্ন করেছিলেন—

"আপনারা বঙ্গমাতা, বঙ্গমাতা লইয়া এত বাড়াবাড়ি করিয়া জগজ্জননী ভারতমাতাকে ভুলিতে বসিয়াছেন কেন? আমরা কি কাশীকাঞ্চী মথুরার মায়া ভুলিয়া যাইব? বেদ-স্মৃতি-পুরাণ ইত্যাদি সব ভুলিব? রাম-লক্ষ্মণ-ভীষ্ম-দ্রোণের কথা মনেই আনিব না? সে কি রূপ Patriotism (দেশভক্তি) হইবে?"[১]

স্বদেশী গানের মধ্যে অবশ্য বঙ্গ ও ভারতবোধের কোন বিরোধ ছিল না। বঙ্গ-ভাবনা ভারত-ভাবনারই পরিপূরক, কোন নিকৃষ্ট প্রাদেশিকতার পরিচায়ক নয়। Heimsath লিখেছেন—

"Of the early national sentiments among Bengalis, those which incorporated the richest historic, cultural and linguistic references were expressed in reference not to India, as a whole, but to the province of Bengal.

Bankim Chandra Chatterjee, whose patriotic poem 'Bande Mataram' (Hail to the Mother) later found acceptance by Indians from other provinces, limited the patriotism in his stirring writings to Bengal."[২]

এ বক্তব্যের প্রতিবাদে শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন—

"these two statements of Heimsath stand at cross purposes. The latter is indeed as misleading as it is incorrect. Before Bankim writers and thinkers had expressed their fervent

১। প্রমথনাথ বিশী—পূঃ উঃ, পৃঃ ২৩২

২। Heimsath, C. H.—*Indian Nationalism and Hindu Social Reform*, Princeton, 1964, p. 137f.

patriotic feelings which had reference to India as a whole and not just confined to the province of Bengal.[১]

এই প্রসঙ্গে তিনি রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' মাইকেলের King Porus ভারতভূমি সনেট, হেমচন্দ্রের ভারত সংগীত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নলব্ধ' ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং বঙ্কিমের বিভিন্ন রচনার কথা উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানে একইকালে 'ভারত' ও 'বঙ্গ'চিন্তা বর্তমান। তাঁর 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গানের 'মা' সমগ্র ভারতভূমি। 'জাহ্নবী যমুনা'র বিগলিতপ্রবাহ-বিধৌত দেশ—শুধ্ বাংলাদেশ নয়। বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরে জাতীয়তাবোধ আবার দেশের খণ্ডিত সত্তাকে পরিত্যাগ করে সমগ্র ভারতের চিন্তাকে যে গ্রহণ করেছে, তার পরিচয়ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানে পাওয়া যায়। তাঁর 'জনগণমন' গানে 'ভারতভাগ্য-বিধাতার' জয় ঘোষিত হয়েছে, বঙ্গদেশের নয়। আবার 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানেও ভারতবর্ষকে অবলম্বন করেই তাঁর ভবিষ্যৎ স্বপ্ন রচিত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানে ভারতবর্ষকে নিয়ে এই দ্বৈত চিন্তা ফুটে উঠেছে। একটি গানের 'জগদ্ধাত্রী' মূর্তি প্রকৃতপক্ষে জননী ভারতবর্ষ। আবার অন্য একটি গানে কবির জন্মভূমি, "বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ।" তবে দ্বিজেন্দ্রলালের গানের বঙ্গভূমি-স্তুতি ও ভারত-বন্দনায় কোনও প্রভেদ নেই—উভয় চিন্তা প্রায়ই একাত্ম হ'য়ে গিয়েছে।

নজরুলের গানেও 'উদার ভারত'-এর কথা আছে, আবার মাতৃভূমির নিসর্গশোভার বর্ণনায় শ্যামলবরণ বাংলাদেশের কোমল মূর্তিই তিনি অংকিত করেছেন।

১। Das, Sisir Kumar—'Nationalism in 19th Century Bengali Literature' *Thought*, Oct. 10, 1964, pp. 9-10.

স্বদেশী গানের ভারতচিন্তা ও বঙ্গচিন্তা যুগ্মভাবেই হোক বা বিচ্ছিন্নভাবেই হোক—এই গানের ধারায় আদ্যন্ত প্রবাহিত। তাছাড়া, অখণ্ড ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের খণ্ড অংশকে উপলক্ষ্য করেই হোক—স্বদেশী গানের সংগীতকারের কল্পনায় স্বদেশ জননীরূপে প্রতিষ্ঠিতা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বদেশী গানে ইতিহাস চেতনা

১

বাংলা দেশপ্রেমের গানগুলিকে কালচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি ধারায় প্রবাহিত বলা চলে। বর্তমান পরাধীনতার গ্লানি ও বেদনা-বোধ গানগুলির কেন্দ্রভূমি হওয়া সত্ত্বেও অতীত কালের গৌরব কথার স্মরণ ও ভবিষ্যতের অনাগত গৌরবের আশা গানগুলিকে স্বতন্ত্রতা দিয়েছে। এই গানগুলির মধ্যে অতীত গৌরব, বর্তমান গ্লানি ও ভবিষ্যতের স্বপ্নের যে রূপ দেখা যায়, তা বলাই বাহুল্য, সংগীত রচয়িতাদের কোন মৌলিক চিন্তা, গবেষণা বা কল্পনার ফল নয়। সমকালীন ভারতবর্ষের, বিশেষত বাংলাদেশে রাজনৈতিক চেতনারই প্রকাশ মাত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বাংলাদেশে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চা শুরু হয়েছে, পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বা আধুনিক পদ্ধতিতে। প্রকৃতপক্ষে এশিয়াটিক সোসাইটির (১৭৮৪) প্রতিষ্ঠা থেকেই তার শুরু। সংস্কৃত চর্চা এবং তাকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষের ধর্মসংস্কৃতির যে চর্চা, যার বৃহত্তর রূপ প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা, তা ইউরোপে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রাচ্যবিদ্যা একটি গভীর প্রেরণা সঞ্চার করেছিল ভারতীয় রাজনৈতিক চেতনায়। প্রাচ্য-তত্ত্ববিদেরা, বিশেষত, জর্মান প্রাচ্য-তত্ত্ববিদেরা প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি আশ্চর্য রূপলোক তৈরী করেছিলেন, তথ্য ছিল নিশ্চয়ই, তবু তার অনেকটাই স্বপ্ন ও স্মৃতি দিয়ে গড়া দেশমূর্তির প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল মূর্তি রচনা করতে সাহায্য করেছিল। বিদেশী শাসকের সঙ্গে বাঙালীর সম্পর্কের মধ্যে যে হীনমন্যতার বেদনা ছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিত গঠিত ও সৃষ্ট অতীত

ভারতবর্ষের মায়াজাল সেই বেদনাবোধে কিছু পরিমাণ প্রলেপ দিতে পেরেছিল। যে কোন জাতিই তার অতীতের জীবন ও কর্ম নিয়ে গর্ববোধ করে, অতীতের মধ্যে যা কিছু গর্বের বিষয় তাকে সযত্নে রক্ষা করে, আর সে জাতি যদি পরাধীন হয়, তাহলে অতীতের গৌরব আরও মূল্য পায়। স্বাভাবিকভাবে বাঙালীর দেশপ্রেমে অতীতের স্মৃতি তাই তীব্র প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। এখানে আরো একটি কারণ ছিল, তা হ'ল এই যে, ভারতবর্ষের অতীত মহিমা যে কত ব্যাপক, কত শক্তিশালী—তা আরো প্রমাণিত হ'ল কারণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের মধ্যে সভ্যতার ও সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠাকে প্রত্যক্ষ করলেন। আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের শাসক ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। এই রকম একটা মনোভাবের ফলে ভারতবর্ষের অতীত কথার সোচ্চার ঘোষণা ভারতীয় মনীষীদের রচনায় এত বেশী। দেশপ্রেমের গানগুলি তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

স্বদেশী গানে অতীত ভাবনার দু'টি স্পষ্ট কারণ সহজেই চোখে পড়ে। প্রথমত, স্বাভাবিকভাবেই অতীত গৌরবের স্মৃতিচারণ বর্তমান কর্মে প্রেরণা সঞ্চারের জন্য দ্বিতীয়ত, বর্তমানের বেদনা থেকে এক ধরণের পলায়নী চিন্তা। সমকালীন উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা ও নাটকও এই কাঠামোর মধ্যে দেখা যায় এবং সেখানে বহুক্ষেত্রেই এই দু'টি কারণ স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। মাইকেলের একটি সনেটে দেখি তিনি প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে, নিজেদের হীনতার কথা স্মরণ করেছেন, বঙ্কিমের সীতারামেও দেখি ললিতগিরি প্রসঙ্গে লেখক প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ করেছেন নিজের বর্তমান দীনতার পটভূমিকায়। এই চিন্তাধারার গতি উল্টো করলে আর একটি ছবি পাওয়া যাবে—সেখানে দেখব বর্তমান দীনতাকে ঢাকবার জন্য অতীতের জয়ধ্বনি করা হচ্ছে। অর্থাৎ অতীত ভাবনা প্রকৃতপক্ষে বর্তমান ভাবনারই আর একটি দিক।

২

দেশাত্মবোধের উন্মেষলগ্নে দেশমাতৃকার প্রাচীন মহিমা দেশপ্রেমিকের চোখে বড় হ'য়ে ওঠেনি—বর্তমান দৈন্যই বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছিল। এই দীনতা থেকে উত্তীর্ণ হবার একমাত্র উপায় ছিল ভারতের অতীত গৌরব মহিমার আশ্রয় নেওয়া। এই কারণেই স্বদেশী গানের চিন্তাধারায় দেশের বর্তমান দৈন্য ও অতীত মহত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা মুখ্য হ'য়ে উঠেছে। অবশ্য দেশবাসীর স্বদেশ-সম্পর্কিত বিচিত্র উপলব্ধি বা অনুভূতির কোনও বিশেষ একটিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবিমিশ্রভাবে গীতিকারের চিন্তাকে উদ্বোধিত করেনি, আনুষঙ্গিকভাবেই আরও এক বা একাধিক ভাব মিশ্রিত হ'য়ে রয়েছে। দেশের বর্তমান দৈন্য দেখে কবি যেখানেই বেদনাকাতর হয়েছেন, সেখানেই তিনি বেদনাবোধ কাটিয়ে ওঠার জন্য অতীত গৌরবকে স্মরণ করেছেন। এভাবে বর্তমান চিন্তা অতীত চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আবার বর্তমান দৈন্যের মধ্যেও অতীত গৌরব ঐতিহ্যই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দেশবাসীকে আশান্বিত করে তোলায় বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যৎ ও অতীত চিন্তা যুক্ত হয়েছে। তবে যে গানে যে চিন্তাটি প্রধান হ'য়ে উঠেছে, তাকেই অবলম্বন করে গানটিকে সেই বিশেষ চিন্তার অন্তর্গত করে চিন্তার শ্রেণীবিন্যাস ও স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। বাংলা স্বদেশী গানে চিন্তা বৈচিত্র্য অনুসন্ধানই এই প্রয়াসের লক্ষ্য।

একই কবি বিভিন্ন বিষয়ে স্বদেশী গান রচনা করেছেন—যেমন, জাতীয় ঐক্য, দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, মাতৃভাষা ইত্যাদি। এছাড়া একই চিন্তাধারা বিভিন্ন কবিমনে ব্যক্তিমানসের স্বাতন্ত্র্য ও মনোভাব অনুযায়ী ভিন্ন অনুভূতি বা আবেগ জাগিয়েছে। ফলে, একই চিন্তা নিয়ে রচিত একাধিক গানের মধ্যেও ভাবগত পার্থক্য দেখা যায়। তাই দেশের বর্তমান দৈন্য দেখে কোনও কবি অতীত গর্বের আশ্রয়ে আত্মগোপন করেছেন, কোথাও বা এই অবস্থার

বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আদর্শ ঘোষিত হয়েছে। স্বদেশী গান-গুলিতে যে অতীত চিন্তা তা তিনটি উপধারায় প্রবাহিত—

(১) অতীত মহিমার বর্ণনা ;

(২) অতীত গৌরবের পটভূমিকায় বর্তমান দীনতা এবং অতীতের দ্বারা বর্তমানের গ্লানি মোচন ;

(৩) অতীত গৌরবের পুনরাবির্ভাব ও ভবিষ্যতের আশা।

গানগুলিতে কখনও ধারাগুলি স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র ; কখনও তারা মিশ্রিত। বিশুদ্ধ অতীত গৌরব ধারার গানে ভারতবর্ষের ইতিহাসের গৌরবময় ঘটনা বা অধ্যায়, পৌরাণিক কাহিনী, অতীতের মহিমাময় ব্যক্তি-চরিত্রের মাহাত্ম্য স্মরণ করে গর্ববোধ করেছেন কবি। ভারতীয় কবির কবিশক্তি, শিল্পীর শিল্পপটুত্ব, দার্শনিকের দর্শন জ্ঞানের গভীরতা, ক্ষত্রিয়ের শক্তির প্রাবল্য, রমণীর সতীত্বের মহিমা ইত্যাদি দেশপ্রেমিকের কাছে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, দেশবাসীর সামনে এই আদর্শ তুলে ধরে তাদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করাই গানগুলির লক্ষ্য। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গাও ভারতের জয়' গানটি এই শ্রেণীর গানের মধ্যে পুরোভাগে স্থান লাভের যোগ্য। কবির এই ভারতভূমি শুধু ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ ভূতল খণ্ড মাত্র নয়। তা হ'ল—

"ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত-খনি কত মণিরত্নের নিধান !"

দেশের 'মণিরত্ন' শুধু প্রাকৃতিক সম্পদেই নিঃশেষ হয়নি ; জ্ঞানে, কর্মে, চিন্তায়—জীবনের বিচিত্র দিকে, অতীত ভারতের অসংখ্য মানুষ সফলতার উচ্চশীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। তাঁদের কীর্ত্তি স্মরণ করে, তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে হ'বে।

"বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস
কবিকুল ভারতভূষণ।"

এই ভারতভূমি বীরের জননী, সে বীর-যোনি—

"ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীরগণ।
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল-ধূমকেতু,
আর্তবন্ধু দুষ্টের দমন।"[১]

দ্বিজেন্দ্রলালের সুপ্রসিদ্ধ গান 'ভারত আমার, ভারত আমার'—এ দেখি ভারতবর্ষ শুধু কবির কাছেই মহিমান্বিত দেশ নয়, তা সমগ্র এশিয়ার তীর্থক্ষেত্ররূপে স্বীকৃত। প্রাচ্য দেশগুলির কাছে কর্ম্ম-ভক্তি, ধর্ম্ম-শিক্ষা, দর্শন-উপনিষদের দীক্ষাভূমি এই ভারতবর্ষ। সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় স্মরণ করে কবি বর্তমান দীনতাকে তুচ্ছ করতে পারছেন।

"আর্য্য ঋষির অনাদি গভীর,
উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র;
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি,
নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র!
তোমার গরিমা-স্মৃতির বর্ম্মে
চলে যাব শির করিয়া উচ্চ,
যাদের গরিমাময় এ অতীত
তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ।"

১। এই উপধারার অন্যান্য সংগীতকারদের রচনার (ক্রোড়পঞ্জী ৩, দ্রষ্টব্য) মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—

(ক) রামকৃষ্ণ রায়—'কোথা সে অযোধ্যাপুর, মথুরা এখন'
(খ) আনন্দচন্দ্র মিত্র—'কোথায় রহিলে সব ভারতভূষণ'
(গ) সরলাদেবী—'অতীত গৌরব বাহিণি'
(ঘ) রজনীকান্ত—'জয় জয় জনমভূমি জননি', 'সেথা আমি কি গাহিব গান'
(ঙ) অতুলপ্রসাদ—'বল বল বল সবে'
(চ) দ্বিজেন্দ্রলাল – 'বঙ্গ আমার! জননী আমার!'

স্বদেশী গানে ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের পশ্চাদ্‌পট হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালীর ইতিহাস চর্চা ও প্রাচ্য-তত্ত্ববিদের ভারত চর্চার কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি এশিয়ার ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের ভাষা (সংস্কৃত) ও ব্যাকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের শ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি[১] শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে দেশীয় ভাষা-সাহিত্যের প্রতি সম্ভ্রম ও অনুরাগ জাগিয়ে তোলে। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের চেষ্টায় বেদ, বেদান্ত, ধর্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ, পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি ইউরোপে মুদ্রিত ও অনুদিত হতে দেখে ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসী ইতিহাস চর্চায় আগ্রহী হলেন।[২] সঙ্গীতকারগণও এই আবহাওয়ায় তাঁদের কবিমানসকে পরিপুষ্ট করেছেন। কাজেই খুব সঙ্গতভাবেই তাঁরা স্বদেশী গানেও ইতিহাস সমর্থিত তথ্যাদির উল্লেখ করে দেশের মানুষের মনে স্বাজাত্যবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাস চেতনা স্বদেশ ভাবনারই অগ্রদূত।

১। William Jones বলেন, "Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of wonderful structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either." Max Müller পাণিনি সম্বন্ধে বলেন, "...there is no grammar in any language that could vie with the wonderful mechanism of his eight books"—Quoted by Das, S. K. in *Western Sailors : Eastern Seas*, Delhi, 1971, p. 11.

২। এই সময়ে রচিত অজস্র ইতিহাস গ্রন্থ বাঙালীর ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের প্রবণতার পরিচায়ক রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শিবাজীর চরিত্র (১৮৬০), মেবারের রাজেতিবৃত্ত (১৮৬১) ; সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, রাজস্থানের ইতিবৃত্ত, মিবার (১৮৭২-৭৩) ; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৯৫) ; রামদাস সেন, ভারতরহস্য (১৮৮৫) ; রজনীকান্ত গুপ্ত, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস (১৮৭৯-১৯০০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দেশের ইতিহাস রচনার মধ্য দিয়েই দেশ সম্পর্কে উপলব্ধি বা স্বদেশ চেতনা স্পষ্টরূপ লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করেই বাঙালীমানসে স্বদেশপ্রেম সঞ্চারের উপায়স্বরূপ বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার উপযোগিতার কথা বলেছেন। বাঙালীর মনে স্বাজাত্যবোধের অভাবের একটি মাত্র কারণ তিনি আবিষ্কার করেছেন, তাহ'ল—"বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই। ...যে জাতির পূর্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্য রক্ষায় চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ...বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চায়,—হায়! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই? বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না।"[১]

এই ইতিহাস পর্যালোচনাকালেই দেশবাসী দেশের অতীত গৌরব স্মরণ করে যেমন গর্ববোধ করেছে, তেমনি দেশের বর্তমান দীনমলিন, হতশ্রী অবস্থা তার মনে বেদনাবোধ জাগিয়ে তুলেছে। স্বদেশী গানেও এই দ্বৈত উপলব্ধির প্রকাশ দেখা যায়। হীনতাপংকে মজ্জিত, লজ্জিত ভারতের ধূলিবিলুণ্ঠিত সুপ্তিই তার প্রকৃত পরিচয় নয়। তাই অতীত মহিমাজ্যোতির পুনঃপ্রকাশ কামনা করে দেশ-প্রেমিক সংগীতকার দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছেন—

"উঠ গো ভারতলক্ষ্মী, উঠ আদি জগত-জন-পূজ্যা,
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, করো দূরিত ভারত-লজ্জা।"

বর্তমানে দেশজননী শোকশয্যাশায়ী, দুঃখলাঞ্ছিত ভারতবাসী প্রতিপদে শংকাতুর। কিন্তু দেশের এই দীনমলিন, শোকপীড়িত অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেই। কেননা, কবির বিশ্বাস—

"উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্ধ-জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর;

১। বঙ্কিমচন্দ্র—'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৬

অশোক যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি শেষ,
তুই কিনা মাগো তাঁদের জননি, তুই কিনা মাগো
তাদের দেশ !"[১]

তৃতীয় উপধারার গানগুলিতে অতীতচিন্তা ক্রমে বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করছে। প্রাচীন কীর্ত্তি, প্রাচীন গরিমা, শৌর্য্য-বীর্য্যের মহান কাহিনী দেশবাসীর মনে জাগিয়ে তুলেছে ভবিষ্যতের জন্য এক দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। 'যুগযুগান্ত তিমির অন্তে' দেশজননী আবার আনন্দোৎফুল্ল হয়ে উঠবেন—স্বদেশ ভক্তের হৃদয় সেই আশার সুরে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। যে ভারতবর্ষের—

"প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা বন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন,
কহিছে গৌরবকাহিনী"

কবির দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে দেশের অধিবাসী জাতির জাগরণ প্রত্যক্ষ করবেই।

"মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে,
ঋষি-রাজকুল জন্মেনি মিছে ;
দুদিনের তরে হীনতা সহিছে,
জাগিবে আবার জাগিবে।

১। এই ভাবের সংগীতকারদের রচিত গান (ক্রোড়পঞ্জী ৩, দ্রষ্টব্য)—
(ক) দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—'ভারতদুঃখিনী আমি'
(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি'
(গ) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—'স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি'
(ঘ) অতুলপ্রসাদ সেন—'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী'
(ঙ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—'মনোমোহন মূরতি আজি মা তোমারি'
(চ) নজরুল ইসলাম—'আমার সোনার হিন্দুস্থান'

আসিবে শিল্প ধনবাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা বিনয় বীর্য
আসিবে আবার আসিবে।"[১]

জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতের দুর্যোগের অমারাত্রি অবসান লাভ করবে এবং দেশ "পুণ্যেবীর্যে অভয়ে অমৃতে হইবে পলকে সজ্জিত হে"। 'গৌরবমণি-মালিনী' ভারতমাতার দুঃখনিশার অবসানে—

"আবার তোমায় দেখিব জননি
সুখে দশদিক-পালিনী।
অপমান ক্ষত জুড়াইবি মাত
খর্পর-করবালিনী! শৌর্যবীর্যশালিনি।"

সরলাদেবীর এই গানটিতে অতীতচিন্তার মধ্যে ভবিষ্যতের আশা গভীরভাবে নিহিত রয়েছে। আশাবাদী কবি বর্তমানের বেদনাভারে নুয়ে পড়েননি—ভবিষ্যতের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনের আশ্বাসই তাঁকে সঞ্জীবিত রেখেছে। গানটির এই গুণের পরিচয় পেয়ে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর কাগজে গানটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেন—

"এতদিন দেশে যত জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয়ে এসেছে, সবেরই ভাব হতাশাময়, অতীতের স্মরণে শোকমূলক ক্রন্দনময়। এই গানের প্রাণ আর এক রকমের—বর্তমানের উপর দাঁড়িয়ে তেজস্বিতার সঙ্গে উৎসাহময় ও ভবিষ্যতের নিশ্চিন্ততায় আনন্দময়।"[২]

তিনটি উপধারায় বিভক্ত 'অতীতচিন্তা' ধারার গানগুলির অধিকাংশই স্বদেশী গানের উৎসযুগে রচিত হয়েছে। পরবর্তীকালেও এই ভাবের গান রচিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রথম যুগে এই বিষয়ের

১। এই ভাবের গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগতজনের শ্রবণ জুড়াক" গানটি উল্লেখযোগ্য।

২। সরলাদেবীচৌধুরানী—'জীবনের ঝরাপাতা', ১৯৫৮, পৃঃ ১০৩-১০৪

প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। আর্য-সভ্যতা, আর্য-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব, অতীত ঐতিহ্যের ধারকরূপে গর্ববোধ, বলা বাহুল্য, সম্পূর্ণভাবে সংগীতকারদের আত্মোপলব্ধি সঞ্জাত নয়, তা অনেক পরিমাণেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ে গবেষণার দান। এতদিন ভারতবাসীর কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন-ইতিহাসের অক্ষয় ভাণ্ডার ছিল শুধু ইউরোপ, এবার তারা ভারতবর্ষকেও তার সমতুল্য বলে উপলব্ধি করে গর্বিত হ'ল। শিক্ষিত ভারতীয়ের এই চেতনার পরিবর্তন সম্বন্ধে শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন—

> "He was passionately attracted to Europe with a sense of inferiority. Now his love for Europe became complimentary to his adoration for India."[১]

স্বদেশী গানেও দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনুসন্ধানের পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে আর্য-মহিমা বা আর্য-চেতনার উপলব্ধিতে।[২]

(১) "শংকর গৌতম কথা প্রতাপের বীর গাথা
গাও আজি পথে পথে নগরে নগরে রে।"

(২) একদা যাহার বিজয়সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়;
... ...
উঠিল যেখানে মুরজমন্ত্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস যেথা গাহিল গান,
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য"...

(৩) এখনো আমরা সেই আর্যের সন্তান হে...
সেই বেদ সে পুরাণ আজো বর্তমান হে...

১। Das, Sisir Kumar—*op. cit.*, pp. 12-13.

২। রাজকৃষ্ণ রায় ও দ্বিজেন্দ্রলালের গানে এই চেতনার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। হিন্দুমেলার গানে এই চিন্তা সুস্পষ্ট। স্বদেশী বা পরবর্তীযুগে এই চেতনা অনেকাংশে ম্লান, অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল তার ব্যতিক্রম।

স্বদেশী গানে দেশের অতীত ইতিহাসের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর উৎসমূলে রাজপুত জাতির শৌর্যবীর্য বা স্বাধীন হিন্দু রাজবংশের সাহস ও শক্তির কাহিনী রস সঞ্চার করেছে। প্রতাপসিংহের বীরত্ব ও মেবার পাহাড়ের নামোল্লেখ স্বদেশপ্রেমিকের মনে শৌর্যবীর্য, আত্মত্যাগের আদর্শ উজ্জ্বল করে তোলে।

(১) "মেবার পাহাড়-উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ দর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।"

(দ্বিজেন্দ্রলাল)

(২) "নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার,
পুণ্য হল্‌দীঘাট—আজো বর্তমান।
নাই উজ্জয়িনী, অযোধ্যা, হস্তিনা ?" (দ্বিজেন্দ্রলাল)

তবে কল্পনামিশ্রিত ইতিহাস চেতনার প্রধান উৎসের সন্ধান পাওয়া গেল কর্নেল জেমস্ টডের রাজস্থানের ইতিহাসে। সুকুমার সেন তার কারণ নির্দেশ করেছেন—

"ইংরেজি সাহিত্যে যে দেশপ্রেমের স্বাদ পাওয়া গিয়াছিল এবং ইংরাজী শিক্ষায় যে স্বাধীনতা-হীনতার বেদনা জাগাইয়াছিল তাহার নিবৃত্তির কোন পথ তাঁহাদের সামনে ছিল না। এখন রাজস্থানের বীরত্ব কাহিনীর মধ্যে রোম-গ্রীসের ইতিহাসে পড়া কাহিনীর স্বাদগন্ধ অনুভব করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী যেন রূপকথার রাজ্যে প্রবেশ করিল।"[১]

স্বদেশী গানে ভারতের অতীত ইতিহাসের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীই শুধু উল্লিখিত হয়নি। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য—ইত্যাদি বিষয়েও ভারতীয়দের অতীত শ্রেষ্ঠত্বের কাহিনী গানের উপজীব্য বিষয় হয়েছে। নানক, নিমাই, লীলাবতী, ভবভূতি, কালিদাস, খনা—প্রভৃতির অবিস্মরণীয় অবদানের উল্লেখ দেশবাসীর অন্তরে দেশ সম্বন্ধে পরম গর্ববোধ ও শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে। পৌরাণিক গ্রন্থ, পৌরাণিক কাহিনী,

১। সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৯৬৩, পৃঃ ২১১

তাতে বর্ণিত পৌরাণিক স্থানের উল্লেখ, এই ধারার গানের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক কাব্যের বিবিধ ব্যক্তিনাম—যথা, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, দ্রোণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, রাম, যুধিষ্ঠির, সীতা, সতী, সাবিত্রী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির উল্লেখের মাধ্যমে অতীত ভারতের প্রতি সঙ্গীতকারদের শ্রদ্ধা পরিস্ফুট হয়েছে। ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থ স্থান, নদী-গিরির নামও অতীতকালের গৌরব বা মহিমার অনুষঙ্গ হিসেবেই সঙ্গীতকারের কল্পনায় ধরা পড়েছে। অযোধ্যা, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন, হিমালয়, কৈলাস, বিন্ধ্য, গঙ্গা, জাহ্নবী, যমুনা, গোদাবরী প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার গানগুলিতে বিশেষ করে চোখে পড়ে।

স্বদেশী গানের আর্য বা 'হিন্দু' চেতনার প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা দরকার। তা হ'ল এই যে স্বদেশী গানের প্রথম যুগে 'আর্য' 'হিন্দু' প্রভৃতি প্রসঙ্গ এবং শব্দ খুব বেশী ব্যবহৃত। গীতিকারগণ দেশবাসীর মনে সাম্প্রদায়িক স্বদেশচিন্তা জাগাতে চেয়েছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থাকলেও পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে যেখানে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে সেখানে এই 'আর্য' ও 'হিন্দু' চিন্তা স্বদেশ-চিন্তার পরিপন্থী হয়ে উঠেছে।

তবে, নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখলে ভারতীয় জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ যুগে অতীত গৌরবের প্রতি তীব্র আগ্রহ অসঙ্গত বলে মনে হয় না। তার কারণ হ'ল প্রাচ্যবিদ্ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গবেষণা মূলতঃ ছিল এই হিন্দু সভ্যতা-কেন্দ্রিক। তার প্রভাবে স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্ত কবি-গীতিকার এই সভ্যতার নিদর্শন থেকেই আত্মশ্লাঘার উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

জাতীয় আন্দোলনের এক পর্বে স্বদেশী গানের এই হিন্দু চেতনা অহিন্দুদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা এর মধ্যে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ'-এর সংকীর্ণতা ও অনুদারতার চিহ্ন দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। অন্যদিকে, হিন্দু সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক

গর্ববোধ চরিতার্থ করার অবকাশ হয়ত এসব গানে ছিল। অবশ্য, স্বদেশী গানের রচনার উৎস ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিচার করলে মনে হয় এই গানের হিন্দুত্বের ধারণা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা বোধ-সঞ্জাত কোনও অনুদার চিন্তা নয়, তা বিশেষ যুগের দেশবাসীর মনে ঐতিহ্যগৌরব ও স্বাজাত্যবোধ স্ফুরণের অনুপ্রেরণা হিসেবেই স্থান পেয়েছিল।

৩

স্বদেশী গানের 'বর্তমান চিন্তা' ধারাটি দ্বিধা বিভক্ত। এই দু'টি ভাগের একদিকে রয়েছে দেশের বর্তমান দুর্দশা ও অভাবের, অন্যদিকে বর্তমানের যে মহত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তার পরিচয়।

প্রথম ভাবটি পাঁচটি উপধারায় প্রবাহিত হয়েছে—

(১) দেশের বর্তমান দুর্দশা ;
(২) দুর্দশার কারণ : শাসন-শোষণ ;
(৩) দুর্দশার প্রতিকার : বিদেশী শাসনের প্রতিবাদ ;
(৪) উদ্দীপনা ;
(৫) সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা।

প্রথম উপধারার কয়েকটি গান উদ্ধার করা যাক।

(ক) "হায় কি তামসী নিশি ভারত-মুখ ঢাকিল।
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল॥"
(উপেন্দ্রনাথ দাস)

(খ) "দেখো চেয়ে তব সহস্র সন্তান লাজে নতশির,
ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান—লাজ মান আর থাকে না।"
(রবীন্দ্রনাথ)

(গ) কি গাইব আজি, হায় কি আছে ভারতে আর ?
হুহু করে প্রাণ মন, ধু-ধু করে চারি ধার।

(রাজকৃষ্ণ রায়)

(ঘ) নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা।
সোনার প্রতিমা, আজি শোকে মলিনা॥

(কালীপ্রসন্ন ঘোষ)

(ঙ) সাধের ভারতভূমি ঢাকিল কি অন্ধকারে।

(আনন্দচন্দ্র মিত্র)

(চ) এস মা ভারত জননী আবার জগততারিণী সাজে।
রাজরানী মা'র ভিখারিণী বেশ দেখে প্রাণে বড় বাজে॥

(নজরুল)

এই দীনতার কারণ অনুসন্ধানে কবি দেখেছেন ভৌগোলিক দিক বা প্রাকৃতিক দিক থেকে ভারতবর্ষের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

"সেই তো রয়েছ মা তুমি
ফলে ফুলে সুশোভিতা শ্যামা জন্মভূমি।"

(কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ)

অথচ ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন এসেছে। ভারতের অতীত ঐশ্বর্য বিলুপ্ত হবারই বা কারণ কি ? পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেশসেবী তাঁর প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন যে বিদেশী শাসন ও বিদেশী শোষণই ভারতের বর্তমান দুর্দশার জন্য দায়ী। বৈদেশিক শাসন ও শোষণের অপমান জ্বালায় স্বদেশপ্রেমিক পীড়িত। কুণ্ঠিত সংগীতকারেরও সংকোচ দুর্বল কণ্ঠস্বর।

"লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি করে।
লুঠিতেছে পরে এই রত্নের আকরে॥
... ...

দেশান্তর-জনগণ ভুঞ্জে ভারতের ধন,
এ দেশের ধন হায়, বিদেশীর তরে ॥”

(গণেন্দ্রনাথ)[১]

বিদেশী শাসনের অধীনতার এই মর্মবেদনা কখনও কখনও দীর্ঘশ্বাস হ'য়ে বেরিয়ে আসে—

“না জানি জননী। কতদিন আর
নীরবে সহিবে হেন অত্যাচার,
উঠিবে কি কভু বাজিয়ে আবার,
স্বাধীন ভারতে বিজয়-বিষাণ”

বিদেশী শাসনে দেশ শোষিত, মানুষ পীড়িত, দেশের যেটুকু উন্নতি তাতে দেশবাসীর অধিকার সংকুচিত। গীতিকার তাই দুঃখ করে বলেছেন,—

“উন্নতি, উন্নতি”—উল্লাস-ভারতী, কেন দিবারাতি বল রে ?
কিসের উন্নতি? দেশের দুর্গতি ; দেখে শুনে তবু ভোলোরে।”

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বাষ্পীয় যানবাহনের প্রচলন—ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে যেটুকু উন্নতি হয়েছে, দেশবাসী তা দ্বারা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে ? বিদেশী শাসনের করভার, বিদেশী শিল্পের আমদানীর ফলে দেশীয় শিল্পের বিনষ্টি—ইত্যাদির ফলে দেশের আর্থিক অনটন চরমে উঠেছে,[২]—আবার এই দারিদ্র্য ও অনটনের ফলে দেশবাসীর নৈতিক

১। গণেন্দ্রনাথ ছাড়া অন্যান্যদের রচিত গান (ক্রোড়পঞ্জী, ৩, দ্রষ্টব্য)—
(ক) রাজকৃষ্ণ রায়—‘তোমাদের এ কি বিবেচনা’।
(খ) মনোমোহন বসু—‘দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন’।
(গ) গোবিন্দচন্দ্র রায়—‘কতকাল পরে, বল ভারত রে,’।
(ঘ) অশ্বিনীকুমার দত্ত—‘আয় আয় সবে ভাই যাই দ্বারে দ্বারে’ ‘ওরে ভাই কিসের লেগে দিনে দিনে’।

২। এই ভাবের অতি পরিচিত গান হ'ল মনোমোহন বসুর ‘দিনের দিন সবে দীন’। অর্থনৈতিক শোষণ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। (ক্রোড়পঞ্জী, ৩, দ্রষ্টব্য)

অধঃপতনও হয়েছে। বর্তমান দুর্দশার সেটিও আর এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এসকল উপলব্ধি দেশবাসীর মনে জেগেছে বলে দুর্দশা প্রতিকারের পথের অনুসন্ধানও আরম্ভ হয়েছে।

বিদেশী শাসনের প্রতিবাদে, বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত করার ইচ্ছায় রচিত হয়েছে নানা গান। তাদের মধ্যে কোন কোন গানের রচনার প্রেরণা ছিল সমসাময়িক ঘটনা। এ ধরণের গানের মধ্যে পরিচিত ও স্মরণীয় প্রসঙ্গগুলি হ'ল—রাখী সংগীত[১]-এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য রচিত গান বা দেশবাসীর ওপর ইংরেজ শাসকের অত্যাচার, ক্ষুদিরামের প্রাণদণ্ড ইত্যাদি।

বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনীর (১৯০৬) অনুষ্ঠানে ইংরাজ শাসকের নির্মম অত্যাচারের ঘটনা নিয়ে গান লিখলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। তাঁর—

"আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হলো লাঠির ঘায়
ঐ যে মায়ের জয় গেয়ে যায়॥ (বন্দেমাতরম্ বলে)

অথবা

"মাগো, যায় যেন জীবন চলে,
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাযে
বন্দেমাতরম্ বলে॥"

এসব গান সেকালের স্বদেশপ্রেমিক বাঙালীর চিত্তে অসীম সাহস দিয়েছে ও দেশসেবার জন্য দুঃখ বরণে অনুপ্রাণিত করেছে। স্বদেশী গানের এই সকল প্রসঙ্গের সঙ্গে ভাবের ঐক্য বজায় রেখেছে এযুগের

১। রবীন্দ্রনাথের—'বাংলার মাটি, বাংলার জল'। 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান'।
রজনীকান্ত—'এমন সোনার বাংলা ভাগ করে ভাই', 'ফুলার কল্লে হুকুম জারি'।
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—'ছিন্ন হ'ল বঙ্গ কেন ভাব অমঙ্গল'।
অমৃতলাল বসু—'ওরা জোর করে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান'।
(ক্রোড়পঞ্জী, ৩, দ্রষ্টব্য)

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আত্মজীবনী। গানের ভাববস্তুর পরিপূরক হিসেবে এসব অভিজ্ঞতার বর্ণনা গ্রহণ করা চলে। বরিশালের পুলিশের নির্মম অত্যাচারের বর্ণনা সুরেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতায়ও পাওয়া যায়।

৪

বর্তমান চিন্তার প্রথম ধারা হ'ল বর্তমানের বেদনা, দ্বিতীয় ধারা বর্তমানের মহত্ত্ব বা বর্তমান জীবনের মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে তার কথা। এই মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য চিন্তা তিনটি বিষয়কে আশ্রয় করে প্রকাশ পেয়েছে—দেশের প্রকৃতি, মাতৃভাষা ও ব্যক্তিমহিমা।

ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি দেশের অপরূপ শোভার মধ্য দিয়েই দেশমাতৃকার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছেন। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির বর্ণনা বন্দেমাতরম্ গানে স্তবগীতিতে রূপান্তর লাভ করেছে। স্বদেশের ধূলিও দেশপ্রেমিকের কাছে স্বর্ণরেণুতুল্য। দেশের মাটিই দেশবাসীর জননী, আরাধ্যা দেবী।[১] মৃন্ময়ী দেশমাতৃকা চিন্ময়ী দেবীমূর্তি লাভ করলেন স্বদেশী গানে।

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"
(রবীন্দ্রনাথ)

১। এই ভাবের গান—বঙ্কিমচন্দ্রের—'বন্দেমাতরম্'
রবীন্দ্রনাথ—'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' ; 'সোনার বাংলা'
কালীপ্রসন্ন—'স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি'
দ্বিজেন্দ্রলাল—'ধনধান্য পুষ্পভরা'
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—'মধুর চেয়েও আছে মধুর'। (ক্রোড়পঞ্জী, ৩, দ্রষ্টব্য)

দেশভক্ত কবি দেশের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে বলতে পারেন—

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মাগো, তোমায় ভালোবেসে॥
... ...
কোন্ বনেতে জানি নে ফুল, গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে॥"

(রবীন্দ্রনাথ)

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বর্ণনার ক্ষেত্রে কবি-গীতিকার কোথাও সমগ্র ভারতের নিসর্গশোভার চিত্র অংকিত করেছেন, কখনও বা বাংলাদেশের প্রকৃতি তাঁদের নয়ন-মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। 'ভুবনমনোমোহিনী', 'নির্মলসূর্যোকরোজ্জ্বল' মাতৃভূমির—

"নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল,
অনিল বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিতভাল হিমাচল,
শুভ্রতুষারকিরীটিনী।"

(রবীন্দ্রনাথ)

'জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত' ধারা, 'ধনধান্যপুষ্প' পরিপূর্ণ এই ভারতভূমি গীতিকারের কাছে জন্মভূমি নয়, মাতৃভূমি—

"এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়!
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মিশে!
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।"

(দ্বিজেন্দ্রলাল)

জন্মভূমি তখন 'সকল দেশের রানী' হয়ে দেখা দেয়। আবার কখনও সমগ্র ভারত নয়, বাংলাদেশের প্রকৃতির অপরূপ রূপেই কবি মুগ্ধ।

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে
বাজায় বাঁশি॥

... ...

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।"

(রবীন্দ্রনাথ)

এই গান বাংলাদেশকে নিয়ে কবির কোনও ভাববিলাস নয়। বাংলার প্রকৃতি তাঁর অকৃপণ সৌন্দর্যপসরা নিয়ে কবির সামনে উপস্থিত হয়েছে। বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস, বিভিন্ন ঋতুর রঙ্গশালা—বসন্তের আম্রকানন, অগ্রহায়ণের পরিপক্ব শস্যক্ষেত্র—সবকিছুর মধ্য দিয়ে বাংলামায়ের মধুরমূর্তি প্রকাশিত হতে দেখেছেন কবি। বাংলার পল্লীপ্রকৃতির শ্যামলশোভায় কবিমন মুগ্ধ, অভিভূত। বাংলার 'ধূলামাটি অঙ্গে মাখি' এবং পল্লীবাসীর সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করে তিনি জীবনকে সার্থক মনে করেছেন। পল্লীবাংলার প্রকৃতির স্বভাব-সুন্দর এক চিত্র ফুটে উঠেছে এই গানে—

"ধেনুচরা তোমার মাঠে পারে যাবার খেয়া ঘাটে,
সারাদিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,"...

(রবীন্দ্রনাথ)

পল্লীর শ্যামলবরণরূপ ও দেশের মানুষের সহজ, সরল জীবনযাত্রার ছবিও ফুটে উঠেছে বিভিন্ন গানে।

"গিরি-দরী-বনে-মাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়॥
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে
দেখে যা মোর কালো মাকে,
ধূলি রাঙা পথের বাঁকে বৈরাগিনী বীণ বাজায়॥

... ...

হরিৎশস্যে লুটায় আঁচল ঝিল্লিতে নূপুর বাজে,

ভাটিয়ালী গায় ভাটার স্রোতে, গায় বাউল মাঠের মাঝে,
গঙ্গাতীরে শ্মশান ঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায়।" (নজরুল)

বাংলাদেশ তার মাঠ ঘাট, ধানের ক্ষেত, দীঘির কালো জলে পদ্মফুল নিয়ে যেমন মনোরম, নয়নভুলানো রূপে আবির্ভূতা, তেমনি অন্যদিকে গহন অরণ্য, হিংস্রশ্বাপদজন্তু পরিপূর্ণ অঞ্চল নিয়ে ভয়ালরূপ ধারণ করে। দেশ সম্পর্কে, দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে দেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে উপলব্ধি—দেশের এই সামগ্রিক স্বরূপকে গ্রহণ করেই গড়ে উঠেছে। দেশের প্রকৃতিপ্রেম ও স্বদেশপ্রেমের এই একাত্মতা পরে আশ্চর্য নৈপুণ্যে প্রকাশিত হয়েছে জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা'র কবিতায়।

বর্তমানের গৌরববোধের দ্বিতীয় আশ্রয় দেশের ভাষা। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই মাতৃভাষার বন্দনা শুরু হয়েছে বাংলা কবিতায়। নিধুবাবুর 'বিনা স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা'[১] ঈশ্বরগুপ্তের ও মাইকেলের কবিতায় সেই মাতৃভাষা বন্দনার নিদর্শন। ইউরোপের কবি যে আবেগে Nostra Divina Lingua বলেছিলেন সেই আবেগই প্রত্যক্ষ করেছি 'মাতৃভাষারূপ খনি পূর্ণ মণিজালে' (মাইকেল) উক্তিতে।

দ্বাদশ শতকের শেষে ও ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে সংকলিত প্রকীর্ণ সংস্কৃত-কবিতা-সংগ্রহ 'সদুক্তিকর্নামৃত' গ্রন্থে বঙ্গবাণীর যে প্রশস্তি শোনা গিয়েছিল—

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিম-সুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গাল-বাণী চ॥

(বঙ্গালস্য)[২] 'সদুক্তিকর্নামৃত'

ঘনরসময়ী, গভীর, বঙ্কিম-শোভন (বক্রোক্তি-শোভন) বহু কবির দ্বারা আশ্রিত (অনুশীলিত) গঙ্গায় এবং বঙ্গবাণীতে অবগাহন করিলেই পুণ্য।

১। নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত) ক্রোড়পত্রী, ৩, দ্রষ্টব্য।
২। 'সদুক্তিকর্ণামৃত', ৫ম প্রবাহ, ৩১ বীচি, ২য় শ্লোক।

এই প্রশস্তি পূর্ণতর ও সমৃদ্ধতর রূপ গ্রহণ করল উনবিংশ শতাব্দীতে। মাতৃভাষাপ্রীতি বাঙালীকে বাংলাদেশের ভাষা, সাহিত্যবিষয়ক গবেষণা ও সংগ্রহে উৎসাহ দিয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় যে সকল অনুশীলন এতকাল হয়েছে, মাতৃভাষায় তাদের প্রচার ও প্রকাশ করে সাধারণের জ্ঞানস্পৃহা ও কৌতূহল নিবৃত্ত করার প্রতিও মনোযোগ জাগল। প্রকৃতপক্ষে, মাতৃভাষার প্রতি শিক্ষিতমানসে শ্রদ্ধা ও মমতা আমাদের জাতীয় জাগরণের অন্যতম কারণ ও ফল। ইংরাজি শিক্ষিত তরুণরা যেমন ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় উৎসাহী হয়েছিলেন, তেমনি হয়েছিলেন দেশীয় সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাস চর্চায়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা এই প্রচেষ্টার অন্যতম নিদর্শন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় সর্বোচ্চস্তরে পঠন-পাঠনের অন্যতম কারণও এইখানে নিহিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন ও বাংলাদেশের পল্লীঅঞ্চলের লোকসাহিত্যের সংকলন[১] প্রকাশ মাতৃভাষা চর্চার এক একটি পথ খুলে দিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত ছাত্র সম্বর্ধনা সভায় 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন—

> "দেশের কাব্যে গানে ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য-পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে, প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা জানিবার জন্য, শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্য হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশ্বের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।"[২]

১। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬) এবং 'মৈমনসিংহগীতিকা' (১৯২৩) প্রকাশ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ', সংকলন, ১৯০৫, পৃঃ ১১

ছাত্র সম্প্রদায় এ কাজে ব্রতী হলে তবেই দেশের সাহিত্যকে অনুকরণের বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা এবং দেশের চিৎশক্তিকে দুর্বলতার অবসাদ থেকে উদ্ধার করে জগতের জ্ঞানীসভায় স্বদেশকে সমাদৃত করতে পারবে। স্বদেশপ্রেমের সংগঠনমূলক কর্মপ্রণালী এবং মাতৃভাষা অনুশীলনের এই উদার আহ্বান স্বদেশী গানেও ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়েছে। বর্তমান ভারতবর্ষের Linguistic Patriotism এর সূত্রপাতও এখানেই হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাতেই মাতৃভাষার বন্দনা এই সময় থেকেই রীতিতে পরিণত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের লেখা বিবরণ স্মরণীয়—

> ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে—"নাটোর গেলুম সবাই মিলে, প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স হবে। …সেখানে রবিকাকা প্রস্তাব করলেন, প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স বাংলা ভাষায় হবে—বুঝবে সবাই। আমরা ছোকরারা ছিলুম রবিকাকার দলে। …প্যাণ্ডেলে গেলুম, এখন যে'ই বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ায় আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠি, বাংলা, বাংলা। কাউকে আর মুখ খুলতে দিই না। ইংরেজিতে মুখ খুললেই 'বাংলা' 'বাংলা' বলে চেঁচাই। …যাক, আমাদের তো জয় জয়কার। বাংলা ভাষার প্রচলন হল কন্‌ফারেন্সে। সেই প্রথম আমরা বাংলা ভাষার জন্য লড়লুম।"[১]

মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নিবিড় সম্বন্ধ জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ লগ্ন থেকেই সূচিত হয়েছে। তবে কখনও তা ছিল প্রচ্ছন্ন, কখনও বা তা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করেছে। স্বদেশী গানের বিষয়ভিত্তিরূপে মাতৃভাষার প্রতি মমতা ও প্রীতি স্বদেশী যুগেই বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এযুগের স্বদেশসেবার কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে মাতৃভাষার চর্চাও অন্যতম কর্ত্তব্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে। সংগীতরচয়িতার লক্ষ্য হ'ল—

১। অবনীন্দ্রনাথ—পূঃ উঃ, পৃঃ ২২

"খুঁজিব সকলে মিলি বীণাপাণি সারদারে।"[১]

মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও আত্মীয়তার উপলব্ধি মাতৃভাষাকেও জননীমূর্তিরূপে কল্পনা করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের গানে শুনি—

"জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে
চাহি না অর্থ, চাহি না মান।
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি
অমল-কমল-চরণে স্থান।"

মাতৃভাষার প্রতি দেশবাসীর অবহেলায় ভাষাজননী 'বিষাদে মলিন'। তাঁর অবস্থা—'নয়ন জলে যাও ভেসে।'[২] বিজনকাননে পরিত্যক্তা, নিঃসঙ্গ মাতৃভাষারমনীর দুর্দশায় কবি ব্যথিত। মাতৃভাষা-প্রীতির চরম অভিব্যক্তি দেখি অতুলপ্রসাদের গানে,—

"মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা।
কি যাদু বাংলা গানে। গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা॥
ঐ ভাষাতেই নিতাই গোরা, আনল দেশে ভক্তি-ধারা,
আছে কৈ এমন ভাষা, এমন দুঃখ শ্রান্তি নাশা॥
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন,
ঐ ফুলেরই মধুর রসে বাঁধলো সুখে মধুর বাসা॥
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আনলো মালা জগৎ জিনে।
তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-আসা॥
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাক্‌নু মায়ে 'মা' 'মা' ব'লে;
ঐ ভাষাতেই বল্‌বো হরি, সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা॥"

১। গোবিন্দচন্দ্র দাসের—'এস হে ভারতবাসী প্রীতির কুসুম হারে'। (ক্রোড়পত্রী, ৩, দ্রষ্টব্য)

২। আনন্দচন্দ্র মিত্রের—'একাকী কাননে বসি, কে তুমি বল রমনি'। (ক্রোড়পত্রী, ৩, দ্রষ্টব্য)

বাঙালী কবি-গীতিকার মাতৃভাষার সৌন্দর্য মাধুর্য আবিষ্কার করে পরম গর্ব উপলব্ধি করেছেন। মাতৃভাষার অনুশীলন ও চর্চা তাঁদের কাছে স্বদেশসেবার নামান্তর। তাই জীবনের সর্বস্তরে, সর্বাবস্থায়ই দেশের ভাষার প্রতি তাঁদের সমান আকর্ষণ। তাঁদের সকলের হয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষাকে বাংলা জননীর মুখের বাণী হিসেবে দেখেছেন, এবং লিখেছেন—

"মা তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মতো।"

মাতৃভাষা বাংলার প্রতি বাঙালী সংগীতকারদের গভীর অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও মমতা তাঁদের স্বদেশানুরাগের পরিচায়ক। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ, ইংরাজী-ভাষা-সাহিত্যের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধার ঘোর কাটিয়ে উঠে দেশবাসী যে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে মাতৃভাষার চর্চায় আত্মনিয়োগই তার প্রমাণ। বাঙালীর বাংলা ভাষা-প্রীতিতে স্বদেশপ্রেম অভিব্যক্তি লাভ করেছে—সেদিক থেকেও এই ভাবের স্বদেশী গানের বিশেষ এক ভূমিকা রয়েছে।

দেশের 'বর্তমান চিন্তা' ধারার আর একটি বিষয় হ'ল ব্যক্তি-মহিমা কীর্তন। দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ দেশপ্রেমিকের আত্মত্যাগ, দুঃখস্বীকার ও কারাবরণ কবিদের অন্তরে আলোড়ন তুলেছে। তাই বাংলা স্বদেশী গানে ব্যক্তিপ্রশস্তি বা শহীদবন্দনা স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত, যদিও তাদের সংখ্যা কম। অবশ্য সবসময় এই প্রশস্তি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে তোলা সম্ভব হয়নি। বিদেশীশাসকের রাজরোষের ভয়েই হোক্ বা কবিমানসের সংযমের জন্যই হোক—অনেক ক্ষেত্রে তা তির্যকভাবে গানে অভিব্যক্ত হয়েছে।

কবিতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিবন্দনা অনেক বেশী প্রত্যক্ষ। যেমন, অরবিন্দের ব্যক্তিমহিমার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'নমস্কার' কবিতায়।

শহীদ বন্দনাবিষয়ক গান সংখ্যায় অল্প হলেও জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে এগুলি স্বদেশী গানের ধারায় আপন আসন লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। স্বদেশী যুগে দেশপ্রেমিক তরুণেরা অকাতরে 'ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান' গেয়েছেন। কখনও এককভাবে, কখনও সংঘবদ্ধভাবে এই তরুণেরা বিপদসঙ্কুল বিপ্লবের পথে যাত্রা করেছেন। মৃত্যুকে তাঁরা আলিঙ্গন করেছেন কখনও লোকচক্ষুর সামনে, কখনও অজ্ঞাতে। যে অগণিত তরুণ দেশসেবায় প্রাণ উৎসর্গ করেছিল, তাদের সকলের জন্য শহীদ বন্দনাগীতি রচিত হয়নি, একথা সত্য। কিন্তু বীরের এ রক্তস্রোতের মূল্য ধরার ধূলায় হারিয়ে যায়নি। দু' একটি কালজয়ী গানের মধ্য দিয়ে অগণিত শহীদের প্রতি শ্রদ্ধার প্রণতি জানিয়েছেন দেশের কবি। এমনি একটি প্রসঙ্গে, ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছিল একটি স্বদেশী গান।

"একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
(আমি) হাসি হাসি পরব ফাঁসী দেখবে ভারতবাসী।
কলের বোমা তৈরী করে
দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ধারে (মাগো)
বড়লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম
আর এক ইংলণ্ডবাসী।"

অজ্ঞাত কবি রচিত এই গানটি স্বদেশী গানের মধ্যে অতি জনপ্রিয় ও পরিচিত ছিল। আগরতলার সভাকবি মদনমোহন মিত্র রচিত একটি গানেও শহীদ ক্ষুদিরামের স্মৃতি তর্পণ করা হয়েছে।

"ও ভাই ক্ষুদিরাম। সকলকে ছেড়ে গেলি রে। ও ভাই ক্ষুদিরাম।
গেলি রে স্বর্গপুরে না জানি কতদূরে
ভবসিন্ধুর ওই পারে করিলি বিশ্রাম।
ক্ষুদি, তুই প্রাণ পেলি, যে-পথ দেখায়ে গেলি
সে পথ বিনে বাঙ্গালী পাবে না আরাম।
প্রফুল্ল সখার সনে, দেখা কি হয় সেখানে
পিতামাতার চরণে ঘটে কি প্রণাম ?

মানবের স্বাধীনতা যদি না থাকে সেথা,
তবে যে মানবের বৃথা, বৃথা স্বর্গধাম।
ও ভাই ক্ষুদিরাম।"

লাহোর জেলে অনশনকারী বন্দীদের মধ্যে যতীন দাসের মৃত্যু হয় (১৯২৯)। এই সংবাদ যেদিন রবীন্দ্রনাথ পেলেন, সেইদিন রাত্রেই তাঁর 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ' গানটি রচিত হয়। মৃত শহীদের নাম কোথাও উল্লিখিত না থাকলেও প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী গানটির উৎসমূলে যে শহীদবন্দনার উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছে, তা স্বীকার করা যায়। শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন—

"শেষ পর্যন্ত যতীন দাসের মৃত্যু হ'ল। সেই সংবাদ যখন শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছল, সেইদিন গুরুদেব মনে যে বেদনা পেয়েছিলেন, তা ভুলবার নয়। সন্ধ্যায় 'তপতী' অভিনয়ের মহড়া বন্ধ না রাখার কথা হ'ল। কিন্তু বার বার তিনি তাঁর পাঠের খেই হারাতে লাগলেন, বহুবার চেষ্টা করেও কিছুতেই ঠিক রাখতে পারছিলেন না, অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মহড়া বন্ধ করে দিলেন। সেই রাত্রেই লিখলেন 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ' গানটি।'[১]

এছাড়া বিপ্লবীদের দেশসেবার জন্য দুঃখবরণের, দুঃসহ ক্লেশ স্বীকারের অপরিসীম ক্ষমতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবের কথা কারুরই অজ্ঞাত নয়। কাজেই এই গানের 'মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ', 'দুঃখের মন্থনবেগে' অমৃতলাভ ইত্যাদি অংশ যে বিপ্লবী তরুণদের আপন আদর্শের জন্য আত্মাহুতিদানেরই প্রসঙ্গ, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

৫

স্বদেশের অতীত ও বর্তমান চিন্তার সঙ্গত পরিণতি হিসেবেই ভবিষ্যত চিন্তাও দেশপ্রেমিকের মনে জেগে উঠেছে। মাতৃভূমির

১। শান্তিদেব ঘোষ—পূঃ উঃ, পৃঃ ২০৪—২০৫

ঐশ্বর্যশালিনী মূর্তি আজ অতীতের স্মৃতি। তাঁর হৃতসর্বস্ব, অন্ধকার সমাচ্ছন্না বর্তমান মূর্তি তাঁর সন্তানের হৃদয়ে বেদনাবোধ জাগিয়ে তুলেছে। এই বেদনার গাঢ়কালিমা ভেদ করে কখনও কখনও ভবিষ্যতে মাতৃভূমির জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠার আশা জেগে ওঠে।[১] মাতৃভূমিকে নিয়ে স্বদেশপ্রেমিক সন্তানের ভবিষ্যত আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ঘটেছে দশভুজা দেবীমূর্তির প্রতিষ্ঠায়। 'মা যা হইবেন'—সর্বৈশ্বর্যময়ী, সর্বশক্তিময়ী মাতৃভূমিই দেশবাসী সন্তানের কাম্য। দেশের ভবিষ্যত সম্বন্ধীয় চিন্তাও বিচিত্র খাতে প্রবাহিত।

দেশপ্রেমিকের দৃঢ়বিশ্বাস, দেশের বর্তমান দুর্দশার অমানিশা কেটে গিয়ে নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার উদ্ঘাটিত হবার লগ্ন সমুপস্থিত। আনন্দচন্দ্র মিত্রের গানে এই আশা বিশ্বাসে পরিণত।

"পোহাইল দুঃখনিশি সুখসূর্য ঐ রে,
পথিক বলে থামিতেছে, দেখ রে মেলে নয়ন।"

মাতৃভূমির এই আনন্দপূর্ণ দিন কবে আসবে? এই সংশয়ের উত্তরও দিয়েছেন সংগীতকার—সংশয় ঘুচিয়ে, বুক বেঁধে দাঁড়িয়ে দেশবাসী একবার সম্মিলিত কণ্ঠে মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করলে—

"বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে,
দশদিক সুখে হাসিবে।" (রবীন্দ্রনাথ)

মাতৃভূমির দশভুজা প্রতিমা-দর্শনে উন্মুখ মহেন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে সত্যানন্দও অনুরূপ জবাব দিয়েছেন—

"যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।"

১। 'আনন্দমঠ'-এ (১ম। ১১শ পরিচ্ছেদে) সত্যানন্দ কর্তৃক মহেন্দ্রকে মাতৃভূমির তিন অবস্থার (তিন কালের) তিন দেবীমূর্তি প্রদর্শনের প্রসঙ্গটি স্মরণীয়।

দেশের এই উজ্জ্বল ভবিষ্যত নির্ভর করে দেশপ্রেমিকের আত্মত্যাগ, ঐক্যবোধ, দুঃখস্বীকারের শক্তি ও সাধনার নিষ্ঠার ওপর। ভারতবাসী যদি—

"একতায় বলী, জ্ঞানে গরীয়ান
আসিছে যেন গো তেজোমূর্তিমান,
অতীত সুদিনে আসিত যথা।"

ঐক্যবদ্ধ, জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী হয়, তবেই ভারতমাতার ঐশ্বর্যশালিনী মূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। কামিনী রায় এমনই এক মধুর স্বপ্নের আবেশে ভবিষ্যত আশার জাল রচনা করেছেন।

"তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা,
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে,
তবুও প্রাণের ঘুচেছে ব্যথা॥"

আবার কখনও কবির দৃঢ় ঘোষণা—

"ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

বাস্তব অভিজ্ঞতায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কামনা অসম্ভব, দুর্লভ তাকেই স্বপ্নে লাভ করে কবি তৃপ্ত। দেশের প্রতি গভীর মমতা, নিবিড় আকর্ষণ রয়েছে বলেই স্বদেশপ্রেমিক শুধু জাগরণে নয়, স্বপ্নেও দেশের উজ্জ্বল মূর্তি কামনা করে। এসকল গানের সহজ, সরল আবেদনের মধ্যেও কবিচিত্তের সুগভীর স্বদেশানুরাগের সুরের মূর্ছনা শোনা যায়।

তবে স্বদেশী গানে ভবিষ্যত চিন্তার ধারাটি অতীত ও বর্তমান চিন্তার ধারার সঙ্গে তুলনায় স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতোয়া। যেটুকু আছে তার থেকে দেখা যায় যে, দেশের ভবিষ্যত নিয়ে স্বদেশপ্রেমিক গীতিকারের কোনও সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নেই। দেশের অতীত গৌরবের স্মৃতিচারণার মধ্যে স্বদেশপ্রেমের ভাবরসসম্ভোগ করেছে মানুষ, বর্তমান চিন্তার ক্ষেত্রেও দেশ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কর্মসূচী তার সামনে ছিল—কিন্তু ভবিষ্যতের রূপ দেশবাসীর সামনে অনাগত

বলেই অস্পষ্ট। দেশের ভবিষ্যতের চেহারা কি হবে—তা নিয়ে স্বদেশভক্ত, আশাবাদী মানুষের কল্পনার অন্ত নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' থেকে এই কল্পনার সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু কোথাও আবেগহীন, দূরদৃষ্টির দ্বারা তার সম্ভাব্য পথনির্দেশ পাওয়া যায়নি। দেশের ভবিষ্যত মানুষের স্বরূপ কি হবে—দেশবাসী হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত হবে, না, সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উন্নীত হ'য়ে 'মানুষ' পরিচয় লাভ করবে, তাও গীতিকারের কল্পনায় অস্পষ্ট।

স্বদেশী গানের ভবিষ্যত-চিন্তা প্রসঙ্গটি এই কারণেই নিছক উচ্ছ্বাস মাত্র। ভারতবর্ষ ধর্মে, কর্মে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে, বিশ্বের দরবারে তার আসন প্রতিষ্ঠিত হবে—এ ধরণের মহান, সমুন্নত ভাবকল্পনা গানে অভিব্যক্ত হলেও তা অধিকাংশ গীতিকারের অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে গানে মূর্ছনা লাভ করেনি। তবে আসন্ন স্বাধীনতার, সর্বাঙ্গীণ জড়তা ও দীনতার থেকে মুক্তির, দীর্ঘ অমারাত্রির পরে বহু প্রত্যাশিত প্রভাতের স্বপ্ন স্বভাবতই আমাদের চিত্তকে আচ্ছন্ন করেছিল—সেই স্বপ্নের কথা শুনেছি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে—

"রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরি ভালে—
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাতীয় সঙ্গীত

১

যে দু'টি গান ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় গানের মর্যাদা পেয়েছে দু'টিরই রচয়িতা বাঙালী, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, এবং দু'টি গানই বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে জড়িত।

বন্দেমাতরম্ গানটি 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের ('বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকার ১৮৮১ সালের মার্চ সংখ্যায়) ১০ম পরিচ্ছেদে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পরিচ্ছেদের আরম্ভে আনন্দমঠের অন্যতম প্রধান সন্তান ভবানন্দের কণ্ঠে গীত হয় এই গান। গানের ভাষা সংস্কৃত ও বাংলা। একই গানে এই মিশ্রভাষা ব্যবহার কেন করা হয়েছে—এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। প্রমথনাথ বিশী মনে করেন—

> "দুই ভিন্ন সময়ে ভিন্ন উপলক্ষে সমগ্র গানটি রচিত হয়েছিল; মূল গানটি আনন্দমঠ রচনার আগে কোন সময়ে; বাংলা ছত্রগুলি আনন্দমঠ রচনাকালে উপন্যাসে বিবৃত আদর্শকে পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে সংযোজিত হয়ে থাকবে।"[১]

গানটি মাতৃভূমির বন্দনাগীতি, বিভিন্ন স্তবকে মাতৃভূমির শোভা, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্যের পরিচয় প্রকাশিত। গানটির প্রথম নয়টি পংক্তিতে দেশমাতৃকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণিত—পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত, ধনধান্যে পুষ্পেভরা এই জন্মভূমিই কবির কাছে সুখ ও বরপ্রদায়িনী দেবী।

১। প্রমথনাথ বিশী—পূঃ উঃ, পৃঃ ২৩৪

১০ম–১৬শ পংক্তিতে দেবীর শক্তি ও ক্ষমতার উল্লেখ করা হয়েছে। বহুশক্তি, অমিত বলের অধিকারিণী দেশজননী এই দেবী শত্রুমর্দনকারী। দেশমাতৃকার অস্তিত্বের উপলব্ধি মানুষের আপন সত্তার গভীরতম প্রদেশে। আত্মচেতনার সঙ্গে তার দেশাত্মবোধও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ১৬শ-২৩শ পংক্তিতে এই ভাব মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। ১৯শ–২৪শ পংক্তিতে দেশজননী দশভুজা দুর্গামূর্তিতে পরিকল্পিত হয়েছেন। সুজলা, সুফলা দেশই এখানে দশপ্রহরণ-ধারিণী দুর্গাতে রূপান্তরিত হয়েছে। ২৫শ–২৬শ পংক্তিতে সেই দুর্গাই কবির কাছে আবার শ্যামল, সরল, শান্তশ্রী ধরিত্রীরূপে উদ্ভাসিত।

বন্দেমাতরম্ গান রচনার কাল ও প্রেরণা সম্পর্কে নানা ধারণা প্রচলিত রয়েছে। কারুর মতে এটি 'আনন্দমঠ' উপন্যাস রচনার আগে রচিত, পরে উপন্যাসের কাহিনীতে সংযোগিত হয়েছে। "কেহ কেহ মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ডফিন সাহেব কর্তৃক অপমানিত হইয়া প্রতিহিংসাপরায়ণচিত্তে ইহা রচনা করিয়াছিলেন।"[১] গানটি রচনার উদ্দেশ্য যাই হোক—এই গান এবং সেই সঙ্গে 'আনন্দমঠ' উপন্যাস নিয়ে স্বদেশে ও বিদেশে যত আলোচনা হয়েছে, বঙ্কিমের অন্য কোন রচনা নিয়ে তা হয়নি।[২] গানটির বহুল প্রচারের ফলে এটি নিয়ে তর্কবিতর্কেরও অন্ত নেই। এই বিচারবিতর্ক প্রধানতঃ দু'টি বিষয়ে। প্রথমত এই গানটি রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে, দ্বিতীয়ত গানটির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য অনুসন্ধান নিয়ে।

১। ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, 'বঙ্কিমগ্রন্থাবলী', ১৯৫৭, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সং, ভূমিকা, পৃঃ ১

২। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 'আনন্দমঠ'-এর ইংরাজী অনুবাদ Abbey of Bliss প্রকাশ করেন। শ্রীঅরবিন্দ ইংরাজী গদ্য ও পদ্যে বন্দেমাতরম্ গানের অনুবাদ করেন। এছাড়া হিন্দী, উর্দু, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, কানাড়া ভাষাতেও 'আনন্দমঠ' অনুদিত হয়েছে। দেশীবিদেশী বিভিন্ন ভাষায় এই গানের তথা উপন্যাসের অনুবাদ গানটির দেশব্যাপী জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দেয়।

বন্দেমাতরম্ গানটি স্বতন্ত্রভাবে আগে রচিত হয়ে থাকলেও তা প্রথম প্রকাশ পায় 'বঙ্গদর্শন'-এর ১৮৮১, মার্চ সংখ্যায় (চৈত্র, ১২৮৭), আনন্দমঠের দশম পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে। সমগ্র উপন্যাসটি পরের বছর (১৮৮২) প্রকাশিত হয়। সেই সময় কিন্তু গানটি রচনার পেছনে কোন গূঢ় কারণ কেউ আবিষ্কার করেননি। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত সুরে এবং কবিকণ্ঠে উদ্বোধনী সঙ্গীতরূপে গীত হবার পর থেকেই গানটির প্রতি শিক্ষিত দেশবাসীর দৃষ্টি পড়ে এবং গানটি তখন থেকেই জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করে। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন—

> "The Indian National Congress gave it the status of a national song in 1896 when at its twelfth session held in Calcutta under the Presidentship of Rahimutullah Sayani Rabindranath Tagore sang it at the beginning of the first day's business. Rabindranath wrote the music of the song in the life-time of Bankim and that when he sang it to him he admired the tune."[১]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় এবং স্বদেশী যুগেই (১৯০৫-১৯১১) বন্দেমাতরম্ জনপ্রিয়তার শীর্ষশিখরে প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর বিদেশী শাসকের শাসননীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই কারণেই ইংরাজ শাসকগোষ্ঠী এই গানের মধ্যে ইংরাজবিদ্বেষের বীজ অনুসন্ধান করতে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে গানটির প্রচার ও প্রয়োগ যেভাবেই হোক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজবিদ্বেষ পোষণ করে গানটি রচনা করেননি। আনন্দমঠের মধ্যে ইংরেজবিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে

১। Das Gupta, R. K.—Vandemataram and 'The Indian National Struggle' *Bankim Chandra Chatterjee, Vande Mataram* University of Delhi, 1967, p. 16.

যেমন সত্য, তেমনই সত্য ইংরেজশাসনের প্রতি আস্থা। উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন' অংশে বলা হয়েছে—

"সমাজবিপ্লব অনেক সময়ই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাঙ্গলা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।"

বন্দেমাতরম্ গান রচনার পেছনে ইংরাজবিদ্বেষ বা অনুরূপ কোন রাজনৈতিক চিন্তার সন্ধান—যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করা যায় না। শাসকবিদ্বেষ প্রচারের জন্য বন্দেমাতরম্ রচিত হয়নি—এই ধারণার স্বপক্ষে আরও নানা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। 'আনন্দমঠ' প্রকাশের এক বছর পরে ইলবার্ট বিল আন্দোলন (১৮৮৩) এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাদণ্ড ও বিচারকালে বন্দেমাতরম্ গানের রাজনৈতিক প্রয়োগ হয়নি। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাকালেও এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবার উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তা রচনা করেননি। এমনকি পঁচিশ বছর পরে গানটি জাতীয় জীবনে ও জাতীয় আন্দোলনে যে এমন উন্মাদনা জাগাবে, তা হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাতীত ছিল। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের বক্তব্য স্মরণযোগ্য—

"...the poem made some impression on the Bengali mind within a few years of its composition is shown by the picture of Mother India by Harish Chandra Haldar published in Balak, a Bengali magazine edited by Jnanadanandini Devi, wife of Satyendranath Tagore in 1885. It is significant that the Mother in this picture is a goddess of abundance and not of wrath."[১]

স্বদেশী যুগের দেশপ্রেমিকদের আদর্শবাদ দ্বারা সঞ্জীবিত হ'য়ে মাতৃভূমির স্তোত্র বন্দেমাতরম্ গানটি জনগণচিত্ত আলোড়নকারী,

১। Das Gupta, R. K.—*op. cit.*, p. 19.

যুগান্তকারী জাতীয় সঙ্গীতে রূপান্তরিত হ'ল। ১৯০৭ সালে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন—

> "It was thirty-two years ago that Bankim wrote his great song and few listened ; but in a sudden moment of awakening from long delusions the people of Bengal looked round for the truth and in a fated moment somebody sang Bande Mataram."[১]

গানটির, জনমানসে প্রবল আলোড়নসৃষ্টির ক্ষমতা লক্ষ্য করে, বিদেশী শাসকগোষ্ঠী এটি রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের অর্থাৎ রাজদ্রোহের উদ্দেশ্যে রচিত বলে মনে করলেন। তার ফলে গানটির মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের আভাসব্যঞ্জক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ খুঁজেও পেলেন কেউ কেউ। এই কারণেই গানটির অর্থ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। 'Encyclopaedia Britannica'র একাদশ সংস্করণে রমেশ দত্ত যা লিখেছিলেন তা দীর্ঘ হলেও উদ্ধারযোগ্য—

> "As to the exact significance of this poem a considerable controversy has raged. Bande Mataram is the Sanskrit for 'Hail to thee, Mother !' or more literally 'I reverence thee Mother !' and according to Dr. G. A. Grierson it can have no other possible meaning than an invocation of one of the 'mother' goddesses of Hinduism, in his opinion Kali, 'the goddess of death and destruction'. Sir Henry Cotton, on the other hand, sees in it merely an invocation of the 'motherland' Bengal, and quotes in support of this view the free translation of the poem by the Late W. H. Lee, a proof which, it may be at once said, is far from convincing.

১। Sri Aurobindo—*Bankim-Tilak-Dayananda*, 1947, p. 13.

But though, as Dr. Grierson points out the idea of a 'motherland' is wholly alien to Hindu ideas, it is quite possible that Bankim Chandra may have assimilated it with his European culture, and the true explanation is probably that given by Mr. J. D. Anderson in 'The Times' of Sept. 24, 1906. He points out that in the 11th chapter of the 1st book of the Anandamath the Sannyasi rebels are represented as having erected, in addition to the image of Kali, 'the mother who has been', a white marble statue of 'the Mother that shall Be', which "is apparently a representation of the motherland. The Bande Mataram hymn is apparently addressed to both idols."

"The poem, then is the work of a Hindu idealist who personified Bengal under the form of a purified and spiritualised Kali. Of its thirty-six lines, partly written in Sanskrit, partly in Bengali, the greater member are harmless enough. But if the poet sings the praise of the 'Mother'

> "As Lachmi, bowered in her flower
> That in the water grows."

but also praises her as 'Durga bearing ten weapons' and lines 10, 11 and 12 are capable of very dangerous meanings in the mouth of unscrupulous agitators. Literally translated these run "She has seventy millions of throats to sing her praise, twice seventy millions of hands to fight for her, how then is Bengal powerless ?" As S. M. Mitra points out (Indian problems, London, 1908), this language is the

more significant as the 'Bande Mataram' in the novel was the hymn by singing which the Sannyasis gained strength when attacking the British forces.

During Bankim Chandra Chatterjee's lifetime the Bande Mataram, though its dangerous tendency was recognized, was not used as a party war-cry ; it was not raised, for instance, during the Ilbert Bill agitation, nor by the students who flocked round the court during the trial of Surendranath Banerjee in 1883. It has, however, obtained an evil notoriety in the agitations that followed the partition of Bengal. That Bankim Chandra himself foresaw or desired any such use of it is impossible to believe. According to S. M. Mitra, he composed it "in a fit of patriotic excitement after a good hearty dinner, which he always enjoyed. It was set to Hindu Music, known as the Mallar-Kawali-Tal. The extraordinarily stirring character of the air, and its ingenious assimilation of Bengali passages with Sanskrit, served to make it popular."

Circumstances have made the Bande Mataram the most famous and the most widespread in its effects of Bankim Chandra's literary works."[১]

এই আলোচনা থেকে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর কাছে বন্দেমাতরম্ গানটি কী তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তা বোঝা যায়, এবং গানটির ব্যাখ্যাও যে নানাবিধ হয়েছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন—

"গ্রীয়ারসন ও কটন দুজনেই ভুল করেছেন। গ্রীয়ারসনের ভুল

১। *Encyclopaedia Britannica*

পাদ্রীভাবাপন্ন। ...তাই গ্রীয়ারসনের চোখে 'মাদার' 'কালী' বই নন। কটনের চোখে মাদার হচ্ছে 'মাদারল্যাণ্ড বেঙ্গল'। এমন কথা গানে নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও ছিল না। মূল প্রবন্ধের লেখকও এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছেন, মা আর যাই হোন 'পারসোনিফায়েড বেঙ্গল' নন, ভারত হতে পারেন অবশ্য। এণ্ডারসন প্রকৃত অর্থের কাছাকাছি গিয়েছেন।"[১]

বন্দেমাতরম্ গানের দেবীমূর্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাবেই এসকল নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। দেশমাতৃকাই যে এই গানে পূজিত, 'কালী' বা 'বাংলাদেশ' ন'ন, তা বুঝতে হ'লে শুধু গানটিকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য রচনার সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করে দেখতে হ'বে।

বন্দেমাতরম্ গানটি রচনারও সাত বৎসর আগে ১২৮১/১৮৭৪ সালের কার্তিক সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' কমলাকান্তের দপ্তর, ১১শ সংখ্যায় 'আমার দুর্গোৎসব' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রথম জন্মভূমির মাতৃরূপদর্শন। এই পরিকল্পনারই পরিণতি বন্দেমাতরম্ গানে। কমলাকান্ত ও সত্যানন্দ—বঙ্কিম জীবনীকার লিখেছেন, "উভয়ের মন্ত্র এক, হৃদয় এক, প্রতিমা এক। একজন ডাকিতেছেন 'মা' 'মা' রবে ; আর একজন গাহিতেছেন 'বন্দেমাতরম্'। একজন ভক্তের প্রতিমা—"রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক্—দশদিকে প্রসারিত ; তাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত।" আর একজন ভক্তের প্রতিমাও তাই—"দশভুজ দশদিকে প্রসারিত ;—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত।" একজন বলিতেছেন,

১। প্রমথনাথ বিশী—পূঃ উঃ, পৃঃ ২৪৩

"এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা" আর একজন গাহিতেছেন,

"সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরং।"

একজন যে হৃদয় লইয়া গাহিতেছেন, 'জয় জয় ভক্তি শক্তি দায়িকে', আর একজনের হৃদয়েও সেই সুরই প্রতিধ্বনিত হইয়া শব্দতরঙ্গ উঠিতেছে—

"বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি॥"

তাই বলিতেছিলাম, উভয়ের—কমলাকান্ত ও সত্যানন্দের—মন্ত্র এক, হৃদয় এক, প্রতিমা এক।"[১]

দেশকে মাতৃমূর্তিতে প্রতিষ্ঠা করে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় চিন্তাধারায় একটি নূতন সূত্র সংযোজন করলেন। "এতে মৃন্ময়ী শুধু যে চিন্ময়ী হ'ল তা নয়, চিন্ময়ী একটি স্বভাব লাভ করলো।"[২] শাস্ত্রাদিতে কোথাও কোথাও বসুন্ধরাকে দেবীরূপে কল্পনা করা হয়েছে বা দেশকে আলংকারিকভাবে জননী সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু সে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, বিশেষ এমন সার্বজনীনরূপে তা মানুষের মনকে অধিকার করেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনবত্ব এই যে তিনি নূতন মন্দিরে, নূতন প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করলেন। "সে মন্দির আনন্দমঠ, সে প্রতিমা দেশমাতৃকা। আনন্দমঠ দেশ, সেই দেশের মাটিতে দেশরূপা দেবীমূর্তির প্রতিষ্ঠা।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কল্পনা ও আদর্শেরই পুনরাবৃত্তি দেখি রবীন্দ্রনাথে। ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটিও প্রথমে ব্রহ্মসঙ্গীত পর্যায়ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের

১। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'বঙ্কিমজীবনী', ১৯৩১ (৩য় সং), পৃঃ ৪৯৪
২। প্রমথনাথ বিশী—পূঃ উঃ, পৃঃ ২৩৭—২৪০

চোখে ভারতভাগ্যবিধাতা আর বিশ্ববিধাতায় ভেদ নেই। দেশের মাটিতেই তিনি 'বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা' দেখেছেন।

জন্মভূমিতে দেবীত্ব ও বিশ্বদেবীত্ব আরোপ করা একজন হিন্দুর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। তাই বন্দেমাতরম্ গানের দেবী বা মাতৃমূর্তি নিয়ে যখন প্রচণ্ড বাদ-বিবাদ চলেছে, তখন বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন—

> "...the central conception of the *Anandamath* is to interpret Kali and her different manifestations and forms, such as Jagaddhatri, Durga, Bhavani, etc., as symbolic of the motherland/Nation-spirit."[১]

এই বিশ্বাসেরই অনুরূপ দেখি সুভাষচন্দ্র বসুর চিন্তা। ১৯২৫ সালে বিভাবতী বসুকে (মেজবৌদি) লিখিত তাঁর একটি চিঠিতে দুর্গাপূজার উল্লেখের মধ্যেও 'দেবী-স্বদেশ-বিশ্বজননী'—এই ধারণা অভিব্যক্ত হয়েছে। তিনি লিখেছেন—

> "দুর্গামূর্তির মধ্যে আমরা মা-স্বদেশ-বিশ্ব সমস্তই পাই। তিনি একাধারে জননী, জন্মভূমি ও বিশ্বময়ী।"[২]

বন্দেমাতরম্ গানের মধ্যে দেশপ্রেম ও ঈশ্বরভক্তির যুক্তবেণী রচনা হয়েছে। এই গানের প্রেরণাতে উদ্বোধিত বিপ্লববাদীরা পরবর্তীকালে স্বদেশী ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যুক্ত করেছেন। Lord Ronaldshay তাঁর *The Heart of Aryavarta* গ্রন্থে ভারতীয় বিপ্লবের মানসিকতা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে জাতীয় আন্দোলনে 'আনন্দমঠ' ও বন্দেমাতরম্ এর গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> "... the cry 'Bande Mataram'...gave it a religio-patriotic sanction. "This new nationalism which

১। Pal, Bipin Chandra—*Swadeshi and Swaraj*, 1954. p. 293.

২। সুভাষচন্দ্র বসু—পত্রাবলী, ১৯৬৮, পৃঃ ২০৯

> Bande Mataram reveals", said Mr. B. C. Pal, "is not a mere civic or economic or political ideal. It is a religion."[১]

বন্দেমাতরম্ গানের এই আধ্যাত্মিকতা কিন্তু রচনাকালের বিচার বিতর্কের বিষয় ছিল না। অর্থাৎ গানটির প্রথম প্রকাশ কালে যে প্রশ্ন জেগেছিল, তা এই মাতা বা দেবীর স্বরূপ নিয়ে। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন—

> "When 'Vandemataram' became the most popular patriotic song in Bengal during the Swadeshi Movement (1905-11) the devout Hindu could chant all its thirty-six lines as hymn without a theological qualm."[২]

বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলনকে যাঁরা 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ' বলে চিহ্নিত করেছেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের সেই অংশ আবার এই গানের মধ্যে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা অভিব্যক্ত হতে দেখে এই আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চেয়েছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু লোক স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং বন্দেমাতরম্ গানও গেয়েছিলেন। কিন্তু নানা রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাবে পরে মুসলমান সমাজের চিন্তাধারাও পরিবর্তিত হয়েছে। মুসলিম লীগের শাসনকালে মুসলমান সমাজ বঙ্কিমচন্দ্রকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে চিহ্নিত ও নিন্দা করেছেন। তাঁদের মতে বন্দেমাতরম্ গানে শুধু হিন্দুদেবী-মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এতে মুসলমান বিদ্বেষও প্রকাশ পেয়েছে।

বন্দেমাতরম্ গানকে আনন্দমঠের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করে এবং আনন্দমঠের কাহিনীকে শুধু বাইরের ঘটনা দিয়েই বিচার করেছেন তাঁরা। কাহিনীর মর্মমূলে যে গূঢ় তাৎপর্যটুকু আছে—শাসক-শাসিতের সংগ্রাম, শাসিতের স্বদেশ-প্রীতি—তা তাঁদের দৃষ্টিতে

১। Ronaldshay, Lord—*The Heart of Aryavarta*, London, 1925. p. 104.

২। Das Gupta, R. K.—*op. cit.*, p. 20

পড়েনি। বঙ্কিমের আনন্দমঠকে Ronaldshay বলেছেন—'A parable of patriotism' অথচ এই আনন্দমঠ-এর বিরুদ্ধেই মুসলমান সমাজ মুসলমান-বিদ্বেষের অভিযোগ করলেন। স্বদেশী যুগে যে বন্দেমাতরম্ গান ছিল জাতির জাগরনী বাণী, আনন্দমঠ ছিল গীতাস্বরূপ, হঠাৎ মুসলিমলীগের শাসনকালে সেই গান ও গ্রন্থের প্রতি এত বিদ্বেষ মুসলমান সমাজে জেগে উঠল কি করে? অনুমান করা যায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এক অনুদার মনোভাবেরই ফলে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছিল। এই ভ্রান্ত ধারণার চরম প্রকাশ ঘটেছে "লীগপন্থী মুসলমানদের মহতী সভায় (১৯৩৮) আনন্দমঠের বহ্নুৎসবে।"[১] বন্দেমাতরম্ ইসলাম-বিরোধী এই বিশ্বাসে তাঁরা গানটি পরিত্যাগ করার সংকল্প করেন।

বন্দেমাতরম্ গানটি নিয়ে সম্ভাব্য অভিযোগ দুরকম হ'তে পারে। এক, গানটি ইসলাম-বিরোধী (একেশ্বরবাদ-বিরোধী); দুই, গানটিতে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার আদর্শ প্রচারিত। অভিযোগ দু'টিকে বিচার করলে দেখি, গানের প্রথম দুই কলিতে একেশ্বরবাদ-বিরোধী কোনও শব্দ নেই। তা শুধুই দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা। দেশকে মাতৃসম্বোধনও মুসলমান সমাজে অপ্রচলিত নয়। আরবী ও ফার্সী ভাষার বহু মুসলমান কবি ও লেখকের রচনায় তার নিদর্শন পাওয়া যায়। কাজেই বন্দেমাতরম্ গানের মাতৃসম্বোধনে ইসলাম-বিরোধিতা নেই। বাকী পংক্তিতেও ইসলাম-বিরোধিতা অথবা পৌত্তলিকতার স্তুতি নেই। 'ত্বং হি দুর্গা' ইত্যাদি দ্বারা যে দুর্গা, লক্ষ্মী বা সরস্বতীর পূজা করা হয়নি, বরং দেশমাতৃকারই বন্দনা করা হয়েছে, আনন্দমঠের মহেন্দ্রের আচরণেই তা পরিস্ফুট।

"মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না—সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা মাতা কে,—জিজ্ঞাসা করিল, 'মাতা কে'?"

১। রেজাউল করীম—বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, ১৯৫৪, পৃঃ ৭১

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন—

"শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

মহেন্দ্র বলিল, "এ ত দেশ, এ ত মা নয়।" সাধারণ হিন্দুর জ্ঞান, বিশ্বাস ও সংস্কার অনুযায়ীই মহেন্দ্র এই উক্তি করেছে। তার উত্তরে—ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা জানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা—" দেশমাতৃকা দেবী অপেক্ষাও বড়—এটিই এই অংশের মূল বক্তব্য।

২

সম্প্রদায়বিশেষের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এটিই প্রথম সর্বভারতীয় জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করেছিল। এর আবেদন শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে সাড়া জাগিয়েছিল। এই গানটি থেকেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান অঙ্গ হিসেবে গৃহীত হ'ল। বঙ্গভঙ্গ আদেশের প্রতিবাদে ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট কলকাতার টাউন হলের জনসভায় 'বিদেশী পণ্য বর্জন' ও স্বদেশীমন্ত্র ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সহস্রকণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উত্থিত হয়। "Bande Mataram became from this fated moment a mighty battle-cry of a subject nation.[১] জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত দেশপ্রেমিক তরুণদের একদল 'বন্দেমাতরম্' সম্প্রদায় গড়ে তুললেন ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে। শহরে ঘুরে ঘুরে বন্দেমাতরম্ গান করা, অর্থ সংগ্রহ করা—ইত্যাদির দ্বারা তাঁরা দেশবাসীর মধ্যে

১। Mukherjee, Haridas & Mukherjee Uma (a)—*Bande Mataram and Indian Nationalism*, 1957, p. 14.

১০

উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে বন্দেমাতরম্ গান, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি, বন্দেমাতরম্ শোভাযাত্রা[১] অবশ্য পালনীয় ছিল। James Campbell Ker-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে (১৯০৭-১৯১৭) এযুগে রাস্তায় শ্বেতাঙ্গদের দেখলেও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়া হ'ত। এভাবে বন্দেমাতরম্ গান ও ধ্বনি ক্রমশই বিপ্লববাদের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে উঠেছিল।

> "The greeting 'Bande Mataram' became the war-cry of the extremist party in Bengal ; ... The Bande Mataram song was also very frequently sung at political gatherings. It was of course invariably representated by the Bengali nationalist press that the cry of 'Bande Mataram', as it meant nothing more than 'Hail ! Mother', must be perfectly harmless ; but although the words are harmless enough they were used as an outward sign of sympathy with revolution and defiance of Government."[২]

স্বদেশী আন্দোলনের অগ্রগতিতে চরমপন্থীরা তাঁদের ভাবাদর্শ গড়ে তুললেন বন্দেমাতরম্‌কে ভিত্তি করে। অরবিন্দের বন্দেমাতরম্ পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনায় জাতীয়তাবোধের ক্ষেত্রে তাঁর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। অরবিন্দের 'ভবানীমন্দির'-এর ভবানীও বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্-এর প্রভাবে কল্পিত। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে বন্দেমাতরম্ পত্রিকা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে চরমনীতির প্রচার করে। আবেদন-নিবেদন নয়, প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে—বন্দেমাতরম্-এর এই আদর্শের বিরুদ্ধে ১৯০৮ সালে Press Act-এর সংশোধন করে

১। The Bengalee পত্রিকায় 1906, 23rd May-তে বরিশালের বন্দেমাতরম্ শোভাযাত্রার উল্লেখ আছে।

২। Ker, James Campbell—*Political Trouble in India* (1907-17), 1917, pp. 32-33.

শাসকগোষ্ঠী আরও দৃঢ়হস্তে জাতীয়তার কণ্ঠরোধ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু শাসকের এই বাঁধন যতই শক্ত হ'ল, বাঁধন ছিন্ন করার সাধনাও ততই উগ্র হয়ে ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রবল থেকে প্রবলতর হ'ল। কার লিখেছেন—

"Soon after that date the paper and press was suppressed (29th Oct. 1908) and though the voice of Bande Mataram was silenced, its spirit could not be killed. The vision of the Mother had already been caught and "a great nation which has had that vision can never again bent its neck in subjection to the yoke of a conqueror."

স্বদেশী যুগে একদিকে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে উদ্বোধিত দেশবাসী, অন্যদিকে শাসকগোষ্ঠী এই ধ্বনিতে শঙ্কিত ভীত। তাই ভারতবাসীকে দমনের কঠোরতম ব্যবস্থায় বদ্ধপরিকর তাঁরা। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি কলকাতায় প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল—কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তা পূর্ববাংলার বরিশাল, ঢাকা, মৈমনসিংহ, রংপুর, নোয়াখালি প্রভৃতি জেলার ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করল।

"The East Bengal authorities developed a special dislike for the two simple words, viz., Bande Mataram. It was taken as something sounding the death-knell to British Imperialism in India. Every possible measure was adopted to stop the shouting of Bande Mataram."[১]

বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রদের উপর নানারকম শাস্তি বিধান করা হ'ল। অর্থদণ্ড, বহিষ্কার[২] এমনকি, কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের

১। Ghosh, Kali Charan—*The Roll of Honour*, 1965, p. 83.

২। কালীচরণ ঘোষ—পূঃ উঃ, পৃঃ ৮৩-৮৪ সভা-সমিতি নিষিদ্ধ ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ নিষিদ্ধ করে ঢাকার চীফ সেক্রেটারী আদেশ জারী করেন, ১১ই নভেম্বর, ১৯০৫।

উপর আদেশ হয় (১৮ই জানুয়ারী, ১৯০৬),

> " ... to call upon boys of the first and second classes to copy out five hundred times : "It is foolish and rude to waste time in shouting Bande Mataram and forward the manuscripts, all of which be neatly written with a certificate that each is the unaided work of the boy whose writing it purports to be" to the ... Inspector."[১]

কিন্তু এত কঠোর দণ্ডবিধান সত্ত্বেও বন্দেমাতরম্ দেশবাসীর স্বদেশ-পূজার মন্ত্ররূপে গৃহীত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গের অল্পকাল পরেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ও ছাত্রদের পক্ষে সভা-সমিতিতে যোগদান নিষিদ্ধ করে এক 'সার্কুলার' জারি হয়। কলকাতায় এর প্রতিবাদে 'এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি' স্থাপিত হয়। এই সমিতির সভ্যগণ কলকাতার পথে পথে এই 'সার্কুলার'-এর আদেশ অমান্য করে শোভাযাত্রা বের করেন। এই উপলক্ষে অনেক নূতন গানও রচিত হয়। কান্তকবি তাঁর একটি গানে লিখলেন,—

"ফুলার কল্লে হুকুম জারি,
মা ব'লে যে ডাকবে রে তার শাস্তি হবে ভারি।
মা ব'লে ভাই ডাকলে মাকে ধরবে টিপে গলা ?
তবে কি ভাই বাঙ্গলা হ'তে উঠবে রে মা বলা ?
... ...
বন্দেমাতরম্ ত শুধু মায়ের বন্দনাই,
এতে তো ভাই সিডিসনের নাম কি গন্ধ নাই ;
তবে কেন তা নিয়ে ভাই এত মারামারি ?
হাজার মার, মা বলা ভাই কেমন করে ছাড়ি ?"[২]

শাসকগোষ্ঠীর শাসন ও দমননীতি দিয়ে ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও বাঙালীর দৃঢ়পণ—"মার দিয়ে কি মা ভোলাবে ?" ১৯০৬ সালে

১। *Ibid.*, p. 84.

২। দীপ্তি ত্রিপাঠী সম্পাদিত, পূঃ উঃ, পৃঃ ৬২-৬৩

বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে নিরস্ত্র, নিরুপদ্রব জনতার ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার করে ইংরেজশাসক। বরিশালবাসীর অপরাধ ছিল—ফুলারের নির্দ্দেশমত 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি মুখে উচ্চারণ না করে, এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির সদস্যরা বন্দেমাতরম্ ব্যাজ ধারণ করে শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভাযাত্রা করে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এই ঘটনাকে লক্ষ্য করে গান লিখলেন—

"আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হ'লো লাঠির ঘায়
ঐ যে মায়ের জয় গেয়ে যায়।। (বন্দেমাতরম্ বলে)
রক্ত বইছে শতধার, নাই'কো শক্তি চলিবার
এরা মার খেয়ে কেউ মা ভোলে না সহে অত্যাচার,
এত পড়েছে লাঠি, ঝরছে রুধির,
তবু হাত তোলে না কারো গায়।"[১]

বরিশালের এই ঘটনা শুধু পূর্ববাংলা বা বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেই আলোড়ন এনেছিল। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি এবং গানের জনপ্রিয়তা উত্তাল তরঙ্গের মত সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। পাঞ্জাবের 'ট্রিবিউন' পত্রিকাতে (২৫শে নভেম্বর, ১৯০৫) পূর্ববাংলায় বন্দেমাতরম্-এর প্রেরণায় আত্মবলিদানের প্রশস্তি করে বলা হ'ল—

"And can Bande Mataram be abolished by help of terrorism? .. How many soldiers the authorities must have to stop the mouths of countless millions of India? The people of East Bengal have sympathy of all India."[২]

বন্দেমাতরম্ ধ্বনি নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর নিষ্ঠুরতার আর এক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বন্দেমাতরম্ পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলার সময়। বিপিনচন্দ্র পাল অরবিন্দের বিপক্ষে সাক্ষ্যদানে অস্বীকার করেছিলেন।

১। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। উপেন্দ্রনাথ দাস সম্পাদিত, জাতীয় সঙ্গীত, পৃঃ উঃ, পৃঃ ৪২

২। Ghosh, Kalicharan—*op. cit.*, p. 85এ উদ্ধৃত।

১৯০৭ সালের ২৬শে আগষ্ট কিংসফোর্ডের এজলাসে বিচারের সময় লালবাজারে অসংখ্য মানুষের ভীড়, উত্তেজনা—তারমধ্যে জনতা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ জনতার ওপর আক্রমণ চালায়। ১৫ বছরের একটি ছেলে, সুশীল, পুলিশের মার খেয়ে পুলিশকেও মারে। বিচারের পর সুশীলকে ১৫ ঘা বেত মারার আদেশ দেওয়া হয়—ভব্যতা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে। জেলে বেতের ঘা খেয়েও সুশীল অবিচলিত ছিল। সেইসময় আরও অসংখ্য কারারুদ্ধ তরুণ নীরবে শাস্তি বহন করে সকলের বিস্ময় ও প্রশংসা অর্জন করেছিল।

> "... everyone of them displayed such unprecedented moral courage that it called forth universal admiration and struck terror into the hearts of the bureaucracy."[১]

১৯০৭ সালের ১৮শে আগষ্ট কলেজ স্কোয়ারে তাকে সম্বর্ধনা জানাবার উদ্দেশ্যে এক জনসভার আয়োজন হয়। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সুশীলের এই বলিষ্ঠ আচরণে ও সহিষ্ণুতায় মুগ্ধ হয়ে তার জন্য এক সোনার পদক উপহার পাঠান। সভার শেষে তাকে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়ে নিয়ে এক শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী মানুষের মুখে ছিল বাউলসুরে গাওয়া এই গান—

"মাগো, যায় যাবে জীবন চলে
জগত মাঝে তোমার কাজে বন্দেমাতরম্ বলে।
বেত মেরে কি মা ভোলাবে, আমরা কি মার সেই ছেলে ?"

(কালীপ্রসন্ন)

বঙ্কিমের কাছে যা ছিল ভাবকল্পনা, স্বদেশী যুগে তাই প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় পর্য্যবসিত হ'ল। আনন্দমঠের মুখবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র

১। Ghosh, Kalicharan,—*op. cit.*, p. 157.

বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ সমর্থন করেননি, অথচ পরবর্তীকালে বিপ্লবীদের ওপর এই গ্রন্থটির প্রভাব ছিল অপরিসীম। রোনাল্ড্‌শে লিখেছেন,

> "It was a curious irony of fate, surely, that it should have been upon this very book that the revolutionaries should have drawn so deeply for inspiration."[১]

বিপ্লবীদের প্রিয়গ্রন্থের অনুসন্ধান পাওয়া যায় নানা পুলিশী তদন্তের পর। ঢাকার অনুশীলন সমিতির পাঠাগারের Issue Register-এর তথ্য অনুযায়ী বিপ্লবীদের মধ্যে বহু পঠিত স্বল্পসংখ্যক বইয়ের মধ্যে 'আনন্দমঠ' অন্যতম।[২] আনন্দমঠের কাহিনী বিপ্লবীদের অনুরূপ পরিস্থিতিতে দেশপ্রেমিকের কি আদর্শ হওয়া উচিত, তা দেখিয়েছে। রোনাল্ড্‌শে লিখেছেন—

> "Bande Mataram! the battle cry of the children, became the war-cry not only of the revolutionary societies, but of the whole of nationalist Bengal, which differed from the societies in method only, and not in aim."[৩]

আনন্দমঠ ও বন্দেমাতরম্‌-এর প্রভাবে বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতিতে কালীমূর্তির সামনে দীক্ষাগ্রহণ, সত্যানন্দের অনুরূপ দীক্ষার শপথ বাক্য উচ্চারণ, আনন্দমঠের সন্তানদের নাম গ্রহণ—ইত্যাদির প্রচলন হয়েছিল, এমন উল্লেখ পাওয়া যায়।

১। Ronaldshay,—*op. cit.*, p. 106.

২। Ker, James Campbell—*op. cit.*, Chap. III 'The Literature of the Revolution'.

৩। Ronaldshay—*op. cit.*, p. 114.

১৫২

বন্দে মাতরম্

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার-

সংকলিত।

সিটি বুক সোসাইটী

৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

১৩১২

মূল্য ।০ আনা।

৩

বন্দেমাতরম্ শব্দটি নানাভাবে বাঙালীর মনকে আকর্ষিত করেছিল। স্বদেশীভাবোদ্দীপক সংগীত-সংগ্রহ গ্রন্থের মধ্যে বন্দেমাতরম্[১] সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এক বছরের মধ্যে তার পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থের শিরোনাম গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হওয়া অসম্ভব নয়, কেননা, অনুরূপ গানের অন্য কোন সংগ্রহ এত সমাদৃত হয়নি। বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ কর্তৃক ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত, পরে অরবিন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত বন্দেমাতরম্ পত্রিকাকে অবলম্বন করে ভারতবাসীর স্বাদেশিকতা এক নূতন পথে অগ্রসর হয়েছে।

বন্দেমাতরম্-এর প্রভাব যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে (স্বদেশী আন্দোলনের স্লোগান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে) দেখা গিয়েছে, তেমনি সাহিত্য রচনার বিভিন্ন ধারায়ও তার প্রভাব সুস্পষ্ট। নাটক রচনায় দেশের মূর্তিকল্পনা—অতি পরিচিত ব্যাপার হয়ে উঠল। বন্দেমাতরম্ গান অবলম্বনে দেশাত্মবোধক কবিতা রচনার অনুপ্রেরণাও সেযুগের কবিরা লাভ করেছিলেন।

> "... a few lines from that song were incorporated in the concluding portions of Hemchandra's 'Rakhi-Bandhan', a Bengali poem composed in 1886 at the time of the Calcutta session of the Congress. ... For the first time that song was sung on the Congress platform in 1896 by a poet no less than Rabindranath Tagore."[২]

স্বদেশী যুগে অসংখ্য নাটক বা গীতিনাটিকায় ভারতের দেবীমূর্তি কল্পিত হয়েছে। স্বদেশী গানে বন্দেমাতরম্ গানের ভাবপ্রেরণা, ভাষা, গানটির চরণবিশেষ নানাভাবে ঝংকার তুলেছে।

১। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, পূঃ উঃ, ১৯০৫

২। Mukherjee, Haridas & Mukherjee, Uma—*op. cit.*, p. 11.

বন্দে মাতরম্

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার-

সংকলিত।

পঞ্চম সংস্করণ

সিটী বুক সোসাইটী

৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

১৯০৬

মূল্য ।৵০ আনা। কাপড়ে বাঁধা ॥৵০ আনা।

এই প্রসঙ্গে কয়েকজন স্বদেশী গান রচয়িতার কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। রজনীকান্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সরলাদেবী, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ গীতিকার ও কবিদের নানা রচনার উৎসমূলে রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ গান। রজনীকান্তের 'ভারতভূমি' শীর্ষক গানটির—

"শ্যামল-শস্য-ভরা।
চিরশান্তি-বিরাজিত, পুণ্যময়ী ;
ফল-ফুল পূরিত, নিত্য সুশোভিত,
যমুনা-সরস্বতী-গঙ্গা-বিরাজিত।"

অথবা তাঁর আর একটি গানের—

"জয় জয় জনমভূমি, জননি।
যাঁর, স্তন্য সুধাময় শোণিত ধমনী ;
... ...
শ্যামল-শস্য পুষ্প-ফল পূরিত,
সকল-দেশ-জয়-মুকুটমণি।
... ...
জননী-তুল্য তব কে মর-জগতে ?
কোটীকণ্ঠে কহ, "জয় মা ! বরদে !"

অংশগুলি স্বভাবতঃই বন্দেমাতরম্ গানের—

"সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং
মাতরম্।
... ...
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

পংক্তিগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সরলা দেবীচৌধুরানীর

অতি পরিচিত—'বন্দি তোমায় ভারত-জননি, বিদ্যামুকুট-ধারিণি' গানটিতে—

"এসেছে বিদ্যা আসিবে ঋদ্ধি
শৌর্য্য-বীর্যশালিনি।
আবার তোমায় দেখিব জননি
সুখে দশদিক-পালিনী।
অপমান-ক্ষত জুড়াইবি মাতঃ
খর্পর-করবালিনি! শৌর্যবীর্যশালিনি।"

পংক্তি কয়টিতে বন্দেমাতরম্ গানের কোন কোন শব্দ ও পংক্তির ভাবমূর্ছনা শোনা যায়। সরলাদেবীর গানটি তার তেজোদ্দীপ্ত দৃপ্ত ভঙ্গীর জন্য 'বন্দেমাতরম্'-এর কাছে ঋণী।

হিন্দুমেলা যুগের গানের সংকোচ, সংশয়—
"লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি করে"—
কাটিয়ে দেশপ্রেমকে এক বলিষ্ঠ আদর্শবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার এই শক্তি বন্দেমাতরম্ গানই দিয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানে 'ত্রিংশকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে, আমার দেশ'—বন্দেমাতরম্ গানের সপ্তকোটি সন্তানের কলকণ্ঠের ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশস্তুতির সার্থক প্রকাশ দেখি 'ভারতবর্ষ' শীর্ষক গানে।

"যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি। ভারতবর্ষ।
... ...
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনি। জগজ্জননি। ভারতবর্ষ।"

ভারতমাতার এই 'জগত্তারিণী' 'জগদ্ধাত্রী' রূপকল্পনার উৎস বন্দেমাতরম্ গানের—

'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদল বিহারিণী' দেবীমূর্তি।

রবীন্দ্রনাথের একটি গানে দেশমাতৃকার দেবীমূর্তি অপরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'সোনার মন্দিরে' প্রতিষ্ঠিত এই দেবীর নামোল্লেখ কবি করেননি, কিন্তু তা জগদ্ধাত্রীমূর্তিরই অনুরূপ।

"ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ।।
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শংকাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট নেত্র আগুন বরণ ।।"

এই মাতৃমূর্তিরই লৌকিক রূপান্তর দেখি বাউল সুরে গীত 'সোনার বাংলা' গানে। দেশমাতৃকা তাঁর প্রাকৃতিক সম্পদের ও সৌন্দর্যের পসরা মেলে ধরেছেন তাঁর সন্তানের জন্য। দেশমাতৃকার স্নেহ-কোমল হৃদয়ের পরিচয়ই এখানে প্রধান—শক্তির নয়। বন্দেমাতরম্ গানের প্রথম নয়টি চরণেও দেশমাতৃকার শান্ত, স্নিগ্ধ, কোমল মূর্তি চিত্রিত।

স্বদেশী গান রচনার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি স্বদেশী আন্দোলনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত স্বদেশী গানেও বন্দেমাতরম্ প্রভাব বিস্তার করেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় 'এ্যান্টিপার্টিশন প্রোসেশন পার্টি' রচিত কয়েকটি গানে বন্দেমাতরম্ স্বদেশবাসীকে নৈতিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্ররূপে গৃহীত হয়েছে। তাই দেখি একটি গানে ভারতবাসীকে সচেতন করা হচ্ছে বন্দেমাতরম্ গান দিয়ে—

"জাগ ভারতবাসি গাও বন্দেমাতরম্
আজ কোটি কণ্ঠে কোটি স্বরে
উঠুক বেজে মাতরম্
(বন্দেমাতরম্ বলে রে কোটি কণ্ঠে)...[১]

এই সমিতির আর একটি গানে 'বন্দেমাতরম্'-এর অপূর্ব

১। উপেন্দ্রনাথ দাস—পূঃ উঃ, পৃঃ ১৩-১৪

উন্মাদনাকারী শক্তির উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

"কানে কানে প্রাণে প্রাণে
মায়ের নাম আজ কে শুনাল
সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে আট কোটী
প্রাণ কে মাতাল।
বন্দেমাতরম্ মাতরম্ উঠছে ধ্বনি কি মধুরম্
মরতের জয়ধ্বনি স্বর্গের আসন কাঁপাইল।
... ...
মরা প্রাণে ধরে আগুন প্রাণ পেয়ে প্রাণ জ্বল্‌ছে দ্বিগুণ
যা ভাবি নাই, যা শুনি নাই
সে আগুন আজ কে জ্বালাইল।"[১]

জাতীয় উন্নতি লাভে স্থিরসংকল্প বাঙালী, জাতিধর্মভেদ ভুলে 'বন্দেমাতরম্'—এই মাতৃমন্ত্রে উদ্দীপিত হ'য়ে উঠেছে।

"হিন্দু মুসলমান সাজ্‌রে সাজ
স্বদেশী সংগ্রাম চাহে আত্মদান
বন্দেমাতরম্ গাওরে ভাই।"[২]

রবীন্দ্রনাথ রচিত (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম নাটকের সৈন্যদের মুখে গীত) 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানের 'বন্দেমাতরম্'—মন্ত্ররূপে স্বদেশপ্রেমিকের চিত্তে কি অনুপ্রেরণা জাগাতে পারে, তার পরিচয় দেয়। স্বদেশসাধনার ক্ষেত্রে সকল প্রকার আঘাত-সংঘাত, 'সুখেদুঃখে বেদনায় বন্ধুর পথে' বন্দেমাতরম্‌ই একমাত্র শক্তি।

'আসুক সহস্র বাধা, বাঁধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়—
বন্দেমাতরম্।।

১। এ্যান্টিপার্টিশন প্রোসেশন পার্টির গান। উপেন্দ্রনাথ দাস পূঃ উঃ, পৃঃ ২৬

২। তদেব।

"আমরা ডরাইব না ঝটিকা-ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন
বন্দেমাতরম্ ॥"

বরিশালে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণের অপরাধে দেশবাসীর লাঞ্ছনার ঘটনা স্বদেশী আন্দোলনে যেমন গতি এনে দিয়েছে, তেমনি গানেও তার প্রকাশ ঘটেছে। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'মাগো, যায় যেন জীবন চলে' গানটি পীড়িত, লাঞ্ছিত বাঙালীকে নৈতিক শক্তি জুগিয়েছে। মুকুন্দদাস তাঁর স্বদেশীযাত্রার প্রবল ভাবাবেগে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল প্লাবিত করেছেন। তাঁর গানেও দেখি—

"বন্দেমাতরম্, বলে নাচরে সকলে
কৃপাণ লইয়া হাতে।
দেখুক বিদেশী হাসুক অট্টহাসি,
কাঁপুক মেদিনী ভীম পদাঘাতে ॥"

বন্দেমাতরম্ গানের প্রভাব বা প্রেরণা শুধু স্বদেশী যুগেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। খিলাফৎ, অসহযোগ, আইন অমান্য, ইংরাজ ভারত ছাড় প্রভৃতি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে স্বদেশী আন্দোলন স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। এই বিভিন্ন স্তরে কখনও নূতন ভাবাদর্শে নূতন গান রচিত হয়েছে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরোনো গানই গাওয়া হয়েছে। দল বিশেষের আদর্শ অনুযায়ী গানের নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু বন্দেমাতরম্ গান এই সকল দল বা মতের উর্ধ্বে শাশ্বত ঔজ্জ্বল্যে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাই দেখি, বন্দেমাতরম্ গান রচনার ৬০ বছর পরেও ১৯৪২'র আন্দোলনে যখন দেশবাসী 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' নীতি গ্রহণ করে স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছে, তখনও তাদের গানে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি

অনুরণিত। অভ্যুদয় নাটকের গানে—

"বন্ধনভয় তুচ্ছ করেছি উচ্চে তুলেছি মাথা
আর কেহ নয় জেনেছি মোরাই মোদের পরিত্রাতা।
করিব অথবা মরিব—এ পণ
ভরিয়া তুলেছে ভারত ভুবন।
স্বপ্নের মাঝে শুনিতেছি যেন স্বাধীন ভারতগাথা।
... ...
জয় জয় জয়, ভারতের জয়, জয়তু ভারতমাতা।
বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্ "।[১] (অভ্যুদয়)

৪

বন্দেমাতরম্ গানটি রাজনৈতিক গাথা হয়ে ওঠাতে ইংরাজ কর্তৃপক্ষ যেমন গানটিকে উপেক্ষা করতে পারেননি, তেমনি স্বাধীনতা লাভের পর দেশের স্বাধীন সরকারও গানটির গুরুত্ব অস্বীকার করেননি। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাত্রিতে যখন ভারতবাসী আপন দেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করল, সেই ঐতিহাসিক গৌরবময় মুহূর্তের কর্মসূচীতে সর্বপ্রথম স্থান ছিল 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের। তিন বছর পরে ভারতের জাতীয় সংগীত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে গিয়েও রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বন্দেমাতরম্ গান প্রসঙ্গে বলেন—

"... the song Vande Mataram, which has played

১। প্রভাতকুমার গোস্বামী সম্পাদিত, পূঃ উঃ, পৃঃ ১৬৮—১৬৯
বন্দেমাতরম্ গানের গৌরবোজ্জ্বল কয়েকটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার গৌরব অর্জন করেছিলেন কয়েকজন গায়ক-গায়িকা। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে গানটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সর্বপ্রথম গীত হয়। কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে (১৯১১ খৃঃ) সরলাদেবী রবীন্দ্রনাথের সুরে গান করেন। অপর একটি অধিবেশনে গান করেন চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত। স্বাধীনতা দিবস, ১৯৪৭, ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাত্রিতে Constituent Assemblyতে গান করেন সুচেতা কৃপালনী।

a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honoured equally with Jana Gana Mana and shall have equal status with it."

সরকারীভাবে 'বন্দেমাতরম্'-এর এই স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ গানটি সম্পর্কে দেশবাসীর শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভঙ্গীর পরিচায়ক। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও গানটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করেই তাকে অন্যতম জাতীয় সংগীতের মর্যাদা দিয়েছে।

কিন্তু বন্দেমাতরম্ গানের এই রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দ্বিধাদ্বন্দ্বহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ১৮৯৬ সাল থেকেই কংগ্রেস এই গানটিকে জাতীয় সংগীতরূপে গ্রহণ করেছিল। অথচ, স্বাধীনতা লাভের পর 'বন্দেমাতরম্'কে সরিয়ে রেখে 'জনগণমন' জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হ'ল। এই ঘোষণার মধ্যেই এই গানটি নিয়ে যে মতবিরোধ ও বাদবিবাদ হয়েছিল, তার আভাস সূচিত হয়।

স্বদেশী যুগ থেকে আরম্ভ করে বন্দেমাতরম্ গানটি দীর্ঘকাল দেশপ্রেমিক, জাতীয়তাবাদী, স্বাধীনতাকামী অসংখ্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে। জাতীয় আন্দোলনে যে গানের এমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, তাকে 'জাতীয় সংগীত'-এর মর্যাদা দেবার চিন্তা স্বতঃই মনে জাগে। কিন্তু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩৭ সালে যখন এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার সংকল্প করে, তখন কিন্তু 'বন্দেমাতরম্' সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিল। একদল 'জনগণমন' গানের পক্ষে মত দিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, 'বন্দেমাতরম্' গান হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার আদর্শপুষ্ট এবং এই কারণে মুসলমানধর্ম-বিরোধী। কাজেই এহেন গান সর্বভারতের জাতীয় সংগীত হ'তে পারে না। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি এই অভিমতকে অস্বীকার করলেন না, তবে জাতীয় আন্দোলনে 'বন্দেমাতরম্'-এর অবদানকেও সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে বললেন—

"Past associations, with their long record of suffering for the cause, as well as popular usage,

have made the first two stanzas of this song a living and inseperable part of our national movement and as such they command our affection and respect."[১]

এই সমিতি মুসলমান সমাজের আপত্তি চিন্তা করে গানটির প্রথম দুই স্তবককেই গান করার অনুমতি দেন। 'বন্দেমাতরম্' গান সম্পর্কে মতানৈক্য দূর করার অভিপ্রায়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত[২,৩] চাইলেন জওহরলাল নেহেরু। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে লিখলেন—

"An unfortunate controversy is raging round the question of suitability of 'Bande Mataram'

১। Nehru, Jawaharlal—Statement on Vandemataram, in his draft of the Congress Working Committee's Resolution on the song passed on 28 October, 1937.

২। রবীন্দ্রনাথের চিঠি জওহরলাল নেহেরুকে, নভেম্বর ২, ১৯৩৭

৩। রবীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরম্ গানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করলেও বন্দেমাতরম্ নিয়ে মাতামাতিকে নিন্দা করেছেন। তাঁর একটি চিঠিতে পাই, (২৮।১২।৩৭) বন্দেমাতরম্ ব্যাপারটা নিয়ে··· বাঙালি হিন্দু সমাজে যে উন্মত্ত বিক্ষোভের আলোড়ন উঠেছে, আমার বুদ্ধিতে এ আমি কখনো কল্পনাও করিনি। ···তর্কটা হচ্ছে এ নিয়ে যে ভারতবর্ষে ন্যাশনাল গান এমন হওয়া উচিত যাতে একা হিন্দু নয় কিন্তু মুসলমান খ্রীষ্টান—এমন কি ব্রাহ্মও—শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে যোগ দিতে পারে। ···'ত্বং হি দুর্গা' 'কমলা কমলদল বিহারিণী', 'বাণী বিদ্যাদায়িনী' ইত্যাদি হিন্দু দেবী নামধারিণীদের স্তব, যাদের 'প্রতিমা পূজি মন্দিরে মন্দিরে', সার্বজাতিক গানে মুসলমানদের গলাধঃকরণ করতেই হবে? হিন্দুর পক্ষে ওকালতি হচ্ছে এগুলি আইডিয়া মাত্র। কিন্তু যাদের ধর্মে প্রতিমা পূজা নিষিদ্ধ তাদের কাছে আইডিয়ার দোহাই দেবার কোনো অর্থই নেই। রাগ করে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বলতে পারো এরকম মনোভাবকে আমরা মানব না। কিন্তু রাগারাগির কথা নয়, এ মনোভাব যাদের আছে তারা আমাদের ন্যাশনালিটির একটা প্রধান অঙ্গ,"···

বন্দেমাতরম্ সম্পর্কে অহিন্দুর আপত্তি থাকতে পারে—সেকথা তিনি মানেন। এ নিয়ে যে বিরোধের উন্মত্ততা দেখা দিয়েছিল, তাকে তিনি নিন্দা করেছেন (৪।১।৩৮)। "মূঢ়তা সবচেয়ে লজ্জাকর—বন্দেমাতরম্ ব্যাপার নিয়ে দেশ জুড়ে যে ঘোলাবুদ্ধির দৃশ্য দেখা

as national song... To me the spirit of tenderness and devotion expressed in its first portion the emphasis it gave to the beautiful and beneficent aspects of our motherland made special appeal so much so that I found no difficulty in dissociating it from the rest of the poem."

বিশেষতঃ জাতীয় আন্দোলনের এক মহালগ্নে গানটি তরুণদের যেভাবে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে, তাদের আত্মোৎসর্গের যে মহান ব্রতে উদ্দীপিত করেছে—তা স্মরণ করে কবি গানটির প্রথম দুই স্তবককে জাতীয় সংগীতরূপে স্বীকার করলেন। তবে বাকী অংশ সম্পর্কে মুসলমান সম্প্রদায়ের আপত্তি থাকাও স্বাভাবিক—একথাও মানলেন।

জওহরলাল নেহেরু রবীন্দ্রনাথের এই বিচারকে সমর্থন করলেন। তিনিও বুঝলেন, বন্দেমাতরম গানকে 'জাতীয়' মর্যাদাদানে কুণ্ঠিত যাঁরা, তাঁরা এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গানটির বিচার করছেন।

গিয়েছে" তা দেখে তিনি বিচলিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠির উত্তরে বুদ্ধদেব বসু তাঁর অভিমত জানিয়ে লেখেন,—"বন্দেমাতরম্ গানটি সমগ্রভাবে মিলে অহিন্দু ভারতের একেবারেই অযোগ্য, একথা কি আজকের দিনে নতুন করে বলবার? 'ত্বং হি দুর্গা' প্রভৃতি পংক্তি আমার তো মনে হয় প্রগতিপন্থী হিন্দুত্ব গ্রহণ করতে পারবে না, কেননা ওর ভিতর থেকে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার উদ্গীরণ কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। ...স্লোগান হিসেবে বন্দেমাতরম্ বাক্যটি একদিন যখন আমাদের জাতীয় কর্মে প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে সেটা থাকতে পারে এবং ইতিহাসের নিয়ম অনুসারেই আপাতত থাকবে। স্বদেশকে মা বলে কল্পনা করার অভ্যেস পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে দেখা যায়। ওতে কোনো বিশেষ ধর্মের সংস্কারে আটকাবে না। কিন্তু সমস্ত গানটি গ্রহণীয় নয়, কংগ্রেস এবারে যেটুকু ছেঁটেছেন তার অনেক বেশী ছেঁটে ফেললেও কোনো ক্ষতি নেই; সমস্ত রচনাটির মধ্যে বন্দেমাতরম্ বাক্যটিই শুধু মূল্যবান। মূল্যবান আর কোনো কারণে নয়, ভারতের গত পঞ্চাশ বছরের জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত হয়ে এসেছে বলে।" বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি (ঙ) এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখিত বুদ্ধদেব বসুর চিঠি (ঙ) থেকে উদ্ধৃত। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮১, পৃঃ ১৪-১৫ ও পৃঃ ২৬

তবু সর্বভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাদ-বিবাদ ও মতবিরোধকে যথাসম্ভব এড়িয়ে গিয়ে গান নির্বাচনই যুক্তিসঙ্গত। এদিক থেকে 'বন্দেমাতরম্'-এর তুলনায় 'জনগণমন' গানটি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ কম। কাজেই 'জনগণমন'কেই রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দেওয়া হ'ল। ১৯৩৭ সালে 'বন্দেমাতরম্' গান সম্পর্কে আপত্তি করেই কিন্তু মুসলমান সমাজ থামেননি, পরের বছর বঙ্কিম-জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁরা আনন্দমঠ ও বঙ্কিমের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগকে আরও সোচ্চার করে তুললেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অগণিত মানুষের মধ্যে কর্মপদ্ধতি নিয়ে অনেক সময় মতভেদ দেখা দিয়েছে। 'যত মত, তত পথ'ও তৈরী করেছেন তাঁরা। কিন্তু পথের লক্ষ্য সকলেরই এক। দেশমাতৃকার মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠা—(বঙ্কিমের উপন্যাসের সন্তানদের যা ছিল একমাত্র সাধনা) সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত। তাঁদের সেই কামনার রূপায়ণে 'বন্দেমাতরম্'-এর ভূমিকা সম্পর্কে জাতীয় নেতৃবৃন্দ সকলেই শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। স্বদেশী যুগ থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত দীর্ঘদিনের সংগ্রামে এই গানের শক্তি অগ্নিপরীক্ষা লাভে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্'কে বলেছেন মন্ত্র—যে মন্ত্র নবভারত রচনা করেছে।

> "The mantra in the song breathed ecstasy at the contemplation of the Motherland in all its beauty, serenity and glory."

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্বদেশী গানের শক্তি সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। বন্দেমাতরম্ জাতীয় সঙ্গীত হতে পারে কিনা এবিষয়ে ১৯৩৭ সালে যখন দেশে তুমুল বিতর্ক চলছিল, তখন সুভাষচন্দ্র এ-বিষয়ে দেশমান্য মনীষীদের মতামত প্রার্থনা করেন। জগদীশচন্দ্র লেখেন—

> "যাঁহার কল্যাণে আমরা পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হইয়া আসিতেছি, সেই জন্মভূমি ও জননীর মধ্যে সন্তান কি ভেদ কল্পনা করিতে

পারে? জননী জন্মভূমির নামের ধ্বনি হৃদয় হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইয়াছে এবং উহা আপনা আপনি সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ, ঐ ধ্বনি ভারতের অন্তর্নিহিত প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে।"[১]

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত উপসমিতির সদস্যরূপে, বন্দেমাতরম্ নিয়ে মুসলমান সমাজের বিরোধিতার যুক্তিসঙ্গত কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়েও, জওহরলাল নেহেরু এই গান সম্পর্কে বলেছেন—

"Vande Mataram is obviously and indisputably the premier national song of India, with great historical tradition and intimately connected with our struggle for freedom. That position it is bound to retain and no other song can displace it."

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নায়ক মহাত্মা গান্ধীর উক্তি উদ্ধৃত ক'রে এই প্রসঙ্গ শেষ করি। তাঁর কথাতেই এই গানের সর্বাঙ্গীণ সৌন্দর্য্য ও মূল্য বিশ্লেষিত হয়েছে।

"The song, it is said, has proved so popular that it has come to be our national anthem. It is nobler in sentiment and sweeter than the songs of other nations. While other anthems contain sentiment that are derogatory to others Bande Mataram is quite free from such faults. Its only aim is to arouse in us a sense of patriotism. It regards India as the mother and sings her praises. The poet attributes to Mother India all the good qualities one finds in one's own mother.

১। পুলিনবিহারী সেন—'জগদীশচন্দ্রের স্বাদেশিকতা', দেশ, ১৯৫৪, ২৬ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা—পৃঃ ৩৮৪

Just as we worship our mother, so is this song a passionate prayer to India"[১]

৫

রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি ১৯১১ সালের কোনও একসময়ে রচিত হয়ে থাকবে। ঐ বছরের কলকাতা কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯১১) গানটি প্রথম গীত হয়। পরের মাসে (জানুয়ারী, ১৯১২) গানটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ভারতবিধাতা নামে ও পরে 'ব্রহ্মসংগীত' এই পরিচয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই মাঘ মাসেই (২৫শে জানুয়ারী, ১৯১২) গানটি কলকাতায় মহর্ষিভবনে মাঘোৎসব সভায় রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় গাওয়া হয়। এই মাঘোৎসব সভাতেই কবিপ্রদত্ত 'ধর্মের নবযুগ' নামক ভাষণেও এই গানের অনুরূপ চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে। "আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই পণ করিয়া ভূমার পথে নিখিল মানবের বিজয়যাত্রায় যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যোগ দিতে পারি। জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর, মানবভাগ্যবিধাতা!"[২] বৃহৎ ভূমিকায় যিনি বিশ্বেশ্বর বা মানবভাগ্যবিধাতা, দেশপ্রীতির পটভূমিকায় তিনিই ভারতভাগ্যবিধাতারূপে অভিহিত হয়েছেন—শব্দ দু'টি ভিন্ন হলেও তাদের সত্তা অভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের অন্য এক কবিতার মধ্যেও এই ভাবটি অভিব্যক্ত।

> "হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি দেখা দিলে আজ কী বেশে!
> দেখিনু তোমারে পূর্বগগনে দেখিনু তোমারে স্বদেশে।...
> হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে, হেরিনু আজিকে নিমেষে—
> মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা, মোর সনাতন স্বদেশে।"[৩]

১। Gandhi, M. K.—*The Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. V, Ahmedabad, 1961. p. 156.

২। রবীন্দ্রনাথ—'সঞ্চয়', পুঃ উঃ ১৮ খণ্ড, ১৯৫৪, পৃঃ ৩৫৫

৩। রবীন্দ্রনাথ—'উৎসর্গ', ১৬নং কবিতা, পুঃ উঃ, ১৯৫৩, পৃঃ ৩১

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—"ব্রহ্মসংগীত বা ধর্মসংগীতের পর্যায়ভুক্ত হলেও গানটির ভাবদ্যোতনা যে দেশভক্তি, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই।"[১] রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতিতে ধর্মীয়বোধ মিশ্রিত হ'য়ে রয়েছে, তাই তাঁর অনেক স্বদেশী গানের দেশাত্মবোধের প্রেরণাতেই ভক্তির সুর বেজেছে। শুধু রবীন্দ্রনাথের গান কেন, সামগ্রিকভাবে একথা বাংলা স্বদেশী গানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

তবে 'জনগণমন' গানটি কংগ্রেসের সভায় এবং মাঘোৎসবের অনুষ্ঠানে গীত হওয়ায় গানটির এই দ্বৈতগুণ বিশেষ করে চোখে পড়ে। গানটি যে যুগপৎ জাতীয় সংগীত ও ভাগবৎ-সংগীতরূপে গৃহীত হয়েছে, তার প্রমাণ পাই যখন দেখি গানটি গীতবিতানের 'স্বদেশ' পর্যায়ে (১৪ সংখ্যক গান) এবং ব্রহ্মসংগীত গ্রন্থে (৮ম অধ্যায়— 'দেশ; দেশের জন্য প্রার্থনা', গা-৮ : ১)—দুই জায়গাতেই স্থান পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই গানটি রচিত হবার আগেই বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছে। স্বদেশী যুগের সেই উন্মাদনা এখন অনেকাংশে স্তিমিত, কবি নিজেও রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিন্ন করেছেন। বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা প্রত্যাহৃত হওয়াতে দেশবাসীর অভীষ্ট পূরণ হয়েছে। এই সাময়িক জয়লাভই দেশের জন্য চরম পাওয়া নয়। সাময়িক লক্ষ্যে উপনীত হয়েই স্বদেশপ্রেম দেশবাসীর কাছে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। দেশের জন্য, মাতৃভূমির জন্য শ্রেয়, প্রেয়, কল্যাণ কামনা চিরন্তন। তাই স্বদেশী যুগের উন্মাদনাপূর্ণ গান নয়, রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন 'জনগণমঙ্গলদায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা'র বন্দনা-গীতি।

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন অন্যান্য রচনার ভাবাদর্শের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে এই গানের মূলভাব যে তাদের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেছে, তাও স্পষ্ট বোঝা যায়।

জনগণমন গানটি রচনার বৎসরাধিক কাল আগে তাঁর গোরা

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পূঃ উঃ, পৃঃ ৫২৯

উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসের বক্তব্য উপন্যাসের উপসংহারে গোরার উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে।[১] "আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-ব্রাহ্ম সকলেরই··· যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষেরই দেবতা।" 'জনগণমন' গানেও ভারতভাগ্যবিধাতাকে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ··· সকল সম্প্রদায়ের দেবতা বলে গণ্য করা হয়েছে। 'গোরা' রচনার অল্পকাল পরে রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতাটি রচিত হয়।[২]

"এই কবিতায় 'উদার ছন্দে পরমানন্দে' যে দেবতাকে বন্দনা করা হয়েছে, বস্তুত তিনিই হচ্ছেন জনগণঐক্যবিধায়ক ভারতভাগ্য-বিধাতা।"[৩] এই কবিতার বাণীই 'জনগণমন'তে উৎসারিত হয়েছে সংগীতের রূপ ধরে। এর পরেও এই ভাবটি দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে অধিকার করেছিল। ১৯১৭ সালে রচিত 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটির ভাব এবং 'জনগণমন' গানের "ভাব নিগূঢ়ভাবে এক। তুই গানেরই সম্বোধনপাত্র হচ্ছেন ভারতবর্ষের চিরন্তন ভাগ্যবিধাতা।"[৪] 'দেশ দেশ' গানে যাঁকে বলা হয়েছে 'জাগ্রত ভগবান', 'জনগণমন' গানে তাঁকেই বলা হয়েছে 'ভারতভাগ্যবিধাতা'।

রবীন্দ্রনাথের প্রাক্‌বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ যুগের স্বদেশী গানের সঙ্গে মৌলিক সাদৃশ্য থাকলেও এই গানের অভিনব ভাব কবির অন্যান্য স্বদেশী গানের থেকে এটিকে স্বতন্ত্র মহিমা দিয়েছে। কবির মতে 'জনগণমন' গানটি 'ভারতবিধাতার জয়গান'—'দেশপরিচয় গান' নয়।

'জনগণমন' গানটি সমকালীন দেশাত্মবোধের আদর্শ এবং রবীন্দ্র-মানসের এই পর্বের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলেও তার

১। রবীন্দ্রনাথ—'গোরা', ১৯১০, অধ্যায় ৭৬

২। রবীন্দ্রনাথ—'গীতাঞ্জলি', ১০৬ নং, ২রা জুলাই, ১৯১০। ১৮ আষাঢ়, ১৩১৭

৩। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—পূঃ উঃ, পৃঃ ৫৩১

৪। প্রবোধচন্দ্র সেন—পূঃ উঃ, পৃঃ ২৭

প্রেরণা কিন্তু তৎকালীন নয়; এই গানটির আদর্শ বাংলাদেশের স্বদেশী গানের দীর্ঘকালব্যাপী ঐতিহ্যের মধ্যে গভীরভাবে নিহিত ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রথম বাংলা স্বদেশী গান 'মিলে সবে ভারতসন্তান' গানটিতে (১৮৬৮) সমগ্র ভারতের ঐক্যের আদর্শ আভাসিত হয়েছে। সরলাদেবীর 'নমো হিন্দুস্থান' (১৯০০) গানেও একইভাবের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এই গানের—

বঙ্গ বিহার উৎকল মান্দ্রাজ মারাঠ গুর্জর পঞ্জাব রাজপুতান।
হিন্দু পার্সি জৈন ইসাই শিখ মুসলমান,
গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে—'নমো হিন্দুস্থান',—

ইত্যাদিতে রবীন্দ্রনাথের জনগণমনের পূর্বাভাস সুস্পষ্ট। সত্যেন্দ্রনাথের গানের ভারতবর্ষের আন্তরিক ঐক্য ও জয় ঘোষণার যে আদর্শ, তা তৎকালের মানুষকে যেমন অভিভূত ও মুগ্ধ করেছে,[১] পরবর্তীকালে সরলাদেবী বা রবীন্দ্রনাথও যে তা দ্বারা আকৃষ্ট হবেন, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে হিন্দুমেলা যুগের 'গাও ভারতের জয়' গানের আবহাওয়াতেই মানুষ হয়েছিলেন। এই বাল্যশিক্ষার প্রভাবই যে পরবর্তীকালে তাঁকে স্বরচিত 'জনগণমন' গানে ভারতবিধাতার পৌনঃপুনিক জয় ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা অনুমান করে নিতে কোনও দ্বিধা হয় না।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য স্বদেশী গানের তুলনায় 'জনগণমন' গানটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। এর পংক্তি সংখ্যা ৩১, পাঁচটি স্তবকে পংক্তিগুলি বিন্যস্ত। স্তবক বিন্যাসের ভঙ্গী হ'ল—প্রথম স্তবক ৭ পংক্তির, বাকী চারটি স্তবকে ৬টি করে পংক্তি রয়েছে। স্তবক পাঁচটির মধ্য দিয়ে মূল ভাবটি বিকশিত হয়ে উঠেছে। প্রথমটিতে, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের বর্ণনার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়টিতে বিচিত্র ধর্মের উল্লেখের দ্বারা ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অনুসন্ধানের চিন্তাটি রূপায়িত হয়েছে। তৃতীয় স্তবকের

১। গানটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশস্তি ১ম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য

মূল ভাব হ'ল পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে বিধাতার সারথ্যেই মানব-জাতির অগ্রগতি ঘটছে। চতুর্থ স্তবকে দেখি, এই ভাগ্যবিধাতাই স্নেহময়ী জননীরূপে পীড়িত দেশের মানুষের দুঃখক্লেশ নিবারণে যত্নবান। শেষ স্তবকে, রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে সূর্য্যের আলোকছটা ফুটে উঠেছে। নূতন দিনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জীবনের আশ্বাস পেয়েছেন কবি।

রবীন্দ্রনাথ এই গানে বিশ্ববিধাতার কাছে ঐক্য, দুঃখত্রাণ, জীবনের পথনির্দেশ, নবজীবন—প্রভৃতি প্রার্থনা শুধু ভারতের মানুষের জন্য নয়, সমগ্র পৃথিবীর মানবজাতির জন্যই উচ্চারণ করেছেন। এইজন্যই গানটির জাতীয়তাবোধ অনায়াসে আপন সীমাকে অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকতায় রূপান্তরিত হতে পেরেছে।[১] গানটির এই অভিনব গুণের জন্যই এটি বিশ্বের যে কোন দেশের রাষ্ট্রীয় সংগীতের সঙ্গে তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবার যোগ্য।

গানটির এই সুমহান ভাব তদুপযোগী শব্দ ও চিত্ররূপের মাধ্যমে সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এর ছন্দ সংস্কৃত ছন্দসূত্র অনুযায়ী, যাকে অনেকে বলেছেন 'লঘু-গুরু ছন্দ'। ভাষা ব্যবহারে সংস্কৃতা-য়িতরীতি গ্রহণ করেছেন কবি। স্বদেশী যুগের উন্মাদনাপ্রবণ গানের ভাব ও ভাষার সঙ্গে তুলনা করলেই এই গানটির শব্দ ব্যবহারের পার্থক্য চোখে পড়ে।

"এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে
জয় মা বলে ভাসা তরী"-এর সঙ্গে তুলনায়

১। অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের মন্তব্য স্মরণীয়ঃ "The uniqueness of Janaganamana as a national anthem is its integration of the patriotic feeling with a feeling for universal humanity. And if Rabindranath had any political philosophy its essence was a fine complex of nationalism and internationalism." "Our National Anthem: Its composition and significance"—R. K. Das Gupta (ed.) *Our National Anthem*, University of Delhi, 1967, p. 22.

"রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরিভালে—
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।"

প্রকাশ ভঙ্গীর পার্থক্য স্পষ্ট।

চিত্রকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এখানে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। দেশের ভাগ্যবিধাতাকে রাজাধিরাজরূপে, রথের সারথিরূপে, দুঃখসংকটের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঞ্চজন্য শংখবাদকরূপে কল্পনা করে তাঁরই ওপর মানবজাতির পথ পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। আবার দেশের সন্তানেরা যেখানে আর্ত্ত, পীড়িত, সেখানে 'ভারতভাগ্যবিধাতা' কল্যাণময়ী, স্নেহময়ী মাতারূপে কল্পিতা হয়েছেন। জাতির ভাগ্যবিধাতা একাধারে জাতিকে পরিচালনা করছেন কর্মের পথে ও সংগ্রামের পথে, আবার তিনি স্নেহময়ী জননীরূপে তাঁর স্নেহছায়ায় আশ্রয় দিয়েছেন জাতিকে।

প্রাকৃতিক চিত্রকল্পের মধ্যে দেখি মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকার-গাঢ় রাত্রি। আবার, নবজীবনের পসরা নিয়ে সূর্যোদয়ের আবির্ভাবের চিত্রও আছে। রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত করে নব অরুণোদয়ের আলোক-দ্যুতিও উদ্ভাসিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানের প্রশান্ত, মধুর ভাব,—আশাবাদী সুর—এই গানটিতেও পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে।

৬

এই গানটির তাৎপর্য্য নিয়ে, রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে নানা সংশয় জেগেছিল দেশের মানুষের মনে। ফলে গানটির সম্বন্ধে অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে। এই অভিযোগগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, চার প্রকারের অভিযোগ গানটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে উঠেছিল। গানটি প্রথমবার গীত হবার সঙ্গে সঙ্গে যে অভিযোগ ওঠে, তা হ'ল—গানটি রাজবন্দনাগীত। ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জকে লক্ষ্য করে রচিত ও গীত।

গানটির উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংশয় সৃষ্টির মূলে রয়েছে কলকাতা

থেকে প্রকাশিত ইংরাজী সংবাদপত্রগুলিতে এই গান সম্বন্ধে ভুল তথ্য পরিবেশনে। ২৮শে ডিসেম্বরের (১৯১১) 'The Englishman'-এর বিবৃতি ছিল—

> "The proceedings opened with a song of welcome to the King Emperor, specially composed for the occasion by Babu Rabindranath Tagore."

ঐ দিনেরই 'The Statesman' লেখে—

> "The choir of girls ... sang a hymn of welcome to the King specially composed for the occasion by Babu Rabindranath Tagore, the Bengali poet."

Reuter প্রেরিত সংবাদেও (২৯শে ডিসেম্বর)

> "a Bengali song, specially composed in honour of the Royal visit was sung and a resolution welcoming the King Emperor and Queen Empress was adopted unanimously."

কিন্তু মূল ঘটনাটি হ'ল যে ১৯১১'র কংগ্রেস অধিবেশনে 'জনগণমন' গীত হবার পরে রামভুজ দত্ত রচিত একটি হিন্দী গান—"যুগ জীব্ মেরা পাদশা, চহুঁ দিশরাজ"—পঞ্চম জর্জ্জকে স্বাগত জানিয়ে গীত হয়। সমকালীন ভারতীয় সংবাদপত্রে তা স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হয়েছে। ('Amrit Bazar Patrika', 28. 12. 11, "The Bengalee, 28. 12. 1911—দু'টিই প্রবোধচন্দ্র সেন, *India's National Anthem,* 1949, p. 4এ উদ্ধৃত।) অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও বিদেশী প্রেসেও ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছিল। কিন্তু তা গুরুত্বপূর্ণ হতো না যদি না আমাদের দেশেই (বিশেষতঃ অনেক অবাঙালী) অনেক ব্যক্তি সন্দেহ করতেন যে গানটি ইংলণ্ডের রাজার আগমন উপলক্ষ্যে রচিত।

১৯৩৭ সালের জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচনকালে, পঁচিশ বছর আগেকার ভিত্তিহীন অভিযোগের ভিত্তিতেই এই গানটির উদ্দেশ্য

ও তাৎপর্য্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে গানটিকে জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণের বিরোধিতা করলেন কয়েকজন। কবি নিজে গানটি সম্বন্ধে বললেন,

> "শাশ্বত-মানব-ইতিহাসের যুগযুগধাবিত পথিকদের রথযাত্রায় চিরসারথি বলে আমি চতুর্থ বা পঞ্চম জর্জ্জের স্তব করতে পারি, এরকম অপরিমিত মূঢ়তা আমার সম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহ করতে পারেন তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আত্মাবমাননা।"[১]

আশ্চর্যের বিষয় যে ১৯৬৬ সালে একজন রাজনৈতিক নেতা লোকসভায় আবার এই প্রশ্ন তোলেন।[২]

বাংলা স্বদেশী গানের প্রবাহে 'জনগণমন' গানের অভিনবত্ব হ'ল যে এই গানের স্বদেশপ্রীতি জাতীয়তার সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক, সর্বজনীন মানবতার উপলব্ধিতে উন্নীত হয়েছে। এই গানের ভাবই আরও ব্যাপকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা প্রবন্ধে। "স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে এবং সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়,"··· এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববাসীকে ভারততীর্থে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অন্যান্য স্বদেশী গানের মত এখানে দেশজননীর মাতৃরূপ অঙ্কিত হয়নি—মানবতার উদ্বোধন সংগীত বা স্তবগীতি এই গানটি। যদিও এই গানের মধ্যেও ভক্তির সুর মিশ্রিত রয়েছে, তবে এই ভক্তি দেশমাতৃকার চরণে নয়, 'জনগণমন-অধিনায়ক, ভারতভাগ্যবিধাতা'র প্রতি নিবেদিত হয়েছে। গানটির এই ভক্তিভাব লক্ষ্য করে মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "It is not only a song but also like a devotional hymn."

১। 'পূর্বাশা'—১৩৫৪ ফাল্গুন। ১৯৪৭, পৃঃ ৭৩৮, রবীন্দ্র-জীবনী (পূঃ উঃ) ২য় খণ্ডের পরিশিষ্টে প্রবোধচন্দ্র সেনের জনগণমন অধিনায়ক (পূঃ উঃ) প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

২। দ্রষ্টব্য—Lok Sabha Debates, 3. 8. 1966. Third Series, L VIII, viii 2117-18.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বদেশী গানের রূপ ও আঙ্গিক

১

স্বদেশী গানের উদ্ভবের অব্যবহিত প্রেরণা, তার বিষয়বস্তু এবং তার সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা থেকে দেখেছি যে স্বদেশী গান বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে নানা দিক থেকে নতুন তার অভিনবত্বের আর একটি দিক তার বহিরঙ্গে। অবশ্য অন্যান্য নানা ব্যাপারের মতই, বহিরঙ্গ গঠনেও স্বদেশী গান প্রাচীন কবিতার গঠনকে অনুসরণ করেছে, কিন্তু প্রাচীন কবিতার বহিরঙ্গকে নূতন বস্তুব প্রয়োজনে পরিবর্তিত আকারে ব্যবহার করেছে।

স্বদেশী গানকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ ক'রে দেখতে পারি যে প্রধানত যে বহিরঙ্গরূপ প্রাধান্য লাভ করেছে তা হ'ল দেশজননীকে উদ্দেশ্য ক'রে কবির উক্তি। বলাই বাহুল্য কাউকে উদ্দেশ্য করে কবির উক্তি বাংলা কাব্যে ইতিপূর্বে আছে শুধু ধর্মীয় কবিতায়, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে প্রেমের কবিতায়, এবং নিশ্চয়ই পুরোনো বাংলা সাহিত্যে—লোকগীতিতে ও কবিতায়। এবং সবদিক বিচার করলে পুরোনো বাংলাকাব্যে রামপ্রসাদের গানেই এই গঠনের সবচেয়ে স্পষ্ট ও বিশিষ্টরূপ দেখা গেছে। রামপ্রসাদের গানে, বা অধিকাংশ গানে, মার (যিনি ঈশ্বর) কাছে সন্তানের (যিনি ভক্ত) আবেদন, নিবেদন। এক অর্থে বন্দনাও ঈশ্বরের কাছে কবির উক্তি, প্রার্থনাও কবির উক্তি—একজন বক্তা, একজন শ্রোতা—এই কাঠামোর মধ্যেই সেগুলি রচিত। কিন্তু রামপ্রসাদের গানের আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য হ'ল যে সেখানে বন্দনা ও প্রার্থনা স্পষ্ট নয়, স্পষ্ট হ'ল কবির অন্তরঙ্গ, আত্মীয়তার ভঙ্গী। এই বৈশিষ্ট্য এক

অর্থে মধ্যযুগের ভারতীয় কবিদের অনেকেরই, বিশেষ করে মীরাবাঈ-এর, কিন্তু রামপ্রসাদেই এই আঙ্গিকের চরম প্রতিষ্ঠা, কারণ রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বরে নানা রং, নানা তরঙ্গ। এবং তার প্রকাশ সম্ভব হয়েছে এই রকম একটি বক্তা-শ্রোতার কাঠামোতে। স্বদেশী গানের প্রধান কাঠামো এই বক্তা-শ্রোতার কাঠামো—প্রধান, কিন্তু একমাত্র নয়।

স্বদেশী গানে কবি হয় মাকে (যিনি কখন দেবীমূর্তি, কখনও মানবীমূর্তি) কিছু বলছেন, নয় সন্তানকে কিছু বলছেন।

'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা'

কিম্বা

"(যখন) মুদে নয়ন করবো শয়ন
শমনের সেই শেষকালে
তখন সবই আমার হবে আঁধার
স্থান দিও মা ঐ কোলে।"

এই ছত্রগুলি শুধুই যে বাংলা ভক্তির গীতিকবিতার নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করা চলে তাই নয়, এগুলি রামপ্রসাদীয় গানের কাঠামোরও অন্তর্গত। এইরকম অনেক গান উদ্ধৃত করা সম্ভব। কিন্তু স্বদেশী গানের এই কাঠামো শেষ পর্যন্ত রামপ্রসাদীয় কাঠামো থেকে কতটা এবং কেন পৃথক তার আলোচনাই হবে বেশী আকর্ষণীয়। রামপ্রসাদের কাঠামোর মধ্যে দেখি ছেলে মাকে নানা ভাবের কথা বলছে। প্রচলিত অর্থে ধর্মভাবনার কথা বরং কম আছে—আছে ছেলের দুঃখের কথা, দারিদ্র্যের কথা, অবিচারের কথা, মার প্রতি অভিমানের কথা। এবং বলার কারণ খুবই স্পষ্ট—মা আসলে পরমশক্তি, তিনি জাগতিক মা মাত্র নন, তিনি সমস্ত কিছুর প্রতিকারে সক্ষম। তিনি জাগ্রত, জীবন্ত। কিন্তু দেশমাতা সেই অর্থে জাগ্রত ও জীবন্ত শক্তি নন। তিনি সন্তানের সৃষ্টরূপ মাত্র। সন্তানের দুঃখদারিদ্র্যের কথা নিয়ে তাঁর কাছেও বিলাপ অবশ্যই চলে—এবং কবিরা বিলাপ দক্ষতা যথেষ্টই দেখিয়েছেন—কিন্তু সেখানে

প্রতিকারের কোন সম্ভাবনা নেই, শক্তিও নেই। কারণ এখানে শক্তির উৎস মা নন, সন্তান। অর্থাৎ বহিরঙ্গে স্বদেশী গানের কাঠামো রামপ্রসাদীয় কাঠামো হওয়া সত্ত্বেও অন্তরঙ্গে পৃথক। সেজন্যই প্রধানত স্বদেশী গানের বহিরঙ্গের রূপ আরো কয়েকটি ধারায় রয়েছে। প্রথমত মাকে সম্বোধন করে সন্তান কথা বলছে, যে কথাগুলি প্রাচীন বন্দনার আধুনিক রূপ মাত্র। যেমন, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'—মাকে সম্বোধন করে সন্তানের উক্তি, মার রূপ, মার স্নেহ, মার দুঃখ সব কথাই এর মধ্যে আছে। কিন্তু এ যেমন দেশের রূপসৌন্দর্য ও গরিমার বিবৃতিমূলক বন্দনা থেকে পৃথক (সে ধরণের স্বদেশী কবিতা ও গানও লিখিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথেরই 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' স্মরণযোগ্য), তেমনই পৃথক রামপ্রসাদের কাঠামোর সজীবতা থেকে—কাঠামোর সজীবতা বলতে বোঝাচ্ছি যে বক্তা ও শ্রোতার উভয়েরই সক্রিয়তার কথা। দেশ ও সন্তানের উক্তির কাঠামোর মধ্যে দেশমাতা শুধু শ্রোতা মাত্র নন, তিনি নিষ্ক্রিয় শ্রোতা। এই নিষ্ক্রিয়তা কাটাবার জন্যই দেশজননীকে অনেক ক্ষেত্রে দেবীর সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছে। অর্থাৎ কালী, লক্ষ্মী, কিম্বা দুর্গার সঙ্গে দেশের একাত্মতাকে হিন্দু জাতীয়তাবাদের দিক থেকে দেখার যতটা চেষ্টা করা হয়েছে, এর পেছনের সাহিত্যিক প্রয়োজনীয়তাকে যদি বুঝতাম, তাহলে ব্যাপারটা অনেকটা স্পষ্ট হত। প্রকৃতপক্ষে কবিরা বহুক্ষেত্রেই যে দেবীমূর্তির শরণাপন্ন হয়েছেন তা এই কাঠামোর একপক্ষের নিষ্ক্রিয়তাকে লুপ্ত করে এক ধরণের সজীব সক্রিয়তার সৃষ্টির জন্য। দেশবন্দনা চিরকাল যে কোন দেশের কবিরা কীভাবে করে থাকেন? হয় সেই দেশের প্রকৃতির স্তুতি রচনা করেন, নয় সেই দেশের মানুষের কীর্ত্তির কথা স্মরণ করে থাকেন। সেই দেশের ভাষার কথা বলেন, তার ধর্মের কথা বলেন। নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত মোবরে যখন মাতৃভাষার দুঃখে বলেছিলেন—

The language I have learn'd these forty years,
My native English, now I must forego ; (I, iii)

তখন কল্পনা করতে পারি যে এলিজাবেথীয় দর্শক 'My native English' শব্দগুচ্ছে যে গর্ব অনুভব করেছিলেন, তা 'কী যাদু বাংলা গানে' কিংবা 'মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মত' শুনে বাঙালীর গর্বের সঙ্গে, কিংবা দোদের 'শেষ ক্লাশ' গল্পের অধ্যাপকের ফরাসী ভাষাপ্রীতির সঙ্গেই তুলনীয়—আর এই ভাষাপ্রীতি দেশপ্রীতিরই অংশমাত্র, অনেকক্ষেত্রে একাত্মও বটে।

আবার রিচার্ড দি সেকেণ্ড নাটকেই জন অফ গণ্টের মুখে যখন শুনি

This royal throne of Kings, this scept'red isle,
This earth of majesty, this seat of Mars,
This other Eden, demi-paradise,
This fortress built by Nature for herself
Against infection and the hand of war,
This happy breed of men, this little world,
This precious stone set in the silver-sea
Which serves it in the office of a wall,
Or as a moat defensive to a house,
Against the envy of less happier lands ;
This blessed plot, this earth, this realm, this England,
This nurse, this teeming womb of royal kings
Fear'd by their breed and famous by their birth,
Renowned for their deeds as far from home,
For Christian service and true chivalry,
As is the sepulchre in stubborn Jewry
Of the world's ransom, blessed Mary's Son,
This land of such dear souls, this dear, dear land
Dear for her reputation through the world
Is now leas'd out—I die pronouncing it,—
Like to a tenement, or pelting farm,
England, bound in with the triumphant sea,
Whose rocky shore beats back the envious siege
Of watery Neptune, is now bound in with shame,
With inky blots, and rotten parchment bonds ;
That England, that was wont to conquer others,
Hath made a shameful conquest of itself.

Ah ! would the scandal vanish with my life,
How happy then were my ensuing death

(II, i)
lines 40-68

তখন বুঝি যে কোন দেশের ও কালের স্বদেশী সাহিত্যের মর্মকথা কি, বিষয়বস্তু কি? এই উক্তিটিতে স্বদেশী গানের সমস্ত ভাব পুঞ্জীভূত, এমনকি পরাধীনতার বেদনাও। এই উক্তিরই বহু ছত্র বহু বাংলা গানে, কবিতায় নবরূপ পরিগ্রহ করেছে। মূল কথা হ'ল যে দেশপ্রেমের সাহিত্য মানেই দেশের প্রকৃতি, দেশবাসীর সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক মহত্বের স্তুতি। বাংলা স্বদেশী গানের যেসব গানের বহিরঙ্গ রামপ্রসাদীয় কাঠামোতে রচিত সেখানেও এইসব কথা মূল কথা, কিন্তু মূল কথাগুলি এই কাঠামোতে যথার্থভাবে খাপ খায়না বলেই স্বদেশী গানের বহিরঙ্গের মধ্যে একটি অমসৃণতা আছে। বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্ সংগীতটিতে এই আঙ্গিকের অমসৃণতা খুবই স্পষ্ট। আরম্ভ হ'ল মার বন্দনায়, যে মা সুজলা, যে মা সুফলা, যে মা শস্যশ্যামলা, মলয়জশীতলা—তাঁর বন্দনা। কিন্তু নিছক বন্দনাই কবির পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিশেষত স্বদেশী গান, যার প্রেরণা বেদনায়, যার প্রেরণা কর্মের, সক্রিয়তার, তাই কবিকণ্ঠে শুধু মাকে বন্দনা করি বলাই যথেষ্ট নয়, তিনি স্পষ্টভাবে মাকে সম্বোধন করলেন 'অবলা কেন মা এত বলে' 'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি'—আবার গান শেষ হ'ল বন্দনায়। কিন্তু মধ্যের সম্বোধন অংশটুকুও বিবৃতি মাত্র, প্রতিজ্ঞা মাত্র, কোন উৎকর্ণ কর্ণের উদ্দেশ্যে কোন উন্মুখ কণ্ঠের উক্তি নয়। বঙ্কিমের গানে বন্দনা ও সম্বোধনমূলক বিবৃতির মিশ্রণ দেখেছি, তারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা গেছে সমগ্র স্বদেশী গানের ইতিহাসে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন,

"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি,
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী",

তখন জননীর উদ্দেশ্যে সম্বোধন আছে মাত্র, কিন্তু এই জননী ও

সন্তানের যে সম্পর্ক তা দু'টি সজীব প্রাণের সম্পর্ক নয়, কবির সঙ্গে দেশপ্রেমের idea-র সম্পর্ক, যে idea কখনও কখনও কাব্যের প্রয়োজনে দেবীমূর্তি বা নারীমূর্তির রূপধারণ করে আবির্ভূত হচ্ছে মাত্র। এই ধরণের স্বদেশী গানের অধিকাংশই তাই অন্তরঙ্গে দেশপ্রেমের idea-র সঙ্গে কবির লীলা এবং সেদিক থেকে এরা বিশিষ্ট ও পৃথক। এইরকম যে সম্ভব হয়েছে তার একটা কারণ হ'ল যে দেশ ও দেবীর একাত্মতা এবং প্রধানত রামপ্রসাদের কবিতা। অন্য সাহিত্যে এধরণের কবিতা রচিত হয়নি, অথচ ভারতবর্ষের প্রত্যেক ভাষাতেই এই ধরণের স্বদেশী-সংগীত রচিত হ'ল রাশি রাশি।

দেশ অন্যান্য দেশের সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে পুণ্যভূমি ব'লে কীর্ত্তিত হয়েছে, কিন্তু ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। বাংলাদেশে যেহেতু মূলত বঙ্কিমের হাতেই দেশ দেবীমূর্তিতে রূপান্তরিত হ'ল (অবশ্য বঙ্কিমের আগে থেকেই সেই প্রচেষ্টার আভাস দেখা গেছে) সেজন্য এই কবিতা। গানগুলির মধ্যেও এল একটা নতুন গঠন, যা ইতিপূর্বে অন্য কোন সাহিত্যে, অন্তত আমাদের পরিচিত অন্য কোন সাহিত্যে, দেখা যায়নি। এর অর্থ এই নয় যে আমাদের স্বদেশী গান অন্য দেশের অনুরূপ গান-কবিতা থেকে শ্রেষ্ঠ। এর দ্বারা শুধু বাংলা গানের গঠনের পার্থক্যের নির্দেশ করতে চাইছি মাত্র।

কথাটা হ'ল যে মা-সন্তানের উক্তির যে কাঠামো দেশপ্রেমের গানে দেখেছি সেখানে মা মূলত নিষ্ক্রিয়, সন্তানই ক্রিয়ার উৎস। সেই নিষ্ক্রিয়তার মাত্রা কমানোর প্রয়োজনে মাকে (দেশকে) দেবী কল্পনা করা হয়েছে, যদিও কালী বা লক্ষ্মী বা দুর্গার সক্রিয়তা তার মধ্যে সম্পূর্ণ আরোপ করা সম্ভব হয়নি। সেইজন্য স্বদেশী গানের আর একটি গঠন, যা পূর্বোক্ত গঠনের সামান্য পরিবর্তিত রূপ মাত্র, হ'ল কবি মাকে নয়, দেশবাসীকে অর্থাৎ মায়ের সন্তানদের সম্বোধন করে কথা বলছেন।

এই ধরণের গানের চরিত্রে অবশ্য অনেক বেশী বৈচিত্র্য। তার মধ্যে আছে আত্মশোচনা, আত্মসমালোচনা, ধিক্কার, আবার উৎসাহ ও উদ্দীপনা। কারণ ঐ ধরণের গানের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে দেশ-প্রেমের গুরুত্ব, সমাজের অবস্থা, দেশের বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করা সম্ভব। হিন্দুমেলার যুগে কর্মপন্থা নির্দিষ্ট হয়নি গানেও কর্মপন্থা নেই ; বঙ্গভঙ্গের যুগে কর্মপন্থা ছিল বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা, স্বদেশীযুগে বিদেশী বর্জন, স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার, সন্ত্রাসবাদীদের কালে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা ইত্যাদি কর্মপন্থাগুলি এই ধরণের কাঠামোর মধ্যে সহজে আত্মপ্রকাশ করেছে। বলাই বাহুল্য, এই ধরণের বহিরঙ্গ পুরোনো কবিতায় ছিল একমাত্র উপদেশাত্মক কবিতায়, অর্থাৎ যেখানে কবি অন্য কাউকে উপদেশ দিচ্ছেন।[১] স্বদেশী গান এখানেও পুরোনো বহিরঙ্গ গ্রহণ করেছে, কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে গেছে। বেশীর ভাগ গান সাহিত্যের দিক থেকে তুচ্ছ, উদ্দীপনা জাগানোর শ্লোগান মাত্র, কিন্তু যখন 'একলা চল'-র মত গান শুনি তখন দেখি এ শুধু উপদেশাত্মক কবিতার কাঠামোয় লেখা নয়, এ প্রকৃতপক্ষে কবির বিশেষ অনুভূতির (যে অনুভূতি নিজের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত) থেকে জাত বিশুদ্ধ lyric, এখানে কবিই লক্ষ্য, শ্রোতারা উপলক্ষ্য মাত্র। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথেই আমরা এইরকম শুদ্ধ কবিতা পেয়েছি, কিন্তু বেশীর ভাগ স্বদেশী গান (এই ধরণের) প্রচারমূলক। স্বীকার করতেই হবে যে সে গান-গুলি যে উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল সেদিক থেকে সার্থক। 'কারার ঐ লৌহকপাট' কিংবা 'ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ী' কিংবা 'স্বদেশ

১। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়—

> "ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে
> প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া,
> কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
> বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।" (কবিতাবলী, ১৮৮৫)

স্বদেশ করিস্ কারে'—যে উদ্দীপনা, উৎসাহ ও ধিক্কার সঞ্চার করেছিল রবীন্দ্রনাথের গান তা পারেনি, কিন্তু সাহিত্যগুণে রবীন্দ্রনাথই দীর্ঘজীবী হয়েছেন।

দেশমাতৃকাকে সম্বোধন করে রচিত স্বদেশী গানের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত ভাব ও বহিরঙ্গের বিচারে অনন্য। স্বদেশভূমি গীতিকারের কাছে শুধু সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা ভূমিখণ্ড নয়, জন্মভূমির চেতনা রয়েছে তাঁর সমগ্র সত্তার গভীরে। এই গানের

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তিঃ
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে॥"

অংশ মাতৃভূমির স্তবগীতে পরিণত।[১]

১। এই পর্যায়ের অজস্র গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গান—(ক্রোড়পঞ্জী, ৩, দ্রষ্টব্য)—

(ক) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি'

(খ) রবীন্দ্রনাথ—'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী',
'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে',
'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক',
'সোনার বাংলা'

(গ) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—'মাগো, যায় যেন জীবন চলে'

(ঘ) গোবিন্দচন্দ্র রায়—'কতকাল পরে বল ভারত রে'

(ঙ) সরলাদেবী—'বন্দি তোমায় ভারতজননী'

(চ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—'বঙ্গ আমার! জননী আমার!',
'ভারত আমার', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে'

দেশমাতৃকাকে সম্বোধনের মাধ্যমে দেশের দীনমলিন অবস্থায় কবির অন্তর্বেদনা প্রকাশিত।

"মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি,
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-করি,
... ...
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি !
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি।"

কখনও আবার ভারতের অতীতগৌরব-স্মৃতি কবিমনে গর্ব জাগিয়ে তোলে।

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে
উঠিলে জননি ! ভারতবর্ষ !
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব
সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ !"

অথবা,

ভারত আমার ! ভারত আমার !
যেখানে মানব মেলিল নেত্র,
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা,
এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।

কোনও কোনও গানে কথোপকথনের ভঙ্গীর মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবোধ জেগে উঠেছে। 'উঠ গো, ভারতলক্ষ্মী' গানটি তারই নিদর্শন।

দেশজননীর সঙ্গে সঙ্গীতকারের বাৎসল্যের সম্বন্ধের মধ্যে ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাবই মুখ্য হলেও স্নেহনিবিড় সম্পর্কের চিহ্নও কয়েকটি গানে সুস্পষ্ট। 'সোনার বাংলা' কবির 'প্রাণে বাজায় বাঁশি'।

(ছ) অতুলপ্রসাদ সেন—'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী'
(জ) কামিনীকুমার ভট্টাচার্য—'হামারা সোনেকী হিন্দুস্থান'
(ঝ) নজরুল—'আমার সোনার হিন্দুস্থান', 'এস মা ভারতজননী'

স্বদেশী গানে, অখণ্ড দেশ বা ভারতবর্ষের কোন খণ্ড অংশ যাকেই সম্বোধন করা হয়েছে, সর্বত্রই তিনি মাতৃরূপে প্রতিষ্ঠিতা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বদেশপ্রেম বা স্বাজাত্যবোধ নিয়ে রচিত গানের সঙ্গে তুলনা করে বাংলা স্বদেশী গানের এই অভিনব বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। বস্তুতঃ ভারতবাসীর স্বদেশপ্রীতি ঈশ্বরপ্রীতিরই নামান্তর।

> "Patriotism with him is not the spirit that guards or extends the territory; it is much rather the spirit of devotion to country realised as a divinity—not a sentiment but a cult"...[১]

স্বদেশী গান ভক্তির গান নয়, কিন্তু ভক্তির গানের মতই তাতে আরাধ্যা দেবী ও সাধক সন্তানের সম্বন্ধের নৈকট্য রয়েছে। সম্বোধনে 'তুমি' ও 'তুই' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

বিশেষ করে 'তুই' শব্দ ; যা বাংলা কবিতায় মাকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে বহু ব্যবহৃত, তা স্বদেশী গানেও প্রচলিত।[২] সম্বোধনের এই সম্ভ্রমসূচক ও তুচ্ছার্থরূপ—'তুমি' ও 'তুই' প্রয়োগের ভেতরও কবির স্বদেশ চেতনার স্বরূপ অভিব্যক্ত হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষকে যেখানে মাতৃসম্ভাষণ করা হয়েছে সেখানে 'তুমি' শব্দের বহুল ব্যবহার, অন্যদিকে বাংলাদেশকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে 'তুই' শব্দ বেশী

১। Das Gupta, R. K.—*op. cit.*, p. 51.

২। সম্বোধন অধিকাংশ ক্ষেত্রে গানের প্রথম দুই চরণের মধ্যেই আছে, কোথাও বা শেষ পংক্তিতে। আবার অনেক গানের আরম্ভই সম্বোধন দিয়ে। যথা, নজরুলের গানে—

> "লক্ষ্মী মা, তুই আয় গো উঠে সাগর জলে সিনান করি।
> হাতে লয়ে সোনার ঝাঁপি, সুধার পাত্রে সুধা ভরি॥"

কোথাও সম্বোধন প্রথম চরণের মাঝখানে, "বন্দি তোমায় ভারতজননি, বিদ্যামুকুট ধারিনি", কখনও প্রথম পংক্তির শেষে বা দ্বিতীয় পংক্তিতে সম্বোধন রয়েছে।

> "সার্থক জনম, আমার জন্মেছি এই দেশে।
> সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে॥"

(রবীন্দ্রনাথ) (ক্রোড়পত্রী, ১, দ্রষ্টব্য)

ব্যবহৃত। সম্ভবত ভারত ও বাংলার মধ্যে সম্ভ্রমবোধ ও নৈকট্যবোধের পার্থক্য সূচিত হচ্ছে তার মধ্যে। জগন্মাতাকে সন্তানরূপে কল্পনা করে যে বাঙালী জাতি 'আগমনী' 'বিজয়ার' গান রচনা করেছে, তার পক্ষে দেশমাতৃকার সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে তুলে গান রচনা করা ঐতিহ্যগত দিক থেকেও স্বাভাবিক।

ভারত ও বঙ্গচিন্তার মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রেমের প্রসারিত ও সংকুচিত রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে। আবার, দেশসম্বন্ধে দেশবাসীর সম্ভ্রমপূর্ণ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কের পরিচয়ও এতে পাওয়া যায়। স্বদেশ যেখানে সমগ্র ভারত, সেখানে তার সঙ্গে দেশের মানুষের সম্পর্কও শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের; অন্যদিকে জন্মভূমি যেখানে বাংলাদেশের সীমায় আবদ্ধ, সেখানে দেশের প্রতি দেশবাসী অধিকতর ঘনিষ্ঠ, আত্মীয়তার সম্পর্ক উপলব্ধি করেছে। দেশমাতৃকার প্রতি সম্বোধন করে রচিত গানগুলির সম্বোধনসূচক শব্দগুলি বিশ্লেষণ করলে এই বক্তব্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। একশ'টি নির্বাচিত গানের মধ্যে এই পর্যায়ের গান হ'ল ৫১টি-তারমধ্যে ২১টি গানে দেশের প্রতি প্রত্যক্ষ সম্বোধন আছে, তাছাড়া অস্পষ্টভাবে আছে ৩০টি গানে। এই একুশটি সম্বোধনের ব্যবহারের ছবিটি এইরকম—
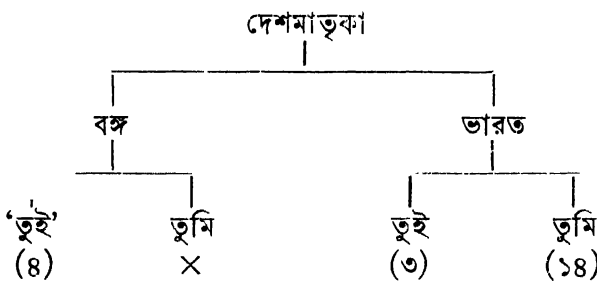
স্বদেশী গানে দেশবাসীকে সম্বোধন করে অনেক গান রচিত হয়েছিল। জাতীয়তাবোধ প্রচারে এই পর্যায়ের গানগুলি যে অতি

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, তা অনুমান করা যায় এদের সংখ্যাধিক্য দেখে।[১] এই শ্রেণীর গানের মধ্য দিয়ে দেশ সম্বন্ধে দেশের মানুষের মনে উদ্দীপনা ও কর্মের প্রেরণা জাগিয়ে তোলাই সঙ্গীতকারদের প্রধান লক্ষ্য। দেশবাসীকে অনুনয়-বিনয়, আদেশ, ভর্ৎসনা, ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপের কশাঘাত করে—যে কোনও উপায়েই হোক না কেন, সঙ্গীতকার দেশের প্রতি তাদের গুরুদায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন এইসব গানে।[২] এই গানগুলির দৃপ্ত ভঙ্গী, দীপ্ত তেজ, প্রবল আবেগ সহজেই অন্যান্য শ্রেণীর গানের সঙ্গে এদের স্বাতন্ত্র্য সূচিত করে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে যে ভ্রাতৃপ্রেমের কথা বলা হয়েছিল—

> "ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে
> প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া"

স্বদেশী গানের দেশবাসীর প্রতি সম্বোধনসূচক গানগুলি সেই আদর্শের সার্থক রূপায়ণ।

এখানে সম্বোধন কখনও একবচনে, কখনও বহুবচনে। 'তুই', 'তুমি' যেমন আছে, তেমনি 'তোমরা', 'তোরাও' আছে।

(১) "জাগ জাগ সবে ভারতসন্তান।
মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান?" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)

১। ৩৫০টি গানের মধ্যে ১২৪টি গান দেশবাসীকে সম্বোধন করে রচিত।

২। দেশবাসীর প্রতি সম্বোধনের সাধু ও লৌকিক—দু'টি রূপই আছে

(লৌকিক)	(সাধু)
ভাই, ভেইয়া, ক্ষ্যাপা, রে, ওরে, তুই, তোরা, হিন্দুমুসলমান, ভারতবাসী, বঙ্গবাসী ইত্যাদি।	ভারতসন্তান, ভারতসন্ততি, আর্য, দেশের সন্তান। সংখ্যাবাচক শব্দ—যেমন, "তেত্রিশ কোটি আজি হও প্রবুদ্ধ।"

(২) "জাগ ভারতবাসি, গাও বন্দেমাতরম্
আজ কোটী কণ্ঠে কোটী স্বরে
উঠুক বেজে মাতরম্।"
(এ্যান্টি পার্টিশন প্রোসেশন পার্টি)

(৩) "কত আর নিদ্রা যাও, ভারত-সন্ততিগণ।
নয়ন খুলিয়া দেখ, শুভ-ঊষা আগমন।"
(প্রতাপচন্দ্র মজুমদার)

(৪) "ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর পরো না।" (মুকুন্দদাস)

এছাড়া আরও কিছু গান আছে, যেখানে স্পষ্ট করে সম্বোধন নেই, তবে দেশবাসীর প্রতি আদেশ উচ্চারিত হতে দেখে, গানগুলিতে যে তাদেরই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তা বোঝা যায়।

যেমন, (১) "শুভ কর্ম পথে ধর নির্ভয় গান" —(রবীন্দ্রনাথ)

(২) "সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে ভ্রমিছ দীন প্রাণে"
(রবীন্দ্রনাথ)

(৩) "এ দেশের দুখে কার না সরে চোখের জল।
... ...
উঠ জাগ সকলেতে, সজীব কর ভারতে,
ভাই ভাই মিলে সব হও একদল।" (নবগোপাল মিত্র)

(৪) "ভারতভূমি সমান আছে ভবে কোন স্থান
ভারতের গুণগান সবে মিলি গাও রে।"
(রাধানাথ মিত্র)

(৫) "ছিন্ন হল বঙ্গ কেন ভাব অমঙ্গল"
—(কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ)

কোনও গান আবার স্বদেশবাসীকে সম্বোধন করে আরম্ভ হলেও শেষে দেশমাতৃকার প্রতি উক্তিতে সমাপ্ত হয়েছে। যেমন,

"শতকণ্ঠে কর গান জননীর পূত নাম
মায়ের রাখিব মান—লয়েছি এ মহাব্রত।"

গানটির শেষ দুই চরণে আবার রয়েছে—

"নমো নমো বঙ্গভূমি, মোদের জননী তুমি,
তোমার চরণে নমি নরনারী মোরা যত।" (স্বর্ণকুমারী দেবী)

দেশবাসীকে সম্বোধন করে রচিত গানের একটি ধারায় যেমন সাধারণ মানুষকে দেশাত্মবোধে উদ্দীপিত করার চেষ্টা, তেমনি আর একটি ধারায় দেশের মহান ব্যক্তি, দেশপ্রেমিক নেতা বা দেশোদ্ধার-ব্রতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন। মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্যে রচিত গান—

"ও চরণ বন্দি প্রণমি হে গান্ধি।
মহাত্মার উদ্দেশে করি নমস্কার।"[১]

এই শ্রেণীর গানের গঠনেও অভিনবত্ব আছে। কবি-গীতিকার ব্যক্তিমহিমার বর্ণনা না করে বা সরাসরি দেশবরেণ্য নেতাকে সম্বোধন না করে, দেশজননীর প্রতি স্বদেশপ্রেমিক, আত্মদানে অধীর সাধকের কথোপকথনের মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে দেশসেবার আদর্শ তুলে ধরেছেন। স্বদেশের প্রতি ভক্তের শ্রদ্ধা, মমতাবোধ—তাঁরই জবানীতে অভিব্যক্ত। এই প্রসঙ্গের অতি পরিচিত গান হ'ল ক্ষুদিরামের জবানীতে অজ্ঞাত কবি র রচিত—"একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।"

বাংলা দেশপ্রেমের গানের আর এক শ্রেণী হ'ল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে রচিত। ঈশ্বরের কাছে মানুষের আদিম প্রার্থনা ছিল শস্যের, আত্মরক্ষার ও শত্রু হননের। ভারতবর্ষের কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে ঈশ্বরের কাছে দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য ও তার প্রতিকারের কথা এই প্রথম এবং নানা অর্থে এই গানগুলি তাই অভিনব।

ঈশ্বরকে সম্বোধন করে রচিত গানগুলিকে আবার তিনটি উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। প্রথম শ্রেণীর গানে ঈশ্বরকে সম্বোধন করে বিদেশী শাসকের অন্যায় অবিচার বা পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহারের

১। সরোজিনী দেবী—জাতীয় সঙ্গীত, বরিশাল, ১৯২২, পৃঃ ১২-১৩

বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে।[১] আপাতদৃষ্টিতে এসব গানে আত্মবিশ্বাসের অভাব বা দুর্বলতার চিহ্ন রয়েছে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে দেশবাসী আপন নৈতিক দুর্বলতা, চিত্তের ভয়-সংশয় থেকে মুক্ত হবার জন্যই ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করেছে। কাজেই এই মনোভাবকে ভীরুতার বিপরীত কোটিতে প্রতিষ্ঠিত করা চলে। শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্রোহ বা জাতিবৈরর ভাব থেকেই এই শ্রেণীর গান উদ্ভূত। এসকল গানে ঈশ্বরকে শক্তির আধার জেনেই দেশপ্রেমিক সন্তান তাঁর কাছে শাসকের অন্যায়ের প্রতিকারের আবেদন জানিয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি সম্বোধনসূচক শব্দগুলি, যথা—মুরারি, কালী, চণ্ডী, কৃষ্ণ—বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে দেবদেবী যাঁকেই উদ্দেশ্য করে গানগুলি রচিত, তাঁরই মধ্যে গীতিকার শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গানে ঈশ্বরকে রক্ষক ও পালনকর্ত্তারূপে দেখে তাঁর শরণ নেওয়া হয়েছে। সম্বোধনসূচক শব্দগুলিও কখনও 'ভগবান', 'ঈশ্বর', 'প্রভু', 'জননী' (জগদ্ধাত্রী); কখনও 'সারথি', 'কর্ণধার', 'কাণ্ডারী' প্রভৃতি লোকনায়কের স্বভাবসূচক। রবীন্দ্রনাথের গান—

"আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার।"

তৃতীয় শ্রেণীর গানগুলিতে ঈশ্বর ন্যায় ও সত্যেরই প্রতিরূপ রূপে গৃহীত।

বিধি বা বিধাতারূপে ঈশ্বরকে সম্বোধন এবং বিশ্বসৃষ্টিতে ন্যায়ের বিধানই জয়ী হবে—এই বিশ্বাস গানগুলির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

১। কামিনীকুমার ভট্টাচার্য—"অবনত ভারত চাহে তোমারে, এস সুদর্শনধারী মুরারি"
বিপিনচন্দ্র পাল—"আর সহে না, সহে না, জননী, এ যাতনা।"
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—"দণ্ড দিতে চণ্ড মুণ্ডে এস চণ্ডি!"
(ক্রোড়পত্রী, ৩, দ্রষ্টব্য)

ঈশ্বরকে কোনও মূর্তিকল্পনার দ্বারা প্রত্যক্ষ করে তোলা হয়নি—এটিও গানগুলির অন্যতম লক্ষণ। যেমন,

(১) "এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু তব শুভ আশীর্বাদ—
পাপের নিরখি জয় নিষ্ঠা তবুও রয়
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে।"

(২) "ওহে বিশ্বশোভন মুক্তচেতন মাগিছে ভারত তোমার শরণ"
—(হেমলতা ঠাকুর)

বিধাতাকে সম্বোধন করে রচিত গানের মধ্যে একটিমাত্র গান পাওয়া যায়, যেখানে দেশজননী নিজে বিধাতাকে সম্বোধন করেছেন। এই গানটি দীননাথ ধর রচিত। দেশমাতৃকার উক্তির মধ্য দিয়ে দেশের দুঃখদুর্গতির প্রতি দেশের মানুষেব মনোযোগ আকর্ষণও করা হয়েছে। বিধাতাকে সম্বোধন করেই গানটি শুরু হয়েছে—

"রে বিধি, কেন আমারে নানা রত্ন অলংকারে ভূষিত করিয়াছিলে?
... ...
করিয়ে পরের দাসী পরের অন্ন প্রত্যাশি
তবে কেন ওরে বিধি আগে মান বাড়াইলে।"[১]

৪

আর এক শ্রেণীর গান হ'ল শাসকগোষ্ঠীর প্রতি সম্বোধন। এইরকম গান খুবই স্বাভাবিক। তবে এদের সংখ্যা কম। এসকল গানে স্বদেশভক্ত মানুষের সাহসিকতার পরিচয় রয়েছে। তাছাড়া বিশ্ববিধানের ওপর গভীর আস্থার সুরও ধ্বনিত হয়েছে। শাসকের অন্যায় আচরণে দেশবাসী ক্ষুব্ধ, অপমানিত, এই মনোভাব শাসকবর্গের প্রতি ভর্ৎসনা ও ধিক্কারে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। শাসকশ্রেণীকে স্পষ্ট সম্বোধনে প্রধানতঃ চারটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

১। দীননাথ ধর রচিত, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ উঃ, গা ৩১৮৫ ; জলধর সেন সম্পাদিত, পৃঃ উঃ গা—৯২

'মহারানী' বা 'মা ভিক্টোরিয়া', 'ফুলার', 'নীলকরগণ', 'বিদেশীগণ'। এই সম্বোধনসূচক শব্দগুলির প্রয়োগের মাধ্যমে ইংরাজের প্রতি ভারতবাসীর দ্বিধাপূর্ণ মনোভাবটি পরিস্ফুট। 'মা ভিক্টোরিয়া' সম্বোধনে ইংরাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাব, এবং ফুলার, 'নীলকরগণ', 'বিদেশীগণ'—শব্দগুলিতে অশ্রদ্ধা ও অনাস্থার ভাব স্পষ্ট।

"কোথা গো মা ভিক্টোরিয়া মিনতি করি চরণে
মা হয়ে মা কেমন ধারা সন্তানে না কর মনে।

অনুগ্রহ নাহি চাই যেন সুবিচার পাই—
এই ভিক্ষা তব ঠাঁই করি মা একান্ত মনে।"[১] (অজ্ঞাত)

সুরেন্দ্রচন্দ্র বসুর গানেও অনুরূপ ভাব—

"কোথায় গো মা মহারাণি—আমরা তোমা বিনে কুল দেখিনি,
'মা' বলে মা। সবাই যে তোর মুখের পানে চেয়ে আছে।"[২]

সর্বনাম শব্দ—'তুমি', 'তোমরা' এবং 'তুই', 'তোরা'র প্রয়োগে ভারতবাসীর 'বড় ইংরেজ' ও 'ছোট ইংরেজ'-এর ধারণা—অর্থাৎ ইংরাজ চরিত্রের মহত্ত্ব ও নীচতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণাই প্রকাশ পেয়েছে। ইংরাজের প্রতি মনোভাব যেখানে কঠোর, সেখানে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপপূর্ণ আক্রমণাত্মক ভঙ্গী, সম্বোধন তুচ্ছার্থে 'তুই'। কিন্তু যেখানে ইংরাজের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জানিয়ে অন্যায় প্রতিরোধের চেষ্টা, সেখানে সম্বোধনও অনেক পরিমাণে সম্ভ্রমসূচক, সেক্ষেত্রে 'তুমি', 'তোমরা' সর্বনাম শব্দ ব্যবহৃত। কিছু সংখ্যক গানে শাসকের প্রতি বিরূপ মনোভাবও অতিসংযত প্রকাশভঙ্গী লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' কিংবা 'রইল

১। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূঃ উঃ, গা-৩১৭৯, পৃঃ ৯৯০

২। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পূঃ উঃ, গা—৩১৮০। পৃঃ ৯৯০ ; নরেন্দ্রকুমার শীল সম্পাদিত, পূঃ উঃ, গা—৪৮

বলে রাখলে কারে, হুকুম তোমার ফলবে কবে' গানের শাসকবিদ্বেষ শ্রোতার মনে উত্তেজনার আগুন জ্বালায় না।

অন্য কয়েকটি গানে ইংরেজশাসন দেশবাসীর মনে যে তিক্ততার ভাব জাগিয়েছে, তার ফলে গানগুলিতে বিদ্রূপাত্মক এবং আক্রমণের ভঙ্গী সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। অশ্বিনীকুমার দত্তের—'বিধি কি নিদ্রিত আজি মনে কর বিদেশীগণ'—গানে তার পরিচয় পাই। বিদেশীশাসকের প্রতি ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করেছেন গীতিকার। এই প্রসঙ্গের একটি পরিচিত গান কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের—

"নীতিবন্ধন ক'র না লঙ্ঘন, রাজশক্তি সার প্রজার রঞ্জন।
হইয়ে রক্ষক, হও না ভক্ষক, অবিচারে রাজ্য থাকে না কখন।
করেছ কলুষে এ রাজ্য অর্জ্জন, কলুষ-কল্মসে ক'রো না শাসন,
অবাধে হবে না দুর্ব্বল-দমন, দুর্ব্বলেরি বল নিত্য নিরঞ্জন।"

শাসকবর্গের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা ধিক্কারবাণী উচ্চারণ করেই গীতিকার তাঁর শাসকবিদ্বেষ প্রশমিত করতে পারেন নি। তাঁদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব, সংগ্রামী মনোভাবের কথা উল্লেখ করে শাসকবর্গকে ভীতিপ্রদর্শনও করেছেন।

"সাবধান—সাবধান
... ...
অগণিত করে ঝলসে কৃপাণ তপ্ত রক্ত করিতে পান;
বলদর্পির চরণাঘাতে
ত্রিভুবন ভীত কম্পমান॥"
(হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

৫

সম্বোধন বা কথোপকথনের বিশেষ ভঙ্গী ছাড়াও স্বদেশী গানগুলির মধ্যে আরও দু'রকমের গঠনভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। একশ্রেণীর গান বর্ণনা-বিবৃতিমূলক। সঙ্গীতকার এখানে সাধারণভাবেই দেশের অবস্থা, দেশবাসীর অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এই গঠনভঙ্গীতে রচিত

গানের বিষয়বৈচিত্র্য নগণ্য নয়। কবির চিত্তে স্বদেশানুরাগ নানা অনুভূতির সঞ্চার করেছে। জন্মভূমিপ্রীতি সম্বন্ধে কবির উক্তি—

"কত প্রিয়তম, কে বুঝিতে পারে,
সুখ-জন্মভূমি, জননীসম রে।
শ্যামল সুন্দর, মনচিত্ত-হর,
প্রীতিপূর্ণিত রূপ অনুপম রে।" (আনন্দচন্দ্র মিত্র)

দেশের অবস্থা—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক—সকল অবস্থারই সজীব বর্ণনা পাওয়া যায় এই বিশেষ গঠনের গানে। এই শ্রেণীর মধ্যে 'হিন্দুমেলা' যুগের কয়েকটি গান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

"হায় কি তামসী নিশি ভারতমুখ ঢাকিল।
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল॥"[১]
(উপেন্দ্রনাথ দাস)

দেশমাতৃকার দীনমলিন অবস্থার বর্ণনা ছাড়া আবার দেশের নিসর্গ-শোভা, জাতীয় উন্মাদনা ইত্যাদি এই গানগুলিতে পরিস্ফুট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জাতির ঐক্য দেখে কবিপ্রাণে পরম আশ্বাসবোধ জেগেছে। অন্যান্য গানেও অনুরূপ ভাব দেখি—

(১) "কানে কানে প্রাণে প্রাণে মায়ের নাম আজ কে শুনাল"
(এ্যান্টি পার্টিশন প্রোসেশন পার্টি)

(২) "বন্ধনভয় তুচ্ছ করেছি উচ্চে তুলেছি মাথা" (অভ্যুদয়)

স্বদেশভূমির প্রাকৃতিক শোভাসম্পদের বর্ণনার মধ্য দিয়ে গীতকার পরিতৃপ্তির আস্বাদ পেয়েছেন। যেমন—রজনীকান্তের গান 'শ্যামল-শস্য-ভরা।'

১। এই পর্যায়ের গান—
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের—'সোনার ভারত আজ যবনাধিকারে'
মনোমোহন বসু—'নরবর নাগেশ্বর শাসন কি ভয়ংকর'
রাধানাথ মিত্র—'ভারত যো দীন, সো দীন রে'
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—'আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হ'ল'
(ক্রোড়পত্রী, ৩, দ্রষ্টব্য)

বিবৃতিমূলক গঠনভঙ্গী ছাড়া দ্বিতীয় ভঙ্গীটি হ'ল আত্মকথনের। এই পর্যায়ের গানে আত্মসমালোচনা আছে। দেশের অবনতি ও জাতীয় দুর্বলতার কারণ অনুসন্ধান করা সম্ভব এই সমালোচনার দ্বারা। কবি আর নিরপেক্ষ দর্শক ন'ন—স্বদেশব্রতে তাঁর দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন। বিদেশীবর্জন-স্বদেশীগ্রহণ, পরমুখাপেক্ষা পরিহার, স্বাধীনতার মূল্য রক্ষায় আত্মদানের সংকল্প, দেশের দুর্দ্দশা-মোচনে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা—তিনি উপলব্ধি করেছেন। এসকল প্রসঙ্গে কবির ব্যক্তিগত অভিমত শ্রোতার কাছে স্পষ্ট। 'আমি' 'আমরা' ব্যবহৃত হয়েছে—কবি নিজেকে দেশ ও দেশবাসীর সঙ্গে অভিন্ন করে ভাবছেন। কয়েকটি গানে কবি নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন। যেমন, রবীন্দ্রনাথের গান—"নিশিদিন ভরসা রাখিস্, ওরে মন, হবেই হবে"। যেখানে স্পষ্ট সম্বোধন নেই, সেখানেও আপন মনকে লক্ষ্য করেই উক্তি করা হয়েছে। যেমন—"তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ", "একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন"। এতে সংশয়, সংকোচ কাটিয়ে আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করে উন্নত শীর্ষ হ'য়ে দাঁড়ানোর সাহস সঞ্চিত হয়।

কয়েকটি গান প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গাতে গঠিত। সেখানে কবি নিজেই প্রশ্নকর্ত্তা, নিজেই উত্তরদাতা।

"হবে কি ভারতে পুনঃ এমন সুদিন,
ভারত-সন্তান কি রে হইবে স্বাধীন ?"

কবি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই জিজ্ঞাসার উত্তর গানের শেষের দু'টি চরণেই ব্যক্ত হয়েছে।

"কাঁপিবে বিমান পৃথ্বী, পুনঃ বিক্রমে নবীন,
রহিবে না পুণ্যভূমি চির পরাধীন।"

কোনও গানে আবার কবির জিজ্ঞাসার নেতিবাচক উত্তরই কবির অভিপ্রেত। অচেতন, উদাসীন জাতিকে আঘাত দ্বারা সচেতন করে

তোলার উদ্দেশ্যেই এই ভঙ্গী গৃহীত হয়েছে। নজরুলের

"গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ওই,
বহিয়া চলেছে আগের মত
কই রে আগের মানুষ কই ?
... ...
নাহি তার সাথে সেই ধ্যানী ঋষি
আমরাও আর সে-জাতি-নই।"

গানের গঠনভঙ্গীও কতক পরিমাণে গানের বিষয়, চিন্তা ও ভাববস্তুর ওপর নির্ভর করে। বর্ণনামূলক গানে দেশের অতীত গৌরব মহিমা প্রচার করা বা বর্তমান দীনমলিন অবস্থার চিত্রাঙ্কন অপেক্ষাকৃত সহজ। কথোপকথনের ভঙ্গীতে রচিত গানে দেশের অবস্থা দেশ-বাসীর মনে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রচয়িতার মনের যে কোনও অনুভূতিই এতে স্পষ্ট আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। প্রথম গঠনভঙ্গীতে শুধু দেশের স্বরূপ উদ্ঘাটিত; দ্বিতীয় ভঙ্গীতে দেশও বর্তমান, তবে দেশের মানুষের স্বরূপটি অধিকতর গুরুত্ব পায়। স্বদেশী গানের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে হিন্দুমেলা যুগে প্রথম গঠনভঙ্গীর গানের প্রাধান্য, স্বদেশী ও পরবর্তী যুগে দ্বিতীয় ভঙ্গীর প্রাধান্য। আত্মকথনের ভঙ্গী অবশ্য উভয় যুগেই মর্যাদা লাভ করেছে।

এইসকল সুনির্দিষ্ট গঠনভঙ্গীর অতিরিক্ত আর একটি পর্যায়েও স্বদেশী গানকে বিন্যস্ত করা চলে, তা হ'ল মিশ্ররীতির গান। যেমন, স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত একটি গান:

"লক্ষ ভায়ের দাঁড়ের টানে ভাসলো রণতরী,
ভাবনা কি আর হবই ত পার, তুফানে কি ডরি।"

আত্মকথনের ভঙ্গীতে আরম্ভ হলেও গানটিতে পরে দেশবাসীর সঙ্গে কথোপকথনের ভঙ্গীতে যুক্ত হয়েছে।

"তপ্ত রক্ত শিরায় জাগে,—নাম্‌রে কূলে চল্‌রে আগে,
দাঁড়াই গিয়ে পুরোভাগে—অরির প্রতাপ হরি।"

আত্মকথনের ভঙ্গীতে রচিত স্বদেশী গানের মধ্যে আর একধরণের গানের কথা উল্লেখ করা দরকার। এই গানগুলি ঐতিহাসিক পরিবেশে রচিত। ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা, স্থান ইত্যাদির স্মৃতি কবিপ্রাণে কখনও গর্ব, কখনও বিষাদের অনুভূতি জাগিয়েছে।[১] এসকল গান শ্রোতা বা পাঠকের চিত্তেও কখনও স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনা জাগায়, কখনও বা স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাকে গভীর করে তোলে।

৬

স্বদেশী গানের বহিরঙ্গ গঠনের পরেই বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য তার কবিভাষা। স্বদেশী গানের কবিভাষার দু'টি দিক আছে, একটি হ'ল ভিন্ন ভিন্ন কবির diction, খুবই স্বাভাবিক যে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিভাষা রবীন্দ্রনাথ থেকে আলাদা। কিন্তু স্বদেশী গান সংখ্যায় এত বেশী, (যদিও আলাদা আলাদা কবিকে ধরলে এক একজনের গান বেশী নয়) যে এইভাবে দেখলে তাদের সামগ্রিক চেহারা ফুটে উঠবে না। সেইজন্য এখানে কবিভাষার দ্বিতীয় দিকটির ওপর জোর দিচ্ছি। তাহ'ল বিশেষ বিশেষ কবির কবিভাষা নয়, একটি বিশেষ সাহিত্যরূপের—এক্ষেত্রে স্বদেশী গানের কবিভাষা। বলাই বাহুল্য প্রয়োজন অনুসারে কবিবিশেষের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মন্তব্য করা হবে।

১। নজরুল ইসলামের—"হায় পলাশী!
এঁকে দিলি তুই জননীর বুকে
কলংক-কালিমা রাশি
হায় পলাশী॥" (ক্রোড়পঞ্জী, ৩ দ্রষ্টব্য)

ভাষা ভাবেরই বাহন। কাজেই কোন কবিতা বা গানের ভাষা বিচার প্রসঙ্গে ভাব ও ভাষার সঙ্গতি রক্ষা হয়েছে কিনা—সেটাও বিচার্য। এক্ষেত্রেও গানগুলিকে ভাবের দিক থেকে চিহ্নিত করে, তারপর ভাব ও ভাষায় সামঞ্জস্য কতখানি এবং কিভাবে সার্থক হয়েছে, তা বিচার করে দেখতে হবে। গানে একটিমাত্র ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হলেও একটি গানে একাধিক ভাব মিশ্রিত থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে যে ভাবটি প্রধান, সেটিকে স্বীকার করেই গানটির ভাব ও ভাষার সম্পর্ক বিচার করতে হবে।

স্বদেশী গানের ভাব ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণের জন্য একটা ছক তৈরী করে নিয়ে এবং কয়েকটি গানকে সেই ছক অনুযায়ী বিচার করে দেখলে, বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। এই গানগুলি হ'ল···

১। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি করে।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাংলার মাটি, বাংলার জল।

৩। —এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে

৪। —অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, মা.

৫। অতুলপ্রসাদ—বল বল বল সবে শতবীণাবেণুরবে

৬। —আ মরি বাংলা ভাষা

৭। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—এস দেশের অভাব ঘুচাও দেশে

৮। দ্বিজেন্দ্রলাল—ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা

৯। রজনীকান্ত—মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়

১০। মুকুন্দদাস—বাবু, বুঝবে কি আর মলে ?

১১। নজরুল—কারার এই লৌহকপাট।

অতি পরিচিত এই এগারটি স্বদেশী গানকে গানের বিষয় ও গানের অনুভূতি—এই দুই ভাবে বিন্যস্ত করে দেখা যায়—

বিষয়	গানের অনুভূতি						
	প্রশান্তি	তিক্ততা	উদ্দীপনা	বিষণ্ণতা	বিদ্রূপ	বেদনা	গর্ব
দেশের বর্তমান		১০	৩, ৭, ১১	১	১০	৭, ৯, ১০, ১১	
ভবিষ্যতের স্বপ্ন			৫				
অতীতের গৌরব							৫
দেশের প্রকৃতি	২, ৪, ৮		২				৪
মাতৃভাষা							৬
স্বদেশী পণ্য			৯				

এই গানগুলির মধ্যে দেশের বর্তমান সম্পর্কিত গান হ'ল ১, ৩, ৭, ৯, ১০, ১১। এর মধ্যে ১ নং ও ৩ নং গানে একটি করে ভাব—যথাক্রমে বিষণ্ণতা ও উদ্দীপনা ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে, ১০ নং গানটিতে তিনটি ভাব—তিক্ততা, বেদনা ও বিদ্রূপ প্রকাশ পেয়েছে। একই বিষয়ের অন্তর্গত হলেও গানের অনুভূতির এই পার্থক্যের ফলে বিভিন্ন গানের ভাষা ব্যবহারও ভিন্ন হয়েছে।

১ নং গানে গীতিকার দেশের অতীত সম্পদের সঙ্গে বর্তমানের দৈন্য তুলনা করে দেখে, দেশের দুর্দ্দশার জন্য নিজেদের এবং বিদেশী শোষণকে দায়ী করেছেন। এই গানে অতীত ঐশ্বর্য সম্বন্ধীয় রত্নের আকর, রতন, ধন ইত্যাদি শব্দ; যতন, সাধনা, হেলা, অবহেলা, আমোদ প্রভৃতি শব্দ—দেশের দুর্দ্দশার কারণরূপে দেশবাসীর আচরণ সম্বন্ধে; দেশান্তর-জনগণ, পর, লুঠ—ইত্যাদি দ্বারা বিদেশী শোষণের ভাব পরিস্ফুট করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। কবির বিষণ্ণতার বোধ 'লজ্জা'র মধ্যে প্রকাশিত।

৩ নং গানের 'উদ্দীপনা'র ভাব মরাগাঙ, বান, তরী, মাঝি, বৈঠা, দড়াদড়ি, দেনা, বেচাকেনা—ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।

১০ নং গানে বিদেশী শোষণের তিক্ততা ফুটিয়ে তোলার উপযোগী ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক ভাষা—'সাদা ভূত', 'শ্বেত ইঁদুর', 'ফিরিঙ্গী'; ইংরিজি বাংলা মিশ্রিত আপাতলঘু, ব্যঙ্গ-কৌতুকের উপযোগী শব্দ —'সেটিস্‌ফাইড্‌', 'লাইক করিলি', ইত্যাদি।

মাতৃভাষা নিয়ে যেখানে (৬ নং গান) কবি 'গরব' বোধ করেন, সেখানে 'আ মরি', 'কি যাদু' 'মধুর রস' 'চরণতীর্থ' 'ফুল' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত। স্বদেশী পণ্য 'মায়ের দেওয়া', তাই ভক্তিভরে 'মাথায় তুলে' নেবার সংকল্প করেছেন গীতিকার (৯ নং গান)।

গানের ভাব ও ভাষার বিশ্লেষণের মধ্যে কবিমনের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। দেশের বর্তমান দীনমলিন অবস্থা দেখে কবি দেশবাসীকে স্বাদেশিকতার মন্ত্রে উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন। এই একই আবেগ রবীন্দ্রনাথের গানে মাধুর্যমণ্ডিত উৎসাহের ভাব জাগিয়ে তুলেছে, মুকুন্দদাসের গানে তিক্ততা ও বেদনাবোধ মিশ্রিত হয়েছে, কালীপ্রসন্নের গানে বেদনাবোধ ও উদ্দীপনাবোধ মিশ্রিত, আবার নজরুলের গানের উদ্দীপনা, দৃপ্ত তেজ, সংগ্রামী মনোভাব সুস্পষ্ট। কবিমানসের বৈশিষ্ট্য বিচারের নানা পদ্ধতি অবশ্যই আছে। কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ বা লক্ষণ যেখানে ধরা পড়ে তা মূলত ভাষা ব্যবহারে। আমরা সেজন্য স্বদেশী গানে ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্টগুলি লক্ষ্য করব এবং স্বদেশী গানের ভাষা ব্যবহারের সামান্য লক্ষণগুলি দেখতে চেষ্টা করব।

স্বদেশী গানে গম্ভীর ও লৌকিক—দুই প্রকার ভাবের গানেরই সমাবেশ হয়েছে। স্বভাবতঃই এই দুই রকমের ভাষা রীতিতেও গাম্ভীর্য ও লৌকিকতার চিহ্ন বর্তমান। প্রথম শ্রেণীর গানের ভাবাদর্শ গম্ভীর। তদনুযায়ী তাদের ভাষাশৈলীও অনেক বেশী গম্ভীর ও

অলংকৃত। বঙ্কিমের "শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্"—গানের ভাষাই
সংস্কৃত। বাংলা গান থেকে উদাহরণ দেওয়া যাক—

(১) "আজি এ ভারত লজ্জিত হে,
হীনতাপংকে মজ্জিত হে॥
নাহি পৌরুষ, নাহি বিচারণা, কঠিন তপস্যা, সত্যসাধনা—
অন্তরে বাহিরে ধর্মে কর্মে সকলই ব্রহ্মবিবর্জিত হে॥"
(রবীন্দ্রনাথ)

(২) "বন্দি তোমায় ভারত-জননি, বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি
বর-পুত্রের তপ অর্জিত গৌরব-মণি-মালিনী।
কোটি সন্তান-আঁখি-তর্পণ-হৃদি-আনন্দ-কারিণি
মরি বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি।
যুগযুগান্ত তিমির-অন্তে হাস মা কমল-বরণি!
আশার আলোকে ফুল্ল-হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরনী॥"
(সরলা দেবী)

(৩) "সদ্যঃ স্নান-সিক্তবসনা চিকুর সিন্ধুশীকর লিপ্ত!
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল কমল-আনন দীপ্ত;"
(দ্বিজেন্দ্রলাল)

এইসব গানে তৎসম শব্দের প্রাচুর্য, সমাসবদ্ধ শব্দের বিশেষণ পদে বহুল প্রয়োগ, অনুপ্রাসের বাহুল্য—সংস্কৃতায়িত ভাষাশৈলীর পরিচায়ক। সংস্কৃত উপমার প্রভাবও এই রীতিতে বর্তমান। দেশমাতৃকার প্রতি সম্ভাষণ[১] এবং দেশের বিশেষণ শব্দগুলিতে সংস্কৃতায়িত ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যে গানের ভাব গম্ভীর, ভাষা সংস্কৃতায়িত, ছন্দও সংস্কৃত প্রভাবিত, সেখানে উপমাও

১। জগত্তারিণি, জগন্মোহিনী, জগজ্জননী, ধাত্রী, (দ্বিজেন্দ্রলাল), ভারতলক্ষ্মী, বিশ্ববন্দিতা, ভারতজননী, কল্যাণী (নজরুল) কুলকুণ্ডলিনী, দানবদলনী, শ্যামা, মাতঙ্গী (মুকুন্দদাস) খর্পরকরবাঙ্গিনি, শৌর্য্যবীর্য্যশালিনি, (সরলা দেবী)।

সংস্কৃতানুসারী, তুলনামুলক উল্লেখও পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক। পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনার উল্লেখের ফলে গানের বিষয়বস্তুর অতি পরিচয়ের ভাব দূরীভূত হয়। এদের কল্পনাসমুন্নতি ভাব ও ভাষার সমুন্নতির সঙ্গে ঐক্য রক্ষা করে গানগুলির মধ্যে গাম্ভীর্যের গুণ সঞ্চার করে।

আবার দুঃখ-দৈন্য, অপমান-লাঞ্ছনায় পীড়িত দেশের দুর্দ্দশা প্রতিকারের উদ্দেশ্যে দেশবাসীকে স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য কবি যেখানে সচেষ্ট, সেখানে দেশবাসীর সঙ্গে কবির কথোপকথনের ভাষাও লৌকিক। পরিচিত বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা-নির্ভর এসকল গান লৌকিক ভাষার বাহন ছাড়া আত্মপ্রকাশে অসফল হতো। সংস্কৃতায়িত রীতির শব্দ—যথা, 'বৈধকার্য্য', 'শোণিত', 'অগৌরব', 'পূর্ব গর্ব সর্ব খর্ব',—প্রভৃতির সঙ্গে এই রীতির লৌকিক শব্দ, যথা, 'খোসাভূষি', 'বাকল-টেনা', 'ছেঁড়া-টেনা', 'ফতে', 'ফক্‌কিকারী', 'নিরেট মন্দ', 'উনিশবিশ'—ইত্যাদির তুলনা করলেই ভাষার লৌকিকতার স্বরূপ বোঝা যাবে। লৌকিক ভাষার ক্ষেত্রেও আবার দু' ধরণের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, নৈতিক শক্তির অভাব, জাতির চরিত্রগত দুর্ব্বলতাকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে রচিত গানের আপাতলঘু বাগ্‌ভঙ্গীর জন্য কৌতুক, ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন, মুকুন্দদাসের—

"বাবু, বুঝবে কি আর মলে ?
কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে, একদম দফা সারলে ॥
খেতে ভাত সোনার থালে,
নাউ সেটিস্‌ফাইড্ স্টীলের থালে,
তোদের মত মূর্খ কি আর দ্বিতীয়টি মেলে।
পমেটম লাইক করিলি, দেশী আতর ফেলে—
সাধে কি তোদের দেয় রে গালি,
ব্রুট, নন্‌সেন্স ফুলিশ বলে।"

এই গানের আপাতলঘু ভঙ্গীর মধ্য দিয়ে দেশবাসীর প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, চারিত্রিক অবনতিতে কৌতুকবোধ হওয়ায় ভাষা ব্যবহারও সার্থক। বাংলা ও ইংরাজী শব্দের মিশ্রণ, সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ, কখনও বা হিন্দীতে এই শ্রেণীর গান রচিত। রবীন্দ্রনাথ কিংবা দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলিতে যে কৌতুকরস উচ্ছ্বসিত হয়েছে, এসব গানে তার স্পর্শ পাওয়া যায়, কিন্তু গানগুলির উদ্দেশ্য নিছক কৌতুক সৃষ্টি নয়। চিন্তা বা ভাবের গুরুত্ব বাদ দিলেও শুধু প্রকাশভঙ্গীর সরসতার জন্যই এসব গান শ্রোতা বা পাঠকের কাছে হৃদয়গ্রাহী বলে বিবেচিত হবে।

লৌকিকভাবের আর এক শ্রেণীতে কিছু গান আছে, যেগুলি ভাবের গভীরতায় কৌতুকাবহ গানের থেকে স্বতন্ত্র।

পরাধীন অবস্থা থেকে দেশমাতৃকাকে উদ্ধারের আদর্শ নিয়ে দেশবাসীর কাছে কবি যে আবেদন জানিয়েছেন বা আদেশ করেছেন, তাতে কখনও করুণ, কখনও বীর্যভাব ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে রজনীকান্তের কয়েকটি গান বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁর

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই",

অথবা— "আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট,
তবু, আজি সাত কোটী ভাই, জেগে ওঠ।"

স্বদেশী কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত তাঁর গানগুলিতে প্রাত্যহিক জীবনের শব্দ ব্যবহার উল্লেখযোগ্য এক বৈশিষ্ট্য, যেমন—কলার পাত, শুধু ভাত, ঝগড়াঝাটি, কান্নাকাটি, মন লাগিয়ে শোনা। বিদ্রূপাত্মক গানের লৌকিকভাবের সঙ্গে এই গানগুলির ভাব ও ভাষার পার্থক্য সুস্পষ্ট।

বলাই বাহুল্য, লৌকিক শব্দ ব্যবহারের মধ্যে দিয়েও মহৎ চিন্তা ও গভীর ভাব প্রকাশিত হতে বাধা নেই। রবীন্দ্রনাথের নানা গানই তার প্রমাণ। যেমন—

"একটা কিছু করে নে ঠিক, ভেসে ফেরা মরার অধিক—
বারেক এদিক বারেক ওদিক, এখেলা আর খেলিস্ নে ভাই॥

মেলে কিনা মেলে রতন করতে তবু হবে যতন
না যদি হয় মনের মতন চোখের জলটা ফেলিস নে ভাই !
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা, করিস নে আর হেলাফেলা—
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা, তখন আঁখি মেলিস নে ভাই।"

তবুও স্বদেশী গানের ভাব ও ভাষার পারস্পরিক সম্বন্ধটি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দেখা গেল যে গানের ভাব অনুযায়ী ভাষা কখনও সংস্কৃতায়িত, কখনও লৌকিক। স্বদেশী গানের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল যে ভারতবর্ষ সম্পর্কিত গানের ভাষা সংস্কৃতায়িত, বাংলাদেশ সম্পর্কিত গানের ভাষায় লৌকিকতার সুর। যেমন, ধরা যাক,—

গীতিকার	সংস্কৃতায়িত রীতির ভাষা	লৌকিক ভাষা
রবীন্দ্রনাথ	"ভারততীর্থ" ধ্যানগম্ভীর, ভূধর, নদীজপমালা-ধৃতপ্রান্তর, ধরিত্রী, তীর্থনীর, পুণ্যতীর্থ	"সোনার বাংলা" আকাশ-বাতাস, ফাগুন, ভরা-ক্ষেত, আঁচল, বটের মূল, নদীর কূল, বদন, খেলাঘর, ধূলামাটি, দীপ, আঙিনা, খেয়াঘাট, ফাঁসি, ধূলা
রজনীকান্ত	"জয়, জয় জনমভূমি, জননি !" স্তন্যসুধাময়, শোণিতধমনী, কীর্তিগীতিজিত, স্তম্ভিত, উজ্জ্বল-কানন-হীরকমুক্তা, মণিময়হার-বিভূষণ-যুক্তা, সর্ব-শৈল-স্থিত, হিমগিরি শৃঙ্গে, মধুর-গীতি-চির-মুখরিত ভৃঙ্গে, সঞ্চিত-পরিণত-জ্ঞান-খনি	"আমরা নেহাৎ গরিব" নেহাৎ গরিব, নেহাৎ ছোট, জুড়ে ঘরের তাঁত, গোলার ধান, মোটা-খাওয়া, উপোসী, টুন্‌কো কাচ, খেলনা, ল্যাভেণ্ডার, অটো

নজরুল

"কাণ্ডারী হুঁশিয়ার"
দুর্গম গিরি, কান্তার, দুস্তর পারাবার, নিশীথ, তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী শান্ত্রী, যুগযুগান্ত, সঞ্চিত, পুষ্পিত

"আমার শ্যাম্‌লাবরণ কাঙলামায়ের রূপ"
শ্যাম্‌লাবরণ, গিরি-দরী-বনে-মাঠে, কালো মা, ভাটিয়ালী, পথের বাঁক, বীণ্‌, কাদা, খড়, মাটী, কাজলমেঘ, ঝারি, কাজ্‌লা দীঘি, পথের নুড়ি, কাঁকন চুড়ি, গাঙ, ঝিল্লি

অতুলপ্রসাদ

"ভারত ভানু কোথায় লুকালে"
দেবকান্তি, পুরুষ অবরুদ্ধ বীরেন্দ্রসুর দানবারি, বীর্য বিড়ম্বিত খলকোলাহল, ভেঙ্গে আত্মঘাতী

"প্রবাসী চল্‌রে দেশে চল"
ঘুমপাড়ানো বুক, পীরের সিন্নি, গাজির গান, খেত-ভরা সব ধান, গাঙের জল, পৌষ মাসের পিঠা

যখন বাংলাদেশ গানের বিষয়, তখন গানের ভাষা সংস্কৃতরূপ বর্জন করে অনেক পরিমাণে লৌকিক হ'য়ে উঠেছে। চিত্রকল্প ব্যবহারেও এই দুই রীতির বিভিন্নতা লক্ষণীয়। সংস্কৃতায়িত রীতির চিত্রকল্প প্রাচীন, পৌরাণিক, মহান; অন্যদিকে লৌকিক রীতিতে প্রাত্যহিক, পরিচিত জীবনের ছবি পরিস্ফুট।

দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অভিভূত একই কবি রচিত দু'টি গানের তুলনা করলে এই মন্তব্যের যাথার্থ খুঁজে পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' ও 'সোনার বাংলা' গান দু'টি যথাক্রমে ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের নিসর্গশোভার বন্দনা। কিন্তু প্রথম গানটিতে দেশমাতৃকা দেবীরূপে উদ্ভাসিত—

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, মা
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরনী জনকজননিজননী।
নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল, অনিল বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচল, শুভ্রতুষার কিরীটিনী।"

দ্বিতীয় গানটিতে দেশমাতৃকা জননীরূপে, মানবীরূপে আবির্ভূত। বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস ইত্যাদির কোন মহিমময় রূপকল্পনা

এখানে করা হয়নি। এই গানের 'ফাগুনের আমের বন', 'অঘ্রাণের ভরাক্ষেত', 'বটের মূলের ছায়া ও শোভা' আগেকার গানের 'ধ্যানগম্ভীর ভূধর', 'নদীজপমালাধৃতপ্রান্তর' ভাবনার বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। যে অর্থে ভারত তীর্থ, সে অর্থে বঙ্গভূমি তীর্থ নয়। সোনার বাংলার মানুষের কাছে তা 'খেলাঘর'—সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে আপন। তার 'ধুলামাটি অঙ্গে মাখি' কবির জীবন ধন্য হয়। 'সন্ধ্যাকালের দীপ-জ্বালানো ঘর', 'ধেনুচরা মাঠ', 'পারে যাবার খেয়াঘাট', পাখি-ডাকা ছায়ায় ঢাকা পল্লীবাট, ধানে ভরা আঙিনা, দেশের রাখাল, চাষী—সব নিয়েই বাংলার প্রকৃত স্বরূপটি ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশে যা আছে, তার সামান্য, তুচ্ছ উপকরণের প্রতিও কবিহৃদয় গভীর মমতা ও ভালোবাসা উপলব্ধি করেছেন। দেশকে 'মাগো' এই লৌকিক সম্বোধন এই কারণেই সম্ভব হয়েছে। একই কবির একই বিষয়ের দু'টি গানের ভাষা-ব্যবহারের পার্থক্য দুই শ্রেণীর ভাষারীতির পরিচায়ক।

লৌকিকভাবের গানে প্রাচীন গৌরবমহিমাব্যঞ্জক উল্লেখের ব্যবহার নেই। অন্যদিকে সংস্কৃতায়িত রীতির ক্ষেত্রে এটি অতি পরিচিত পদ্ধতি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ রায়, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, সরলা দেবীর গানে ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্যগৌরব প্রকাশের জন্য যেসব পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক উল্লেখের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত মানুষের কাছে তাদের আবেদন নেই। বুদ্ধদেবের 'মোক্ষদ্বার' মুক্ত করার সাধনা, অশোকের রাজত্বকালে 'গান্ধার হ'তে জলধিশেষ' পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার, 'নিমাইকণ্ঠে মধুর তান', রঘুমণির ন্যায়ের বিধান, চণ্ডীদাসের পদাবলী রচনা, প্রতাপাদিত্যের রণচাতুর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনা ; ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভৃগু, ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি পৌরাণিক উল্লেখ ভারতবর্ষের অতীত গরিমার সাক্ষ্য দেয় সন্দেহ নেই কিন্তু এসব ব্যক্তি বা ঘটনার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, এসব গান তাদের প্রাণে কোন সাড়া জাগাতে পারে না।

যেসব গানে অর্থনৈতিক শোষণ বা স্বদেশী কর্মপদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, সেখানে কাব্য-ভাষা সর্বত্রই লৌকিক, শব্দও সহজ। প্রাত্যহিক, দৈনন্দিন জীবনের বাক্‌ভঙ্গী।

(১) "ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী
কভু হাতে আর প'রোনা।" (মুকুন্দদাস)

(২) "আমাদের পিতল কাঁসা, ছিল খাসা
কাজ চালাতেম কলার পাতে।
এখন এনামেলে মাথা খে'লে
কলাই করার ব্যবসাতে ॥
এখানে পরশপাথর পায় না আদর
চটা উঠ্‌ছে পেয়ালাতে।
যত ঠুন্‌কো পল্‌কা দরে হাল্‌কা
দ্বিগুণ মূল্য পাল্‌টে নিতে ॥" (কালীপ্রসন্ন)

(৩) "জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান,
বিদেশে না যায় ভাই, গোলারি ধান;
মোটা খাব ভাইরে পরব মোটা,
মাখবো না ল্যাভেণ্ডার, চাইনে অটো ॥" (রজনীকান্ত)

স্বদেশী গানের ভাষাবিচার করে দেখা গেল যে, এই শ্রেণীর গানের ভাষাগত কিছু লক্ষণ রয়েছে, যা দিয়ে বাংলা গানের অন্যান্য শ্রেণীর রচনা থেকে স্বদেশী গানকে পৃথকরূপে চিহ্নিত করা চলে। যেমন ধরা যাক্—'মা' বা মা-বাচক 'মাতৃ' মাতা, জননী প্রভৃতি শব্দের বহুল ব্যবহার।[১] বিশেষ কতকগুলি সংখ্যাবাচক শব্দের প্রয়োগও লক্ষণীয়। 'সপ্তকোটি' 'ত্রিংশকোটি' 'ত্রিশ কোটি', 'বিশ কোটি'—শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।[২] 'কোটি' শব্দ দেশবাসী প্রসঙ্গে বহুল প্রযুক্ত, 'সহস্র' শব্দ সামান্য ব্যবহৃত।

১। 'মা' শব্দটির ব্যবহার ১৯৮ বার, 'মাতা'—১১; 'জননী'—৩৫; ভারত—৯৮ বার; জন্মভূমি—৬; বঙ্গভূমি বঙ্গ—১৮

২। 'কোটি শব্দ ১৮ বার ব্যবহৃত। সহস্র রবীন্দ্রনাথের গানে
"আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়
আমরা সহস্র প্রাণ, রহিব নির্ভয়।"

বিশেষ্য শব্দগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দেশের বর্তমান সম্বন্ধীয় শব্দ 'অন্ধকার', 'দুঃখ'; ভবিষ্যৎ-সম্পর্কিত 'আলো' 'জয়' 'ধর্ম', দেশবাসী-সম্পর্কিত শব্দ, 'কণ্ঠ' 'কার্য', 'গান', 'জন'; দেশমাতা বা দেশবাচক শব্দ—ভারত, ভারতবর্ষ, বাংলা, বঙ্গভূমি, 'আর্যভূমি' 'জন্মভূমি' 'দেশ', 'স্বদেশ'—প্রভৃতি ব্যবহৃত।

বিশেষণ শব্দগুলির মধ্যে প্রধানতঃ দেশ এবং দেশবাসীর অবস্থাজ্ঞাপক শব্দ আছে। এই শব্দগুলি সাধারণতঃ দুঃখবেদনা অথবা আশা উৎসাহের ব্যঞ্জনাদ্যোতক। এই শ্রেণীতে পাই 'নীরব' 'নিদ্রিত' 'নত' 'ভিখারিণী' প্রভৃতি শব্দ; অন্যদিকে রয়েছে 'জাগ্রত', 'বীর' 'রাজরানী', প্রভৃতি শব্দ। বিশেষণ শব্দগুলির মাধ্যমে দেশ ও দেশবাসীর অবস্থাবৈপরীত্যের পরিচয় পরিস্ফুট। শব্দগুলিকে দু'ভাগে বিন্যস্ত করে দেখা যেতে পারে—

গীতিকার	"উজ্জ্বল" বিশেষণ	"মলিন" বিশেষণ
রবীন্দ্রনাথ	হৃদয়হরনী, রৌদ্রবসনী, চির-কল্যাণময়ী, ধন্য, রানী, ভুবন-মনোমোহিনী	অভাগা, অসহায়, অভাগিনী অনাথিনী, লজ্জাহীন, দুঃখিনী,, নিশ্চল, নির্বীর্যবাহু, কর্মকীর্ত্তি-হীন, নিরানন্দ
রজনীকান্ত	পুণ্যময়ী, সুশোভিত, ধূর্জটি-বাঞ্ছিত, হিমাদ্রিমণ্ডিত, জগত-মান্যা, শুভংকরী, রাজরাজেশ্বরী, বরদা	দীনদুখিনী, ভিখারিনী, গরীব, ছোট, অধম, দুঃখী
দ্বিজেন্দ্রলাল	চিরগরীয়সী, উচ্চ, সুজলা সুফলা, মহিমাময়ী, গরিমাময়ী, পুণ্যময়ী, রানী।	মলিন, রুক্ষ, শুষ্ক
মুকুন্দদাস	দয়াময়ী, তারিণী, কাণ্ডারী	অভাগিনী, কাঙালিনী
নজরুল	জাগ্রত, বন্দিতা, কল্যাণী, লক্ষ্মী, রাজরানী, সোনারদেশ, নন্দিতা, রানী, মহিমাময়ী।	নিদ্রিত, ভিখারিনী, ভীরু, কালো
অন্যান্য	রূপসী, শ্রেয়সী, বীরযোনি, সন্তানশালিনী, জগত-আলো।	লৌহশৃংখলিত, কাঙ্গালিনী, পরাধীন, জীর্ণ, দীন, শীর্ণ, ক্ষীণ, অবনত, দাস, পরবাসী, শৃংখলাবদ্ধ, শ্মশান, দুখী

সমাসবদ্ধ শব্দগুচ্ছের ব্যবহার স্বদেশী গানের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই শব্দগুচ্ছের মধ্য দিয়েও দেশের ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং হৃতশ্রী, দীনমলিন রূপ প্রকাশিত। যেমন, 'শ্যামল-শস্য-ভরা', 'কমল-কনক-ধন-ধান্য', 'কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ' 'অমল-কমল-আনন-দীপ্ত' রূপ আছে, তেমনি 'কাল-সাগর-কম্পন', 'দুঃখ-লাঞ্ছিত', 'ভারতশ্মশান'—প্রভৃতিও রয়েছে।

৭

ভাষা ব্যবহারের মতোই স্বদেশী গানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে চিত্রকল্প ও উপমা প্রয়োগে। চিত্রকল্প বিচার করতে গিয়ে দেখা যায়, দু'ধরণের চিত্রকল্প ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমতঃ মাতৃমূর্তি, দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃতিক।

স্বদেশী গানে জন্মভূমি মাতৃরূপে কল্পিত। বাংলা স্বদেশীগান মূলত রণসংগীত বা স্বদেশের বিজয়গাথা নয়। কবিরা গানের মধ্য দিয়ে মাতৃভূমি বন্দনার মন্ত্র রচনা করেছেন। এই দেশ জননীর বিভিন্ন মূর্তির পরিকল্পনা সংগীতকারদের চিত্রকল্প রচনার কৌশলের পরিচয় বহন করে। মাতৃমূর্তি কখনও দেবীরূপে, কখনও বা মানবীরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। দেবীরূপে কল্পিতা মাতৃমূর্তির চিত্রকল্পও বিচিত্র। দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, শ্যামা, মাতঙ্গী—প্রভৃতি রূপে তিনি কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও আভাসে উপস্থাপিত হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের গানে—

"ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিনী
কমলা কমল-দল-বিহারিনী
বাণী বিদ্যাদায়িনী ... "

দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী—এই ত্রয়ীরূপে স্বদেশ প্রত্যক্ষ। দুর্গামূর্তির স্পষ্ট আর একটি চিত্রকল্প পাই কালীপ্রসন্নের গানে। চণ্ড-মুণ্ড-বিনাশিনী, শুম্ভনিশুম্ভের গর্বহরণ-কারিনী, রক্তবীজ-নাশিনী

দেবী চণ্ডীকে তিনি মহিষাসুরমর্দ্দিনী, দুর্গারূপে আবির্ভূত হবার প্রার্থনা জানিয়েছেন।

"দশ দিকে হরপ্রিয়া, দশভুজ প্রসারিয়া—
ভূভার হরণ কর নাশিয়া মহিষাসুরে।"

আবার নজরুল ইসলামের গানের ভারতলক্ষ্মীর রূপের মধ্যে দুর্গা-মূর্তিরই প্রতিভাস লক্ষ্য করা যায়। অস্পষ্টভাবে হলেও, ভারত-মাতাকে ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা দেবীদুর্গার বোধন, বিজয়া, বিসর্জন ইত্যাদি শব্দের অনুষঙ্গ সৃষ্টির মাধ্যমে আভাসিত হয়েছে।

লক্ষ্মীর মূর্তিতেও দেশমাতৃকা বহু গানে চিত্রিত হয়েছেন। সমুদ্রমন্থনকালে সাগরোত্থিতা লক্ষ্মীর উদ্ভবের চিত্রটি স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে নজরুলের গানে।

"লক্ষ্মী মা তুই আয় গো উঠে সাগর-জলে সিনান করি।
হাতে লয়ে সোনার ঝাঁপি, সুধার পাত্রে সুধা ভরি॥"

ক্ষীরোদসাগর-কন্যা, অনন্ত-শয়নে হরি, বাপের বাড়ী অতল-তলে, সিন্ধু-মন্থন, হলাহল, অমৃত—ইত্যাদি শব্দের অনুষঙ্গ লক্ষ্মী-মূর্তিকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী' গানে এই লক্ষ্মীমূর্তি আভাসে চিত্রিত, যদিও 'লক্ষ্মী' শব্দ কোথাও উচ্চারিত হয়নি।

স্বদেশী গানে কখনও কখনও দেশ শ্মশানবাসিনী, ভীষণা কালীমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন।[১] রবীন্দ্রনাথের গানে মাতৃভূমির কালীরূপ আভাসে ব্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের হৃদয় থেকে যে

১। অশ্বিনীকুমার দত্তের গান—
"শ্মশান তো ভালোবাসিস মাগো, তবে কেন ছেড়ে এলি?"
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—"জাগো শ্যামা জন্মদে!"
বিপিনচন্দ্র পাল—"দানবদলনী-ত্রিদিবপালিনী-করালকৃপানী তুমি মা",
(ক্রোড়পত্র, ৩ দ্রষ্টব্য)

জননীমূর্তি উদ্ভাসিত হয়েছে, তিনি সোনার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা দেবী কালী। সেই দেবীমূর্তির—

"ডান হাতে তোর খড়্গজ্বলে, বাঁ হাত করে শংকাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুন বরণ।
... ...
তোমার মুক্ত কেশের পুঞ্জ মাঝে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী"—

এই চিত্রকল্প যে ত্রিনয়নী, মুক্তকেশা, স্খলিতবসনা, কালীমূর্তির, তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

দেশজননী মাতঙ্গীরূপে চিত্রিত হয়েছেন মুকুন্দদাসের গানে।

"ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে,
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে॥
তাথৈ তাথৈ থৈ দ্রিমী দ্রিমী দং দং
ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে।
দানব-দলনী হ'য়ে উন্মাদিনী,
আর কি দানব থাকিবে বঙ্গে।"

দেবীর মূর্তি ছাড়াও মানবী—জননীরূপে দেশ আবির্ভূতা হয়েছেন কোন কোন গানে। স্বদেশী গান রচনার উৎসকাল থেকেই দেশজননীর দুঃখিনী মাতৃমূর্তি চিত্রিত হয়েছে।

(১) "নয়ন জলে গেঁথে মালা পরাব দুঃখিনী মায়"

(গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

(২) "শোক সাগরেতে ভাসি, ভারত-মা দিবানিশি,
স্মরি পূর্ব যশোরাশি, কান্দিতেছে অবিরল ;
কে এখন নিবারিবে, জননীর অশ্রুজল"—

(উপেন্দ্রনাথ দাস)

(৩) "দুখে ভারতজননী, করিছে রোদনধ্বনি
হারাইল মণিফনী, যেমন বিষাদ রে।"

(অবিনাশচন্দ্র মিত্র)

(৪) "বিষাদে মলিন বেশে, বল কি ভাবিছ ব'সে,
নয়ন জলে যাও ভেসে, কোন দুঃখে বিনোদিনী।"

(আনন্দচন্দ্র মিত্র)

(৫) "...বিজনে বসি কপোলে রাখিয়া কর,
কি তাপে তাপিত তনু নয়নে করে নিঝর ॥
... ... এ যে ভারতসুন্দরী
দুঃখিনী করেছে অরি, কাঁদিয়ে ভেঙ্গেছে স্বর ॥"

(রাধানাথ মিত্র)

(৬) "দেখ দেখি জননীর দশা একবার
রুগ্ন শীর্ণ কলেবর অস্থিচর্মসার।"

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)

স্বদেশী গানে দেশজননীকে দেবীরূপেই হোক বা জননীরূপেই (মানবী) হোক—মাতৃরূপে কল্পনা করা হয়েছে। দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী—প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্তি পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে স্বদেশী গান কিছু পরিমাণে ভক্তিসংগীতের সঙ্গে ভাবসংযোগ রক্ষা করেছে। শাক্ত পদাবলীর—

"আমি কি দুঃখেরে ডরাই ?
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে, আমি করি দুখের বড়াই।"

গানের মতো স্বদেশী গানেও সন্তান মাতৃভূমির কোলে স্থান পেয়ে জীবনকে ধন্য মনে করেছেন। রামচন্দ্র দাশগুপ্তের গান—

"আমরা সবাই মায়ের ছেলে, মাকে পেলে কাকে ডরাই ?
আকাশেতে মনের সাধে মায়ের নামে নিশান উড়াই।
বঙ্গভূমি আমাদের মা, জগতে তাঁর নাই তুলনা,
লোকে করে ধনের গর্ব, আমরা করি মায়ের বড়াই।"

৮

মাতৃমূর্তির চিত্রকল্পগুলির মধ্য দিয়ে যেমন স্বদেশ সম্বন্ধে দেশপ্রেমিক গীতিকারের অনুভূতি ও চেতনার প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি

পেয়েছে প্রাকৃতিক চিত্রকল্পের মধ্যে। পরাধীন, দুঃখপীড়িত দেশের প্রতিমান হয়ে দেখা দিয়েছে অন্ধকার রাত্রি। কখনও সেই রাত্রি বজ্র-বিদ্যুতে বিদীর্ণ, কখনও অবিশ্রান্ত বর্ষণে ভীষণ। কখনও শুধুই অন্ধকার, আর মেঘাচ্ছন্ন আকাশ।

(১) "হায় কি তামসী নিশি ভারত-মুখ ঢাকিল।"
(উপেন্দ্রনাথ দাস)

(২) "বরষা আওল পুন ফিরি যাওল,
শুখাওল ঘন-জল-ধারা,
তব ইহ শোক-ঘন আজুতক বরখন
করতহি আঁশু অপারা।" (রাজকৃষ্ণ রায়)

অন্ধকার রাত্রির সূত্র ধরেই ঝড়-তুফান, বজ্র-বিদ্যুতদীপ্ত রাত্রির চিত্রকল্পগুলি বহুবার আবির্ভূত হয়েছে স্বদেশী গানে। তবে এগুলির বৈশিষ্ট্য হ'ল যে এগুলি বিষাদের অনুষঙ্গে আসেনি, এসেছে উদ্দীপনার অনুষঙ্গে। ঝড়-তুফানের রাত্রে যেমন একাকী পথ চলার ছবি ফুটে উঠেছে কোন কোন গানে, তেমনই ফুটেছে নৌকা চালনার চিত্রকল্প রবীন্দ্রনাথের গানে—

(১) "আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দুবেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না॥
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না,
কান্নাকাটি ধরব না।"

(২) "ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা, করিস নে আর হেলাফেলা"

(৩) "এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
জয় মা বলে ভাসা তরী।"[১]

১। অনুরূপ ভাবের প্রয়োগ মুকুন্দদাসের গানে—
"বহুদিন পরে আবার মরা গাঙে পেয়ে জোয়ার,
জোয়ারে ধরেছি পাড়ি—
আর কি তরী ঠেকে রে, আর কি তরী ঠেকে রে॥"
(ক্রোড়পত্রী, ৩ দ্রষ্টব্য)

(৪) "লক্ষ ভায়ের দাঁড়ের টানে ভাস্‌লো রণতরী ;
ভাবনা কি আর হবই তো পার, তুফানে কি ডরি।"
(স্বর্ণকুমারী দেবী)

(৫) "উঠিয়া সিন্ধু মথিয়া তুফান উঠিছে উর্মি পরশি বিমান
সাহসেতে ভর করি সে সাগর হাসিমুখে তোরা তরিবি কে ?
হউক ভগ্ন, জলধি মগ্ন, তবু তরী বাহি মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?" (বিজয়চন্দ্র মজুমদার)

জাতীয় সুখসমৃদ্ধি আনয়নে স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতি বর্জনের আদর্শ প্রচার করেছেন কবি নৌকাচালনার রূপকের আশ্রয়ে।

"সুখে যাবে সুখসাগরে ;
ধর বয়কট্ বৈঠা শক্ত ক'রে।
সাহস পাল, বয়কট্ বৈঠা,
ত্রেত্রিশ শত লক্ষ দাঁড়ে,
ডিঙাইবে বিপদ-সাগর,
ঠেক্‌বে না মৈনাক পাহাড়ে।
নৌকার চলতি হেরি, প্রাণে ডরি ;
হাঙ্গর, কুম্ভীর যাবে দূরে।
গিয়ে তাপিতাঙ্গ কব শীতল,
সুখ-সাগরে সুখের নীরে।
নিরাশ বাত্যায় পথ ভুলিয়ে
ঠেকিলে আলস্য চরে,
টেন অধ্যবসায় শক্ত গুণে
প্রতিজ্ঞা-মাস্তুলে জু'ড়ে
(বড়) ঢেউ হেরিয়ে প্রাণের ভয়ে
কেন র'লে হাত-পা ছেড়ে ;
বলে কমরালী আদব বলি
ছাড় নৌকা এ জুয়ারে।"[১] (অজ্ঞাত)

১। নলিনীরঞ্জন সরকার, বন্দনা ১৯০৮, গা ৪১, পৃঃ ৬০-৬১

স্বদেশী গানে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীকে 'দানব' 'পিশাচ' রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। স্বাধীনতা অপহরণকারী শাসককে দেশবাসী শত্রুরূপে দেখেছে। এই শত্রুর বিরোধিতা করা সংগ্রামেরই নামান্তর। দেশবাসীর শাসকবিরোধী সংগ্রামের প্রসঙ্গে যুদ্ধযাত্রার ছবি বিশেষ কার্য্যকরী হয়েছে। মুকুন্দদাসের গানের সংগ্রামী মনোভাব যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতির রূপকল্পের মধ্যে নিহিত রয়েছে। 'কৃপাণ লইয়া হাতে' অগ্রসর হওয়া, 'ভীম পদাঘাতে' মেদিনী কাঁপানো, 'দামামা কাড়া ঘণ্টা ঢোল' বাজানো, 'হাতে বিজয় পতাকা' 'তুলে' নেওয়া, যুদ্ধাস্ত্র—অসি, কৃপাণ ধারণ, বীরসাজ পরিধান ইত্যাদি দ্বারা যুদ্ধ-যাত্রার ছবিটিকে প্রায় প্রত্যক্ষগোচর করে তোলা হয়েছে।

দেশবাসীর স্বদেশ ভাবনায় ঔদাসীন্য, জাতীয় উন্নতির প্রতি আগ্রহের অভাব, পরমুখাপেক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের দৈন্য দেশবাসীকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছে। এই অবস্থার চিত্ররূপ পাই 'বাজীকরের পুতুলখেলা'র বর্ণনায়।

> "পুতুলবাজির পুতুল মোরা, নাই নিজের বশে।
> (যেমন) বাজীকরের পুতুলগুলি, আজ্ঞাতে উঠে বসে॥
> মোদের মত আর ত বোকা নাই, ভাঙ্গা পিতল
> দিয়ে রাখি, লোহারই কড়াই।
> মোরা কাঁচ রাখি কাঞ্চন দিয়ে নির্বিবাদে আপোষে॥"
> (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়)

দেশবাসীর এই উদাসীন, নিস্পৃহ অবস্থার বর্ণনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 'ঘুমন্ত মানুষ', 'দাবাখেলায় বোড়ের চালে মাত' হবার রূপকল্প ব্যবহার করে।

> "তোরাই শুধু কেরানীর দল,
> এক বোড়ের চালেই হলি মাত।" (মুকুন্দদাস)

আবার হতাশার মধ্যে আশার সঞ্চার যেখানে হয়েছে, সেখানে রাত্রির অন্ধকার শেষে সূর্যোদয়ের চিত্রকল্প নেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান—

(১) "চিরদিন আঁধার না রয়-রবি উঠে, নিশি দূর হয়।"

(২) হেরো তিমিররজনী যায় ওই, হাসে উষা নব জ্যোতির্ময়ী
নব আনন্দে, নব জীবনে,
ফুল্ল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকলকূজনে।"

স্বদেশী গানের মাতৃমূর্তির বিচিত্ররূপ এবং প্রাকৃতিক চিত্রকল্প গানের ভাব ও ভাষার সঙ্গে গভীরভাবে একাত্ম। গানের ভাব যেখানে সংযত, ভাষাও সেখানে কোমল ও মধুর। যে গানে আবেগপ্রাবল্য, সেখানে আবার ভাষা উন্মাদনা সঞ্চারের উপযোগী দৃপ্ত ও কঠিন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্যপুষ্পভরা' গানটির সঙ্গে নজরুলের 'কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙ্গে ফেল্ কর্ রে লোপাট'—এর তুলনা করলেই এই বক্তব্যের সত্যতা পরিস্ফুট হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

স্বদেশী গানের সুর ও জনচিত্তে স্বদেশী গানের আবেদন

১

বাংলা স্বদেশী গানের সুরবৈশিষ্ট্য গানগুলির অন্যতম আকর্ষণ। গানগুলির গুণাগুণ বিচারে সুরপ্রয়োগ সম্বন্ধেও সাধারণভাবে দু'একটি কথা বলা দরকার।

বাংলা গানে, ভারতীয় মার্গসংগীত পদ্ধতির মার্গ বা উচ্চাঙ্গ এবং দেশী—এই নামে দুই ধারাবই অনুসরণ করা হয়েছে। শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন, "মার্গসংগীত পাঁচ সুরের কম গানকে তাদের দলে স্থান দিতে চায়নি। দেশী সংগীতে তিন স্বর থেকে সাত স্বরের গান আছে। ভাবের দিক থেকে উচ্চাঙ্গের সংগীত ভক্তি ও প্রেমকেই প্রাধান্য দিল, আর দেশী সংগীতে প্রকাশ"[১] পেল বিচিত্র ভাব। বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় জীবনে দেশী সংগীতের প্রতি শিক্ষিত মানুষের আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবে দেখা দিয়েছিল। দেশী সংগীতের প্রতি আগ্রহ জন্মালেও স্বদেশী গানে দেশী সংগীতের রীতির প্রবর্তন হয়েছে আরও কিছুকাল পরে, রবীন্দ্রনাথের হাতে।

হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্বোধনসংগীত হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারতসন্তান' গানটি রচিত হয়েছিল। এটিই বাংলাভাষায় রচিত, প্রথম জাতীয় ভাবোদ্দীপক গান। দেশী সংগীতের আদর্শে রচিত হলেও এর রাগিণী ছিল উচ্চাঙ্গ হিন্দী সংগীতের। এর রাগিণী—খাম্বাজ; তাল—

১। শান্তিদেব ঘোষ—পূঃ উঃ, পৃঃ ৯১

আড়াঠেকা। দ্বিতীয় গান গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের—'লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি করে'। এটির রাগিনী বাহার, তাল যৎ। শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন, "এর পরে ঐ মেলা উপলক্ষে আরো অনেক জাতীয় সংগীত রচিত হ'ল, কিন্তু খাঁটি বাংলা ঢঙে ও সুরে জাতীয় সংগীত কেউ রচনা করেছে বলে জানা যায় না।"[১]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় দেশবাসীর দেশপ্রেমের আবেগ যখন বাংলাদেশকে কেন্দ্র করেই উচ্ছ্বসিত হ'ল, তখন বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য, উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি দিয়ে, বঙ্গ জননীর বন্দনা করল দেশবাসী। স্বদেশী গানে দেশী সুর ও দেশী ঢঙ-এর প্রচলনও এই সময় এবং এই একই অনুপ্রেরণা থেকে আরম্ভ হয়। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ পথিকৃৎ। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন যে, 'যে সমস্ত গানকে আশ্রয় করিয়া বাঙালীর মর্মবাণী সেদিন ভাষা পাইয়াছিল, সেসব গান প্রায় সমস্ত রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং এই সময়কার রচনা।[২]

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী গানে লোকসংগীতের সুর ব্যবহারের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। স্বদেশী গান তাঁর সংগীত-প্রতিভার সামগ্রিক পরিচয় বহন না করলেও স্বদেশী গান রচনার মধ্য দিয়েই তিনি আপন সাংগীতিক প্রতিভার নূতন শক্তির পরিচয় পেলেন। তাঁর গানের প্রবাহকে মোটামুটিভাবে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে। তার দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে স্বদেশী গান। পূর্ববর্তী পর্যায়ের ধ্রুপদী ঢঙের গানের সঙ্গে এ পর্যায়ের গানের যেমন যোগ, তেমনি এই পর্বের গানও পরবর্তী পর্যায়ের গানকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। স্বদেশী গান রচনার স্তরে বাংলা লোকসংগীতের সুরের ব্যবহার এই গানগুলির অন্যতম প্রধান সম্পদ। সাধারণভাবে লোকসঙ্গীতে কথার প্রাধান্য, সুরের নয়। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানের ক্ষেত্রে তা

১। তদেব, পৃঃ ৯৩

২। নীহাররঞ্জন রায়—রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, ১৯৬২, পৃঃ ১০৩

বিপরীত। এখানে গানে সুরের প্রাধান্য, কথা তার বাহক বা অনুচর। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী পর্যায়ের কাব্যধর্মী ও চিত্রবহুল গানের বীজ এখানেই নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীত রচনার পর্বে, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখেছেন, "ভাব ও ব্যঞ্জনার প্রাধান্য নিয়ে কথা ও সুরের মধ্যে সৃষ্টি হোল মিলনের আবেদন। বাউল, ভাটিয়ালী, জারি ও সারিগানের মন্দাকিনী ধারা হোল উৎসারিত। সারিগান—'এবার তোর মরাগাঙে', বাউল—'যদি তোর ডাক শুনে' ও ভাটিয়ালী—'সোনার বাংলা আমি তোমায়' প্রভৃতি। পদ্মানদীর পাগল-করা ঢেউয়ের উপর দিয়ে নৌকার দাঁড়ের তালে তালে ছল্ ছল্ সুমধুর শব্দছন্দ আজও যেন অনুরণিত হয়ে ওঠে কবির রচিত সারিগানের মধ্যে।"[১]

স্বদেশী যুগে—রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানগুলিতে লোকসংগীতের সুরের প্রয়োগ তাঁর গানগুলিতে একটি স্বকীয়ত্ব ও মৌলিকত্ব এনে দিল। গানে নূতন সৃষ্টির সূচনা এই পর্ব থেকেই শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানগুলির কালানুক্রমিক পর্যালোচনা করে বিচার করলে তবে এই বক্তব্যের যাথার্থ প্রমাণিত হবে। রচনাকাল অনুযায়ী তাঁর স্বদেশী গানগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা চলে।

(১) প্রাক্-বঙ্গভঙ্গকালে (১৯০৫ সালের আগে) রচিত গান,

(২) বঙ্গভঙ্গ যুগে রচিত গান,

(৩) তৎপরবর্তীকালে রচিত গান।

প্রথম পর্বে ২১টি গান রচিত হয়েছে[২], তন্মধ্যে দুইটি গানের একটি কীর্তনের সুরে[৩] ও অপরটি রামপ্রসাদী সুরে[৪] রচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রাগরাগিনী মিশ্রিত বাংলাগানের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের সুরপ্রয়োগ রীতির সাদৃশ্য আছে। এই পর্বের

১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—সংগীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান, ১৯৬৫, পৃপৃঃ ৫১—৫২
২। দ্রষ্টব্য ঃ প্রফুল্লকুমার দাস—রবীন্দ্রসংগীতপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, ১৯৬২, পৃঃ ৯১
৩। "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক"
৪। "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে"

স্বদেশী গান "রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন অন্যান্য গানের সঙ্গে অল্পবিস্তর সামঞ্জস্যধর্মী। স্বদেশ পর্যায়ের গানের সুরে-তালে যদি কাঠিন্য আদৌ থাকে, তাহলে এই গানগুলির কোনো-কোনোটিতে কিছুটা আছে। তার পরবর্তীকালে রচিত গানের রূপ স্বতন্ত্র।"[১]

বঙ্গভঙ্গ যুগে রচিত গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য দু'টি—প্রথমতঃ লৌকিক, বিশেষ করে বাউল সুরের প্রাধান্য। এই পর্বের ২৪টি গানের প্রায় অর্ধেক গান বাউল সুরে রচিত। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল, সুরের সহজগম্যতা ও সহজ তালের প্রয়োগ। লৌকিক সুর ছাড়াও যেগুলি রাগরাগিণী নির্ভর[২], সেগুলিও বিশেষভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন রাগের সহজ সুরের গান। এ পর্বের গানের মধ্যে বাউল সুরে রচিত গানের অন্যতম হ'ল—

(১) যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা।

(২) রইল বলে রাখলে কারে, হুকুম তোমার ফলবে কবে।

রাগভিত্তিক স্বদেশী গানের নমুনা হ'ল—

(১) "আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি",—(বিভাস, একতালা)

(২) "আমি ভয় করব না ভয় করব না"—(ইমন ভূপালি)

(৩) "বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস্ নে ভাই!" (বেহাগ)

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানের তৃতীয় স্তরের গানগুলি মূলতঃ রাগরাগিণী নির্ভর, কিন্তু দেশী গানের ঢঙে কিছু গান রচিত হয়েছে। রাগাশ্রিত গানের মধ্যে 'জনগণমন অধিনায়ক' এবং 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গান দু'টি উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে, দেশী গানের ঢঙে—সহজ সুরে ও তালে রচিত গান হ'ল—"ব্যর্থ

১। প্রফুল্লকুমার দাস—পূঃ উঃ, পৃঃ ৯১

২। বিভাস, বেহাগ—ইত্যাদিও উত্তরভারতের শাস্ত্রীয়সংগীত পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র, বাংলাদেশের নিজস্ব ঢঙে গীত।

প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো"। সাধারণতঃ "লোকসংগীতে কথারই প্রাধান্য বেশী, সুর এখানে শুধু কথাগুলোকে বেঁধে ধরবার ফ্রেম যেন।...লোকসংগীতের সুর বড় ফিকে, সুরের ঘন বুনুনি নেই। সুরের গ্রাম্যতা দোষ"[১]ও যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাউল সুরের স্বদেশী গানে এই ত্রুটি চোখে পড়ে না। কারণ এখানে "সাতটি সুরই খেলা করছে এবং মধ্যে কোমল সুরেরও ব্যবহার আছে।"[২] বাউল গানের ভাষার সরলতা ভাবের গভীরতা, সুরের দরদ গুণের সঙ্গে জাতীয় সংগীতের সুগভীর ভাব সংযোগিত করে স্বদেশী গান রচনা করে, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী গানের সুর প্রয়োগে নূতন এক পথের সন্ধান দিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী বাউল গানের "কথায় যেমন কাব্যসম্পদ আছে, তেমনি আছে সুরের মাধুর্য ও লালিত্য।"[৩] বাংলা স্বদেশী গান লোকপ্রচলিত রীতির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে অনায়াসে লোকচিত্ত জয় করে নিল।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানে লোকসুরের প্রয়োগ সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণ এই যে, রবীন্দ্র-প্রদর্শিত পথেই রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, মুকুন্দদাস প্রভৃতি গীতিকারও স্বদেশী গানে দেশী সুর প্রয়োগ করেন। কীর্তনাঙ্গ বাউল সুরে রচিত অতুলপ্রসাদের "মোদের গরব মোদের আশা" লোক সুরে রচিত গানের মধ্যে স্মরণীয় সংযোজন। রজনীকান্তের গানে কথার প্রাধান্য, সুরের নয়। সুরের বৈচিত্র্য-সৃষ্টির দিকে তিনি খুব মনোযোগী ছিলেন না। তাঁর অধিকাংশ গানই রাগভিত্তিক। লৌকিক সুরের মধ্যে কীর্তনভাঙ্গা সুরে কয়েকটি গান রচিত। যেমন, "আর কিসের শংকা, বাজাও ডংকা; প্রেমেরি গঙ্গা; বো'ক" গানটি।

১। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথের গান, ১৯৬৬, পৃঃ ১০১
২। শান্তিদেব ঘোষ—পূঃ উঃ, পৃঃ ১০০
৩। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—পূঃ উঃ, পৃঃ ৮২

স্বদেশী-পরবর্তীযুগের সংগীতকারদের প্রধান নজরুল ইসলামের গানেও দেশী সুরের প্রয়োগ আছে। বাউল, কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী, কাজ্‌রী—ইত্যাদি লোকপ্রচলিত বিভিন্ন গানের সুর ও ঢঙ্‌ তাঁর গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বদেশী গানগুলিতে অবশ্য রাগরাগিনী নির্ভর গানের সংখ্যাই বেশী। তবে তাঁর উদ্দীপনাপূর্ণ, দেশবাসীকে সম্বোধন করে রচিত[১] বা দেশমাতার প্রতি ভক্তিভাবপূর্ণ গান[২]—উভয় ক্ষেত্রেই তিনি দেশী সংগীতের আদর্শ রক্ষা করে গানগুলির মধ্যে সহজ, সরল আবেদন সঞ্চার করে স্বদেশী গানকে সাধারণ মানুষের প্রাণের বস্তু করে তুলেছেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগরাগিনী, দেশী সুর ছাড়াও নূতন সুরের সৃষ্টিতেও তিনি সফল হয়েছিলেন। প্রজ্ঞানানন্দ লিখেছেন, "সংগীতের ঔপপত্তিক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান থাকায় বিভিন্ন রাগরাগিনীর মিশ্রণে নূতন নূতন রাগ বা সুর সৃষ্টি করাতেও তাঁর কৃতিত্ব পাওয়া যায়। বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে তিনি এক যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলেন।"[৩]

স্বদেশী গানে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত ও দেশী সংগীতের যুগ্মধারা যেমন প্রবাহিত, তেমনি পাশ্চত্য সংগীতের সুর, ঢঙ্‌ও তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে। পাশ্চাত্য সংগীতে তেজ, বীর্য বা উল্লাসের ভাব সহজেই ফুঠে ওঠে। স্বদেশী গানের রচয়িতারা বিলিতি গানের এই বৈশিষ্ট্য তাঁদের গানে সঞ্চারিত করে জাতির চিত্তে দেশপ্রেমের উন্মাদনা জাগাতে চেষ্টা করবেন— এটাই স্বাভাবিক। জাতীয় আদর্শে পরিপূর্ণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় রাগরাগিনীকে

> "পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন।... যে সকল সুর বাঁধা-নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে

১। "চল্‌ চল্‌ চল্‌ উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল"
২। "লক্ষ্মী মা তুই আয় গো উঠে সাগর-জলে সিনান করি।"
৩। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—পূঃ উঃ, পৃঃ ৩৯

নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্ব্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত।"[১]

রবীন্দ্রনাথ হয়ত এই উপলব্ধিবশতই সঞ্জীবনীসভার জন্য তাঁর পনেরো-ষোল বছর বয়সে, "একসূত্রে গাথিয়াছি সহস্রটি মন" গানটি লেখেন[২]। এই গানের খাম্বাজ রাগিনীর "সুরটিকে শৃংখলার সঙ্গে নানাপ্রকার ওঠানামার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়াতে পাশ্চাত্য জোরালো গানের ভাব তাতে ফুটে উঠেছে এবং ভাষা ও ছন্দের জোরে গানটি এমন প্রাণবান হ'য়ে উঠেছে যে, সকলেরই প্রাণে উন্মাদনা আনে।"[৩]

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানে বিলিতি গানের সুর ও ঢঙ্ অতি সুন্দরভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। তাঁর গানে স্বদেশী প্রীতি ও ভক্তির সঙ্গে বীর্যভাব মিশ্রিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দিলীপকুমার লিখেছেন, "দ্বিজেন্দ্রলাল বিদেশী সঙ্গীত থেকে আহরণ করেছিলেন এই দীপ্তির জৌলুষ ওরফে প্রাণশক্তি—সংস্কৃত পরিভাষায় যার নাম ওজস্। আমার মনে হয় যাঁরাই আমাদের ইদানীন্তন সুরকারদের সুর মন দিয়ে শুনেছেন তাঁদেরই কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশেছে দ্বিজেন্দ্রলালের সুর—কারুর ওজঃসম্পদ বা তাঁর কাব্যসম্পদের সঙ্গে জুড়ি হাঁকিয়েছে তাঁর সব বলিষ্ঠ গানেই, যথা ঃ 'বঙ্গ আমার, জননী আমার', 'মেবার পাহাড়', 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে' প্রভৃতি।··· দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম আমাদের সঙ্গীতের মধ্যে বৈদেশিক

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গ) পৃঃ ১০৮-১০৯

২। "গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম নাটকের (২য় সং ১৮৭৯) অন্তর্ভুক্ত, রবীন্দ্রনাথের কোনো গীত-গ্রন্থভুক্ত হয় নাই। ১৩১২ সালে 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা'য় বন্দেমাতরম্ ধুয়া সংযোগে স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। ১৩৫৭ সালে গীতবিতান তৃতীয়খণ্ড সম্পাদনাকালে গানটিকে গীতবিতানভুক্ত করা হয়। গানটি রবীন্দ্রনাথের রচনা কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (গ) কালানুক্রমিক গীতবিতান, ১৯৭৩, পৃঃ ৯

৩। শান্তিদেব ঘোষ—পূঃ উঃ পৃঃ ১৫৭

প্রাণশক্তির নিবিড়তার রসদ্যুতি আবাহন ক'রে ভারতীয় আত্মিক সুরের সঙ্গে বৈদেশিকী ওজঃশক্তির সমন্বয়ে এক অপূর্ব রসের সৃষ্টি করেছিলেন—যার ফলে শুধু তাঁর সুরের নানা বৈদেশিকী চলাফেরাকে অচেনা মনে হয় না"।[১] তাঁর 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গানের পাশ্চাত্য সুর অতি সহজেই শ্রোতার মন আকৃষ্ট করে। ইংরিজি গানের উচ্ছলতা ও গতিবেগই গানটির মধ্যে অভিনবত্ব এনে দিয়েছে। তাঁর গানের সুরের গতিবেগ প্রসঙ্গে দিলীপকুমার রায় লিখেছেন যে, "প্রাণশক্তির চমক পেতেন বলে...নানা স্বদেশী গানেই তিনি এনেছিলেন এই সুরের টপ্‌কে টপ্‌কে চলা।··· 'সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি'-তে জ-ন্ প্রথমবার মুদারার মা থেকে লাফ দিয়ে পৌঁছল ছটা সুর ডিঙিয়ে তারার রে-তে, দ্বিতীয় 'সে যে আমার জন্মভূমি'র জনম্ গাওয়া হ'ল মুদারার কোমল নি-তে, কিন্তু তারপরেই ভূমি—মাটি নিল রেখাবে ফিরে পাঁচটা পর্দা এক লাফে নেমে···এ বৈদেশিকী গতিলীলা তিনি শুধু যে তাঁর স্বদেশী গানেই প্রবর্তন করেছেন তা নয়—তাঁর অন্য অনেক গানেও এ চাল পরিস্ফুট হয়েছে।"[২]

'কোরাস্' বা সমবেত কণ্ঠে বাংলা গানের আধুনিক রীতিও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবর্তন করেন। বিলিতি গানের আদর্শে 'কোরাস্'-এর প্রচলন সুর সৃষ্টিতে তাঁর অসামান্যতার সাক্ষ্য দেয়। 'কোরাস্'-এর ব্যবহারে তাঁর গানে উদ্দীপনার ভাব—শৌর্যবীর্য ও ওজঃগুণ অতি সহজেই সঞ্চারিত হয়েছে। গানের অংশবিশেষ সমবেতকণ্ঠে বারংবার গীত হ'লে তার ভাবাদর্শ সহজেই গায়ক ও শ্রোতাকে আবিষ্ট করে। এই নূতন ভঙ্গীর স্রষ্টা হিসেবে এবং 'কোরাস্'-এর অপরাজেয় শিল্পী হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা স্বদেশী গানের ক্ষেত্রে স্বমহিমায় উজ্জ্বল। দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীতপ্রতিভা সম্পর্কে বলতে

১। দিলীপকুমার রায়—দ্বিজেন্দ্র-গীতি, ১৯৬৫, পৃঃ ১

২। দিলীপকুমার রায়—পূঃ উঃ, পৃঃ ৯

গিয়ে দিলীপকুমার রায় লিখেছেন "কোরাস্ গানে তাঁর তুল্য শক্তিমত্তা অদ্যাবধি কেউ প্রকাশ করতে পারেনি—কারণ তাঁর সুর রচনার ভঙ্গি, প্রাণের উৎসাহ, আনন্দের পৌরুষ ছিল আশ্চর্য অদ্বিতীয়। যাঁরা সে সময়ে তাঁর … 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গান তাঁর মুখে শুনেছেন তাঁরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করতেন যে তাঁর গানের কথা ও সুরের সংমিশ্রণে যে আগুন জ্ব'লে উঠত সে আগুন আর কোনো বাংলা গানেই জ্বলে ওঠেনি তখন পর্যন্ত।"[১] তিনি আরও বলেন যে, "কোরাস্ সঙ্গীতেরও যথেষ্ট সাঙ্গীতিক মূল্য আছে একথা অনস্বীকার্য। কবির—

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ"

বা তাঁর

"আর্য ঋষির অনাদি গভীর উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র,
নহ কি মা তুমি সে ভারত-ভূমি নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র ?"

শ্রেণীর কোরাস্ সঙ্গীতে জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি সম্পদ সুরে ছন্দে কাব্যে চিত্রাংকনে অপূর্ব হ'য়ে উঠেছে একথা সবাই স্বীকার করবেন।[২]

অতুলপ্রসাদের বিদেশী সুরে রচিত স্বদেশী গান—"উঠ গো ভারতলক্ষ্মী, উঠ আদিজগতজনপূজ্যা"—গানে উৎসাহের সঙ্গে মাধুর্যও মিশ্রিত হয়েছে। তবে বিদেশী সুর ছাড়াও তাঁর গানে রাগপ্রধান সুরের ধারা এবং উত্তর প্রদেশীয় ও বাংলার লোকগীতির লৌকিক-ধারা গৃহীত হয়েছে। সুরের প্রতি আগ্রহ ও পক্ষপাতিত্বের জন্য তাঁর গানের ভাষায় মাঝে মাঝে শিথিলতা দোষ দেখা দিয়েছে। কিন্তু শব্দের শৈথিল্য পরিপূর্ণ করে তুলেছে গানের সুর। সুরের যাদুস্পর্শে সাধারণ মানুষের চিত্তজয় করেছেন অতুলপ্রসাদ। দ্বিজেন্দ্রলালের

১। দিলীপকুমার রায়—উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল, ১৯৩৮ ? পৃঃ ২৯-৩৩
২। দিলীপকুমার রায়—পূঃ উঃ, পৃঃ ১৪৩

স্বদেশী গানের তুলনায় অতুলপ্রসাদের গানে উদ্দীপনার ভাব কম হলেও কোমল-মধুর ভাব সৃষ্টিতে গানগুলি সার্থক।

বাংলা স্বদেশী গান অনুভূতির গভীরতায়, প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্যে যেমন অন্যান্য বাংলা গানের (প্রেম বা ভক্তি বিষয়ক প্রভৃতি) অনুরূপ, তেমনি সুরপ্রয়োগের ক্ষেত্রেও ভারতীয় মার্গসঙ্গীত, দেশী সঙ্গীত ও লোকগীতির সুরের ত্রিবেনী সঙ্গমে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে বাংলা গানের ধারার সঙ্গে অভিন্নতা রক্ষা করছে। বাংলা গানের কথাসম্পদের মত, তার সুরের বৈচিত্র্যও সঙ্গীত রসিকের শ্রবণকে পরিতৃপ্ত করে। গান হিসেবে এটিও তাদের সার্থকতার অন্যতম মানদণ্ড।

২

চর্যাপদ থেকে শুরু করে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বৈষ্ণবপদাবলী, শ্যামা-সংগীত পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য মূলত সংগীত নির্ভর। বাংলা দেশের লোকসংস্কৃতিও সংগীত সম্পদে সমৃদ্ধ। সারি, জারি, ভাটিয়ালী, বাউল, দেহতত্ত্ববিষয়ক গান—দীর্ঘদিন ধরে বাঙালী শ্রোতার সংগীত-পিপাসা মিটিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা স্বদেশী গানগুলিও এই ধারারই অনুবর্তন করেছে। এ গানগুলির জাতীয় আন্দোলনে ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে নিছক গান হিসেবেই এদের মূল্য কতখানি, সে প্রশ্নও উঠতে পারে। কেননা, এদের মূল্য কি শুধুই জাতীয় আন্দোলনে এদের ভূমিকার ওপর নির্ভর করবে না; এদের স্বতন্ত্র শিল্প মূল্যের ওপরও কিছুটা নির্ভরশীল।

স্বদেশী গান রচনার যখন সূত্রপাত হয়, (১৮৬৮ খৃঃ) তখন তা দেশের মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। প্রায় ৩৮ বছর পর এসকল গান জনচিত্তকে অভিভূত করতে সমর্থ হয়। এই দীর্ঘসময় স্বদেশী গানের সঙ্গে জনসম্বন্ধ না গড়ার সম্ভাব্য কারণ মনে হয় দু'টি।

প্রথমতঃ হিন্দুমেলা যুগের গানের ভাব, ভাষার সঙ্গে দেশবাসীর নৈকট্যবোধের অভাব, দ্বিতীয়তঃ হিন্দুমেলার গানের ভাবাদর্শ সমাজজীবন থেকে অনেকটা দূরে ছিল। এসকল গানের সঙ্গে সহমর্মিতা উপলব্ধি দেশের মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

হিন্দুমেলার গান—

> "কবে উদিবে সৌভাগ্যভানু ভারতবরষে।
> পোহাইবে দুঃখ নিশা প্রভাত পরশে॥
> সভ্যতা সরোজলতা, প্রাপ্ত হবে প্রবলতা,
> প্রস্ফুটিবে সুখাম্বুজ, মানস সরসে॥[১]

অথবা

> "নিরখি দেখ কাল বিকল, পূর্ব্ববিভব সকল বিফল।
> অঙ্গ-ভঙ্গ জন্মভূমি, নতশির হয় লাজে॥"[২]

প্রভৃতি গানে ভাব, ভাষা, সুর—কোনটিতেই লৌকিকতার স্পর্শ নেই। বাংলা গানের নিজস্ব ঢঙ্—(কীর্ত্তন বা রামপ্রসাদী ইত্যাদি গান) না থাকায় গানগুলির আবেদন পল্লীবাসী সাধারণ মানুষের কাছে না পৌঁছানোই স্বাভাবিক। হিন্দুমেলা প্রকৃতপক্ষে শহরবাসী শিক্ষিতের স্বদেশ চেতনার অভিব্যক্তি. সাধারণ মানুষ সেই ভাবনার অংশীদার ছিল না।

দ্বিতীয় কারণটি যা অনুমান করা যায় তাহ'ল এই যে, বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকেই গান সমাজ জীবনের সঙ্গে নানা দিক থেকে যুক্ত ছিল। পূজাপার্বণ, পারিবারিক আনন্দোৎসব, সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল গান। আবার, সমাজ জীবনের কর্মধারার সঙ্গেও গান যুক্ত ছিল। জারি, সারি, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গান সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কর্মজীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে স্বদেশবিষয়ক গানের সূচনা হ'ল, সমাজ জীবনের কর্মধারার সঙ্গে তার কোন প্রত্যক্ষ

১। যোগেশচন্দ্র বাগল—পূঃ উঃ, পরিশিষ্ট।

২। তদেব

সংযোগ ছিল না। ফলে এযুগের গান শিক্ষিত, ভাবপ্রবণ মানুষের চেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে রইল—তা 'সর্বত্রগামী' হ'য়ে উঠতে পারল না। তবে সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করার প্রবণতা যে এই গানগুলির ছিল, তার প্রমাণ হ'ল 'হিন্দুমেলা'র অনুষ্ঠান উপলক্ষে গান রচনায়।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করেই সারা বাংলাদেশে প্রথম আলোড়ন দেখা দিল। তাতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, শহর ও গ্রামবাসী সমানভাবে স্বদেশানুরাগে উদ্বেল হ'য়ে উঠল। এই সময়কার অসংখ্য সভা-সমিতিতে গীত হয়েই স্বদেশী গানগুলি প্রথম জনচিত্তের সংস্পর্শে এল। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্য্যকরী হবার ঘোষিত দিনটিতে দেশবাসীর প্রতিবাদ সমবেতকণ্ঠে শোভাযাত্রায় গীত স্বদেশী গানের ভাষায় বাঙ্ময় হয়ে উঠল। দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য 'মন্দিরদ্বার' খুলে গেল। স্বদেশী গান সাধারণ মানুষকে স্বদেশপ্রেমে আহ্বান জানাল। এই আহ্বান স্বদেশীর ভাবের ক্ষেত্রে নয়, কর্মের ক্ষেত্রে। চাষী, জোলা, তাঁতী, কর্মকার—সকলেই এই আহ্বানের লক্ষ্য ছিল। শহরে, গ্রামে, গঞ্জে, জেলায়—বিদেশীপণ্য বর্জনের ও স্বদেশী গ্রহণের আদর্শ প্রচারের সহজ ও দ্রুততম উপায় হিসেবে এই যুগের স্বদেশী গানগুলি গৃহীত হ'ল। বঙ্গভঙ্গ পেস্তাব বদ ও সেইসঙ্গে 'বয়কট' প্রস্তাব দেশবাসীর সামনে কর্মের বার্তা নিয়ে এল। স্বদেশপ্রেমের ভাববিলাস ছেড়ে সুনির্দ্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণের প্রবণতা এল।

এযুগে, একই সঙ্গে, কয়েকজন প্রতিভাশালী সংগীতকারের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ এই পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতকার। এছাড়া অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, মুকুন্দদাস—স্বদেশী যুগের অন্যতম গীতিকার। সামগ্রিকভাবেই এযুগের গান ভাব, ভাষা, রচনারীতিতে সহজ ও সরল। এই কারণে সাধারণ মানুষের সঙ্গে গানগুলির সহজ সম্বন্ধ গড়ে তুলে গানগুলিকে পরম আগ্রহে দেশের মানুষ নিজেদের কণ্ঠে তুলে নিল। স্বদেশী যুগের

গানের লৌকিকরূপ প্রসঙ্গে বলতে যেয়ে একজন সংগীত-সমালোচক তার কারণ সম্বন্ধে বলেছেন,

> "বাংলায় একটা যুগ এসেছিল। তখন হঠাৎ বান এলো মরা গাঙে, শুক্‌নো ডালে নব কিশলয়ের আবির্ভাব হ'ল, বহুদিনের নি-ফুল গাছে ফুল ফুটে উঠলো। সেদিন আলোয় ভরে উঠলো জাতির অন্তর-আকাশ। সে কি আলো, সে কি জোয়ার, সে কি আকাশ-ছোঁওয়া ঢেউ বাঙ্গালীর মনে! এতো রাজদরবারের গান শোনানো নয়, এযে দেশের প্রতিটি লোককে গান শোনাতে হবে। চাষী যেখানে চাষ করছে, মাঝি যেখানে খেয়া দিচ্ছে, তাঁতী কাপড় বুনছে, জেলে মাছ ধরছে, সেখানে গান পোঁছে দিতে হবে। দেশের কবিকে তাঁর কলালক্ষ্মীই তাগিদ দিলেন সারা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের সেই উদ্বেলতাকে রূপ দিতে। ··· তখন দরবারী সুর বর্জন করে বাউল, সারি, কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী প্রভৃতি অতিপরিচিত গ্রাম্যসংগীতের সুরে গান"[১] বাঁধা হ'তে লাগল।

হিন্দুমেলার গানের সঙ্গে এযুগের গান তুলনা করে দেখলেই, দুই যুগের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের "এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে", রজনীকান্তের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই", অতুলপ্রসাদের "মোদের গরব, মোদের আশা", আ মরি, বাংলা ভাষা" প্রভৃতি গানগুলি দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে নতুন ভাব ও ভঙ্গী নিয়ে এল। এগুলিতে শুধু স্বদেশ-চেতনার প্রকাশরূপেই নয়, গান হিসেবেও বাঙালীর রসাবেদন চরিতার্থ হ'ল। জাতীয় আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতেও (বিপ্লবযুগ, অসহযোগ পর্য্যায়, সত্যাগ্রহ, ভারত ছাড় আন্দোলন)—স্বদেশী গানের এই গুণ সংকুচিত হ'য়ে পড়েনি। বিভিন্ন পর্য্যায়ে গানগুলি স্বদেশপ্রেমিকের কণ্ঠে গীত হ'য়ে তাদের আবেদনের ব্যাপকতার পরিচয় দিয়েছে।

১। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—পূঃ উঃ, পৃঃ ৯৭

গানের মধ্য দিয়ে এযুগে জনসাধারণের কাছে যেসব বক্তব্য তুলে ধরা হ'ল, তা হ'ল দেশ ও জাতির বর্তমান অবস্থা, বিদেশী শাসনের ফলে দেশের মানুষের দুঃখদৈন্য, অভাব অভিযোগ, দেশবাসীর নৈতিক অবনতির কারণ ও প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ ; স্বাবলম্বন, ঐক্য, জাতীয় উন্নতির সোপান হিসেবে জাতীয় চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা ; দেশের সংগঠনে প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য।

হিন্দুমেলার গানের মূল ভাব করুণ। দুঃখিনী জননীর বেদনায় দেশবাসী কখনও শোকে ম্রিয়মাণ, কখনও বা এই শোকের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য অতীত গৌরবের মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছে। দু'একটি গানে[১] উৎসাহের সুর কিছুটা বেজেছে, কিন্তু সুস্পষ্ট কর্ম-পন্থার অভাবে এই উৎসাহকে পরিচালিত করার মত উদ্দীপনা জাগেনি। স্বদেশী যুগের গানের সমাজজীবনের কর্মধারার সঙ্গে সংযোগের ফলে স্বদেশী বা পরবর্তীকালের স্বদেশপ্রেমিকের কাছে যেমন প্রিয় ছিল,[২] তেমনি দেশের সাধারণ মানুষ তার মধ্যে জড়তা-মুক্তি, চেতনার উদ্বোধনের বার্তা পেয়ে পরম সমাদরে গ্রহণ করেছে।

অবশ্য সব স্বদেশী গানই জনচিত্তে সমান আবেগ জাগাতে সমর্থ হয়নি। যেসব গান সমাজজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত (যথা, দেশের শিল্পবাণিজ্যের অধোগতি, ইংরাজ শাসকের অন্যায় অবিচার) বা বিদেশী শাসকের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব নিয়ে রচিত, সেসকল গানের উত্তেজনা অতি সহজে দেশের সাধারণ মানুষের মনে সংক্রামিত হয়ে তাদের উত্তপ্ত করে তুলেছে। স্বদেশী যুগে 'বয়কট্' আন্দোলনে অনেক গান আন্দোলনের হাতিয়ারস্বরূপ কাজ করেছে। বিপ্লবীদের

১। যেমন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গাও ভারতের জয়' গানটি। (ক্রোড়পঞ্জী, ৩ দ্রষ্টব্য)

২। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও মুকুন্দদাসের গান বিপ্লবীদের কাছে এতটা জনপ্রিয় ছিল, তা জানা যায় চিন্মোহন সেহানবীশের 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ' প্রবন্ধ থেকে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে প্রাপ্ত তথ্য থেকে।

জীবনেও বহু গানের প্রভাব ছিল অপরিসীম। স্বদেশী যুগের স্মৃতিরোমন্থনকালে এসকল গানের স্মৃতির উল্লেখ করেছেন বহু মনীষী। রজনীকান্তের "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" গানটি সম্বন্ধে এধরণের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়।

মুকুন্দদাসের গানের সম্পর্কে একজন লিখেছেন, "... আসরে চিকের দিকে চাহিয়া গাহিলেন—

"ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী
কভু হাতে আর প'রো না,
জাগ গো ও জননী, ও ভগিনী
মোহের ঘুমে আর থেকো না।"

গানের শেষে দেখা গেল 'চিক'-এর আড়ালে রাশীকৃত রেশমী চুড়ী মা-বোনেরা ভাঙ্গিয়া বা ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন।"[১] নজরুলের গান সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী, অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে অংশ-গ্রহণকারী দেশপ্রেমিক, সাধারণ শ্রোতাকে সমানভাবে মুগ্ধ করেছে। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে তরুণ বয়সে যুক্ত ছিলেন, এমন একজন প্রবীণ ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় দেখি—"কাজী নজরুল ইসলামের গানে সকলকে মাতাল করিয়া দিত। মাঠে ঘাটে বাগাল ছেলেদের কণ্ঠেও ঐগান শোনা যাইত।"[২]

আবার শাসকবিদ্বেষসঞ্জাত তিক্ততার ভাব নিয়ে রচিত গান-গুলিও সাধারণ মানুষকে উদ্দীপিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' অথবা নজরুলের 'কারার এই লৌহকপাট, ভেঙ্গে ফেল্ কর্ রে লোপাট' গানের ভাব দেশবাসীর প্রাণে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। তবে দেশপ্রেমের কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত, ভাব ও ভাষায় লৌকিকরীতিতে রচিত গানগুলিই জনগণের সঙ্গে গভীরতর সম্বন্ধ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। পরবর্তীকালেও গণনাট্য সংঘ

১। জয়গুরু গোস্বামী—পূঃ উঃ, পৃঃ ৭২৭
২। রামলোচন মুখোপাধ্যায় লিখিত চিঠি।

রচিত স্বদেশী গানে এই আদর্শই অনুসৃত হয়েছে। জাতীয় শিল্পী পরিষদের গীতিকার রচিত—

"নিশান রাখ উচু, তাতে যায় যদি যাক প্রাণ ;
পেতেই হবে মুক্তি দেশের রাখতে হবে মান।"[১] (অজ্ঞাত)

কিংবা

"এসেছে ডাক, বেজেছে শাঁখ,
কে যাবি আয় আয় ;
বেলা যে বহে যায়।
কোর' না দেরী, কোর' না দেরী,
শোননি কানে ভেরী ;
ডেকেছে গুরু, খেলা যে শুরু
বাহির আঙিনায়।"[২] (অজ্ঞাত)

অথবা

"ক্ষুধিতের সেবার ভার
লও লও কাঁধে তুলে।
কোটি শিশু নরনারী
মরে অসহায় অনাহারে,
মহাশ্মশানে জাগো মহামানব
আগুয়ান হও ভেদ ভুলে।
মানুষের মাঝে মরে ভগবান
পিশাচ দুয়ারে হাসে খল খল
দীনতা হীনতা ভীরুতারে কর দূর
আশার আলো ধর তুলে॥[৩] (বিনয় রায়)

১। কবির নাম অজ্ঞাত, জাতীয় শিল্পী পরিষদের উল্লেখ রয়েছে। সতীশচন্দ্র সামন্ত (সম্পাঃ) মুক্তির গান, ১৯৪৭, গা—৯৯, পৃঃ ১১১-১১২

২। কবির নাম অজ্ঞাত, পূঃ উঃ, পৃঃ ১০৯

৩। প্রভাতকুমার গোস্বামী—পূঃ উঃ, গা-৫৫, পৃঃ ১৬৪-১৬৫

৩

স্বদেশী গানের ভাণ্ডার দীন নয়। অসংখ্য কবির অজস্র রচনা-সম্ভারে তা বিপুল আয়তন লাভ করেছে। তবে গানের সংখ্যা অনেক হলেও তার সবই রসোত্তীর্ণ রচনা নয়। অনেকেই বলে থাকেন মত প্রচার করে যে উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য রচিত হয়, তাতে মহৎ সাহিত্যের সম্ভাবনা কম থাকে। বক্তব্যের গুরুত্ব যেখানেই অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, সেখানেই রচনা বুদ্ধিকে জাগ্রত করলেও হৃদয়কে নাড়া দেয় না। স্বদেশী গানের মধ্যেও এ ধরণের নিদর্শন বিরল নয়।[১]

অশ্বিনী দত্তের— "বিধি কি নিদ্রিত আজি মনে কর বিদেশীগণ?

... ...

কথায় কথায় চক্ষু রাঙ্গাও, পদাঘাতে পীলে ফাটাও
বিকারেতে সরা হেন দেখ ত্রিভুবন
মনে ভাবিয়াছ সার, দাও দিতে নাই কেউ আর ;
চিরদিন এমনিভাবে করিবে যাপন ?
যে দেশে যে ব্যক্তি যখন করেছে লোকপীড়ন,
বিধির নিয়মে তার হয়েছে পতন।
তখনও ছিলেন যে বিধি, এখনও আছেন সে বিধি,
সে বিধির বিধি কদাপি না হইবে খণ্ডন।"

কিংবা "বাধাবিঘ্ন কত শত শত, করিতে মা তোর চরণ-বন্দন।
চাহি মা ! গাহিতে তব গুণগান,
কিন্তু তাহে রাজশাসন ভীষণ।
বন্দেমাতরম্ ধ্বনি যে বা করে,
রাজদ্রোহী নাকি হয় সে বিচারে,
বাঁধে তারে চরে, রাখে কারাগারে,
পলে পলে করে কত নির্যাতন।" (গিরিশচন্দ্র সেন)

১। অশ্বিনীকুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গিরিশচন্দ্র সেন, বিভিন্ন স্বদেশ-সেবক সমিতি রচিত গানে তার নিদর্শন আছে।

কিংবা "কাঞ্চনে ফেলিয়ে কাচে গের দিয়ে
পাইয়ে অশেষ অন্তর যাতনা
জাগো তোর তরে, আজি ঘরে ঘরে,
শিখেছে সবাই করিতে ভাবনা।"

এসব কাব্যের কোন শিল্পমূল্য কেউ দাবী করবেন না। কিন্তু স্বদেশী গানের এক অংশে ভাবগম্ভীরতা ও অনুভূতির নিবিড়তা, শব্দচয়ন ও ছন্দের সুষমা আমাদের মুগ্ধ করে। সেসব গান আজও বাঙালীর কণ্ঠহারা হয়নি। স্বদেশপ্রেম-বিষয়ক গীতিকবিতার পর্যায়-ভুক্ত হয়ে সেসব গান আজও বেঁচে আছে।

মনে রাখা দরকার প্রত্যেকটি স্বদেশী গানের পেছনে ছিল হয় পরাধীনতার জ্বালা ও বেদনা, কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আত্মত্যাগের প্রেরণা, দেশের প্রতি মমতা ও ভালোবাসা, দেশের জন্য দুঃখবরণের প্রতিজ্ঞা। প্রত্যেকটি গানই তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসে আছে অজস্র মানুষের দান ও আত্মত্যাগ, —এই গানগুলি সেই মানুষেরই কণ্ঠোচ্চারিত হয়েছে, তাঁদের প্রেরণা দিয়েছে, সাহস দিয়েছে—সেই তাদের মহিমা। শুদ্ধ শিল্পের বিচারে তাদের যে মূল্যই হোক, তাদের আরও একটি মূল্য ছিল একথা ইতিহাস স্বীকার করবে।

আর শুধু শিল্পগত বিচারেও দেখা যায় যে কয়েকটি গান সমসাময়িকতাকে অতিক্রম করে আজো জীবিত, বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে তাদের স্থান চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেছে—যা শুধু সংকীর্ণ দেশপ্রেম নয়, উদ্দীপক জাতিবৈরতা নয়, যা মানুষের অন্তরের গভীর কথারই কাব্যরূপ। প্রাচীন কবি পৃথিবীকে দেবীরূপে বন্দনা করেছিলেন, আধুনিক কবি দেশকে বিশ্বমাতা ও বিশ্বময়ের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন—

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার' পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

স্বদেশী গানের সংকলন

১।

আজকে মা তোর চায় নাক' ফুল চায় নাক' সে অনুলেপ
মা চায় কর্ম্মী, মা চায় বীর,
মা চায় যাদের উদার মন ॥
মা চায় ত্যাগী, সংযমী, আর
মা চায় যাদের দৃঢ় মন ॥
দেশের সেবা চায় মা কেবল,
নিজের সেবা চায় না এখন ॥
ভারত সন্তান উঠ্‌রে জেগে
দেশের তরে সঁপরে জীবন ॥

—অজ্ঞাত

মাতৃমন্ত্র, প্রকাশক অমূল্যচন্দ্র অধিকারী, গা-২, পৃঃ ২

২।

আছিস্ কোন উল্লাসে ?
সদাই বিদেশী জোঁক রক্ত চোষে।
জলে গেলে জলের জোঁকে
ধরে জীবের আশে পাশে ;
এ যে এম্‌নি নচ্ছার জোঁকা
জলে স্থলে ধরল ঠেসে।
জোঁকের ভয়ে হ'লি পোক,
জন্ম নিয়ে বীর-ঔরসে ;
তোদের কাণ্ড হেরি' জগত জুড়ি,
হো হো রবে সবাই হাসে।
অস্থি চর্ম্ম হ'ল রে সার,

রক্ত নাহি রক্তকোষে ;
এখন বাঁচতে চেলে ফেল সে জোঁক
বয়কট্ চূর্ণ মুখে ঘ'সে।
খেতে নাই ঘরে অন্ন,
শুইতে বাঙ্গা তক্তপোষে ;
তোরা ধনে প্রাণে গেলি মারা
বিলাসের চুলকানি দোষে।
কমরালীর পদাবলী
উড়াইও না উপহাসে,
দেখ্‌ছ না সোনার ভারত হচ্ছে শ্মশান
দুষ্ট জোঁকার শ্বাস প্রশ্বাসে!

—অজ্ঞাত (করালী ?)

বন্দনা, নলিনীরঞ্জন সরকার, পৃঃ ৬৩-৬৪

৩।

আমরা গাব সবে বন্দেমাতরম্।
ম'রলে পরে অমর হ'ব পাব স্বর্গ অনুপম।
ছিনু ঘুমঘোরে, সুখ-শয়নে, কে যেন ও সুধা ঢালিল কানে,
অমনি মরমে পশিল, জাগাইয়া তুলিল
ঘুচাইল চির ভ্রম!
যে মধুর নাম পেয়েছি সবে, গাব যতদিন রহিব ভবে ;
তোমাদের আর বে-আইনি হুকুম নাহি মানি,
চোখ রাঙ্গানি ডরাই কম!
ভেবেছো কি লাঠির ঘায় 'মা' বলা মোদের ভুলাবি হায়!
তোদের এ বৃথা যাতনা, তা কভু হবে না
যতক্ষণ মোদের থাকে দম্।

—অজ্ঞাত

মুক্তির গান, সতীশ সামন্ত, গা-৪৬, পৃঃ ৫৩-৫৪

৪। কীর্ত্তন—খেমটা

আয় আয় ভাই আয় রে সবে।
কোটি প্রাণ খুলে কোটি তান তুলে কাঁপায়ে গগন কাঁপায়ে ভুবন
জয় জন্মভূমি জয় জয় রবে
শিখ মুসলমান হিন্দুর সন্তান কোটি কোটি ভাই এক হ'য়ে যাই
কি ভয় কি ভয় আর এ ভবে।

—অজ্ঞাত

সঙ্গীতকোষ, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৮১, পৃঃ ৯৯০
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৮৮

৫। রাগিণী সিন্ধু-কাফি—তাল ঢিমা

আসি ভারতভূমে, একবার দেখে যাও আর্য্যগণ।
কোথা, ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকি আদি জনক সনক সনাতন।
বুক ফাটে কি বলব আর, ভারতভূমি চেনা ভার,
নাই আচার, নাই অধিকার, আশ্চর্য পরিবর্ত্তন!
পাপেতে পুরেছে রাজ্য, লোপ হয়েছে বৈধকার্য্য,
হারাইয়ে বল বীর্য্য, হলো দাসত্ব অবলম্বন।
ছিল যে গৌরব কত, সকলি হইল গত,
কীর্ত্তি হত বৃত্তি হত, এবে হত হয় জীবন।
ধনধান্য রত্নভার, সব যায় সিন্ধুপার,
উঠিয়াছে হাহাকার কেহ না করে শ্রবণ।
রেখে গিয়েছিলেন সেই, শাস্ত্ররূপ শস্ত্র এই,
আজও রক্ষা পায় সেই কোনরূপে ধর্ম্ম ধন।
ভ্রাতৃভাব আর নাই দেশে, দগ্ধ হয় দেশ দ্বেষে দ্বেষে।
আর একবার সদুপদেশে, কর সব দুঃখ মোচন।

—হিন্দুমেলা

হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১১৬-১১৭
মাতৃবন্দনা, সম্পা. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৯১
সঙ্গীতকোষ, ২য়, 'ভারত-সঙ্গীত', সম্পা. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৬৫, পৃঃ ৯৮৪
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পা. জলধর সেন, গা-৭০; * রচয়িতার নাম অজ্ঞাত
স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পা. নরেন্দ্রকুমার শীল, গা-৪৬

৬।

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
(আমি) হাসি হাসি পরব ফাঁসী
দেখবে ভারতবাসী ॥
কলের বোমা তৈরী করে
দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ধারে (মাগো)
বড়লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম
আর এক ইংলণ্ডবাসী ॥
শনিবারের বেলা দশটার পরে
জর্জ কোর্টেতে লোক না ধরে (মাগো)
হ'ল অভিরামের দ্বীপচালান মা
ক্ষুদিরামের ফাঁসী ॥
বারো লক্ষ তেত্রিশ কোটি
রইল মা তোর ব্যাটা-বেটি মাগো
তাদের নিয়ে ঘর করিস মা
বৌদের করিস দাসী ॥
দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নিব মাসীর ঘরে (মাগো)
(ও' মা) তখন যদি না চিনতে পারিস
দেখবি গলায় ফাঁসী ॥

—অজ্ঞাত

হাজার বছরের বাংলা গান, গা-৫১, পৃঃ ১৬০-৬১

৭।

এবার বন্দেমাতরং বল সর্ব্বজন
শুনহে ভারতবাসীগণ,
এবার মহাউৎসবে সবে ডাক মাকে ভক্তি ভাবে
তবে ত সুধিবে জীবে এত কার্য্য সাধান।

ত্যাজ বিলাতী বসন, বিলাতী ভূষণ, বিলাতী চিনি ও লবণ
কেহ আর কোর না গ্রহণ।
এ যে সকল জাতীর ধর্ম্ম নষ্ট, হতেছে এ কু-ভোজনে।
এ সকল অজ্ঞাত পাপ, ধর্ম্ম বই আর কেউ না জানে
ভাই এখনে সবে জেনে শুনে ঘৃণা উছলিল মনে,
যে কতদিন আর প্রাণ বাঁচে কোর না গ্রহণ
একবার বন্দেমাতরং বল সর্ব্বজন।
আজ যত হিন্দু মুসলমান—সবে হলে ভাই বুদ্ধিমান
রক্ষা করতে চাও যদি ভাই স-ধর্ম্ম সম্মান।
এ কাজে যে হয়েছে ব্রতী, ব্রতী হয়ে তার প্রতি
ঘুচাও ভারতের দুর্গতি।
সম্প্রতি হয়ে এ সম্পত্তি জনেতে কোর না হেলা
দূরে যাবে সকল জ্বালা।
দিও না প্রাচীন হেলায় সেই পাপসাগরে বিসর্জ্জন
এবার বন্দেমাতরং বল সর্ব্বজন।
আছ যত জ্ঞানীগুণী,—এবার দেখ মুনিগুণী
আহা মরি, আহা মরি, কি আশ্চর্য্য মহীয়সী
যে বেটা আনল কাঁচের চুড়ী, বলে দিল্লীর দরবার
কি বাহার, বাহার মেরে নিল তুলে স্বর্ণরূপা মণি মুক্তাহার।
মনোরঞ্জন বলে ভাই, এসব নেহাৎ একেবারেই কর পরিহার ॥
মিছরী ও লবণ চিনি, সবই দেও বিসর্জ্জন
এবার বদন ভরে বলরে সবাই বন্দেমাতরং ॥

—পল্লীগীতি

পল্লীগীতি ও পূর্ব্ববঙ্গ, পৃঃ ৩৩৬-৩৩৭

৮। সংগ্রামের আহ্বান

এসেছে ডাক, বেজেছে শাঁখ,
কে যাবি আয় আয়;
বেলা যে বহে' যায়।

কোর'না দেরী, কোর'না দেরী,
শোন'নি কানে ভেরী ;
ডেকেছে গুরু, খেলা যে শুরু—
বাহির আঙিনায় ॥
আয়রে তোরা কে দিবি প্রাণ,
কে আজ সব করিবি দান ;
মায়ের লাজ, ঘুচাবি আজ—
সতেজ দৃপ্ততায় ॥

—জাতীয় শিল্পী পরিষদ্

মুক্তির গান, সতীশচন্দ্র সামন্ত, গা-৯৬, পৃঃ ১০৯

৯। রাগিণী আলেয়া—তাল কাওয়ালী

এই ধরাতলে, ধন্য ধন্য ক্ষত্রিয় ললনা।
যবন প্রয়াণকালে, পড়িয়া জঞ্জালজালে
সহিলে কতই যন্ত্রণা—
পরশিলে দুরাশায় সতীত্ব যাবে এই ভয়ে,
অনলে জীবন ঢালিয়ে ভয় ভাবনা।
জ্বালিতে সমরানল, করিতে দেশের কুশল
দিলে ভূষণ সকল, হয়ে প্রসন্ন বদনা
স্বদেশের অনুরাগে, বিরাগে আর মনোরাগে,
পাঠালে যবনের আগে, সুতে করি উত্তেজনা!
যত দিন রহিবে ক্ষিতি, তত দিন রহিবে খ্যাতি,
তোমরাই প্রকৃত সতী, সাধ্বী পতি-পরায়ণা।

হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১১৭

১০। স্বদেশী

এনেছি দেশী সিগারেট।
পরখ করে দেখ দেখি একটি প্যাকেট ॥

দেশী মান্দ্রাজী তামাক, খেলে হবে গো অবাক্,
আবার সুগন্ধে প্রাণ উঠবে মেতে থাকবে নাকো হেট ॥
দেশের জিনিস আদর করে খাও না সবাই ভাই,
আর বিদেশীতে কাজ কি তোমার ছাড়্ না বালাই,
দেশে আর অভাব কিছু নাই,
এখন যা চাবে, তা ঘরেই পাবে, ক্রমে ক্রমে সবই হবে,
আর দেশের লোকের রুটী মেরে ভরিও না বিদেশীর পেট ॥

—অজ্ঞাত

বীণার ঝঙ্কার, সম্পাদক অমৃতলাল বসু, পৃঃ ১১৮

১১।

এখনো কে আছ অবসন্ন প্রাণ,
উঠ, জাগ শোন ভারতসন্তান
মর্ত্তভূমে আজি কি অমর গান
অনন্ত উচ্ছ্বাসে বহিয়া যায়।
দেখহ চাহিয়া কিবা অনুরাগে,
কি সিদ্ধি লভিতে কোন মহা যাগে,
শত শত প্রাণী মিলিয়া ভারতে
প্রমত্ত আজি এ মহাপূজায়।
ভেদিয়া নিবিড় অভেদ্য আধার,
অনন্ত আকাশে যেন পূর্ব্বশার,
ভাতিবে কি রবি তেজ পুঞ্জাকার
সমগ্র ভারতে কাঁপিছে।
শত শত প্রাণী বৈষম্য ভুলিয়া,
অপূর্ব্ব বিস্ময় পুলকে পুরিয়া।
প্রতীক্ষায় তাই আছে দাঁড়াইয়া
সে পদে কি অর্ঘ্য করিবে দান।

—অজ্ঞাত

স্বদেশ-গীতি, গা-২৭, পৃঃ ৩০-৩১

১২।

ও ভাই ভাবনা কি আর আছে গান্ধী রাজা আনবে সুরাজ দুঃখ
যাবে ঘুচেঁ।
(আর) তাঁতী যা'রা আছরে ভাই সব, তাঁতের কাপড় বুনাও বইস্যা।
বাবুরা সব খদ্দর পরবেন ঠাইরেনরাও পরবেন খাশা।
আবার নূতান মন্তর দিছেরে কানে, চরকা তকলী হাতে নিয়ে
(ও) ভাই রাস্তা ঘাটে চল্‌তে ফেরতে তকালীর মেলা দেখ গিয়ে।
এবার কায়েত ভদ্দর বেরাম্ভণ, যত আছেন বৈদ্যজন
সবাই এবার তাঁতের কাপড় বায়না দিছে, ভাই সাহেবের দুঃখু গেছে
এবার বুঝি সুদিন আইল, সুরাজ ঘরে আইসা গেল
এবার একই সঙ্গে গাও দেহি ভাই গান্ধী রাজের জয়॥

—পল্লীগীতি

পল্লীগীতি ও পূর্ব্ববঙ্গ, চিত্তরঞ্জন দেব, পৃঃ ৩৩৮

১৩। আজাদ হিন্দ ফৌজের রণসংগীত

কদম কদম বঢ়ায়ে জা,
খুশীকে গীত গায়ে জা।
য়হ জিন্দগী হৈ কৌমকী,
তো কৌম পর লুটায়ে জা॥

তূঁ শেরে হিন্দ্‌ আগে বঢ়্‌,
মরণসে ফির ভী তূঁ ন ডর।
আসমান তক্‌ উঠাকে সর,
জোশে বতন বঢ়ায়ে জা॥

তেরী হিম্মত বঢ়তী রহে,
খুদা তেরী শুনতা রহে।
জো সামনে তেরে চঢ়ে,
তো খাঁকমে মিলায়ে জা॥

চল দিল্লী পুকারকে,
কৌমী নিশান সম্‌হালকে।
লাল কিল্লে পর গাড়্‌কে,
লহরায়ে জা, লহরায়ে জা ॥

মুক্তির গান, সতীশচন্দ্র সামন্ত, পৃঃ ৪২
স্বদেশ সঙ্গীত, মুরারি দে, পৃঃ ৪১
ভারতের স্বদেশী গান, কমল রায়চৌধুরী, গা-১৩, পৃঃ ১৭

১৪। রাগিণী মুলতান—তাল একতালা

কবে উদিবে সৌভাগ্য ভানু ভারতবরষে।
পোহাইবে দুঃখ নিশা প্রভাত পরশে ॥
সভ্যতা সরোজ লতা, প্রাপ্ত হবে প্রবলতা,
প্রস্ফুটিবে মুখাম্বুজ, মানস সরসে।
উন্নতি মরাল কুলে, ভ্রমিবে সলিলে কূলে,
প্রকৃতি প্রমোদে ভুলে, হাসিবে হরিষে ॥
উৎসাহেরি উপবনে, একতার সুপবনে,
কামনা কুসুম কলি ফুটিবে সরসে ;
দেশহিতাকাঙ্ক্ষী জনে, অলিসম সদাক্ষণে,
মাতিবে মোহিত হয়ে মধুময় রসে ॥

হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১১৬

১৫।

কে বাজিয়ে সিংঙ্গা, কোন্ তুঙ্গ শৃঙ্গে
এমন মর্ম্ম বিধিয়ে,
সে মহানিনাদে জাগিছে ভারত
ঘুম ঘোর ভাঙ্গিয়ে ;
সে মহাআহ্বানে নাহি বর্ণভেদ,
ভারত অধ্যায়ে (এই) নব পরিচ্ছেদ,

উঠিবে কি সৌধ করি মেঘ ভেদ
হেরিবে জগত বিস্ময়ে ॥
এ মহাসমরে রুধিরের ধারা
না বহিবে স্রোত তবুও আমরা
জয়ী হ'য়ে হবে জয় মাল্য পরা,
হিংসাদ্বেষ ভুলিয়ে ॥
তোরা মার অতি পবিত্র সন্তান,
যুবক বালক শ্রমিক কৃষাণ্—
হাতে লয়ে আজ বিজয় নিশান
আয়রে সকলে ছুটিয়ে—
এ যে সেনাপতি বোনাপার্টি নয়
তবুও ঘটিবে কি মহাপ্রলয়
পাইবে নেটালে সেই পরিচয়
কত শৌর্য্য কাছে হটিয়ে।
বর্ত্তমান যুগে নিমাই সন্ন্যাস,
হেরিতে কাহারো (যদি) থাকে অভিলাষ ;
সর্ব্বত্যাগী ঐ দাঁড়িয়ে শ্রীদাশ,
এসেছে সে ডাকে বেরিয়ে ॥

—অজ্ঞাত

স্বদেশ-গীতি, গা-৪০, পৃঃ ৪৪

১৬। ইমনকল্যাণ—ঠুংরি

কাঁপায়ে মেদিনী, কর জয়ধ্বনি,
জাগিয়া উঠুক মৃত প্রাণ ;
জীবন রণে জীবন দানে
সবারে করহে আগুয়ান্।
হাতে হাতে ধরি ধরি দাঁড়াইব সারি সারি
প্রাণে বাঁধিতে হবে প্রাণ
আলস্য জড়তা নিরাশ বারতা
দূরে করিবে প্রয়াণ

তরুণ-তপনে মধুর কিরণে
সদা কি হাসিবে প্রাণ ?
সুখের কোলে ভাবেতে গলে
কে রবে কে রবে শয়ান ?
সাধিতে বীরের কাজ পরহে বীরের সাজ
করে ধর সাহস কৃপাণ
জীবনব্রত সাধ অবিরত
এ নহে বিরামের স্থান।

—অজ্ঞাত

অর্ঘ্য, 'স্বরাজ সঙ্গীত', গা-২১, পৃঃ ২৫-২৬
বন্দনা (২য় খণ্ড), নলিনীরঞ্জন সরকার, পৃঃ ৮

১৭। খাম্বাজ—চৌতাল

কোথা গো মা ভিক্টোরিয়া মিনতি করি চরণে
মা হয়ে মা কেমন ধারা সন্তানে না কর মনে
কব কত দুঃখের কথা জানাব কি মনের ব্যথা
দয়া কর ওগো মাতা তব দীন পুত্রগণে
চারিদিকে হাহাকার অসন্তোষের নাহি পার
অন্নাভাবে বাঁচা ভার কেমনে ধরি জীবনে ?
অনুগ্রহ নাহি চাই যেন সুবিচার পাই—
এই ভিক্ষা তব ঠাঁই করি মা একান্ত মনে।

সঙ্গীতকোষ, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৭৯, পৃঃ ৯৯০

১৮।

"ক্ষুদিরাম গেল হাসিতে হাসিতে
ফাঁসীতে করিতে জীবন শেষ।
পাপিষ্ঠ নরেনে বধিল কানাই
সত্যেন ধন্য করিল দেশ।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, অপর্ণা দেবী, পৃঃ ৩২

১৯।

গেল রে সোনার বাংলা রসাতলে পাপের ফেরে।
কি দিয়া কি কৈরা নিল দেখ্‌লি না রে হিসাব কৈরে।
দেশের জোলা তাঁতী কামার ফেইল্‌ পইড়া করে হাহাকার,
এ অত্যাচারে
এখন বিদেশ যদি না দেয় কাপড় বাকল্‌ পৈরে থাকবে রে
দেশের মঙ্গল চাহ যদি, ভাই হও রে ভাইয়ের সাথী সকল কাজে
দেশী জিনিস ব্যবহার কর, তবে বাংলা যাবে রে তইরে॥

—ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতি

২০। 'সহীদ তর্পণ'

চরণে চরণে কন্টক যারা গেল দলি'—
আহা তারা কি দেবতা সকল দুঃখাতীত,
মরণের পথে হাসিমুখে যারা গেল চলি'—
আহা তারা কি দেবতা শঙ্কারহিত চিত:

দুর্যোগ ঘন সঙ্কটময় দিনে—
তিমির আদারে পথ নিল তারা চিনে,
দুঃখের মাঝে জ্বালিল আশার শিখা—
আহা তারা কি দেবতা যুগ যুগ নন্দিত।

সংশয়-ভয় তুচ্ছ তাদের কাছে,
মুক্তির লাগি' বন্ধন যারা যাচে,
যাদের পরশে পুণ্য পাষাণ-কারা—
আহা তারা কি দেবতা চির-মহিমান্বিত॥

—জাতীয় শিল্পী পরিষদ্‌

মুক্তির গান, গা-৯৫, পৃঃ ১০৮-৯

২১। স্বদেশী ইমন—একতালা

ছন্দে ছন্দে নব আনন্দে গাও রে বন্দেমাতরম্।
সদা সত্য স্নিগ্ধ শুদ্ধ বল রে বন্দেমাতরম্॥
সকল ভারত-বল-বিধায়িনী,
বাণী বন্দেমাতরম্।
ভজনে সাধনে শয়নে স্বপনে
সাধ রে বন্দেমাতরম্॥
দিব্য চক্ষে ঐ যায় দেখা,
বিদ্যুতাক্ষরে জলদে আঁকা,
বিধির আদেশ কর রে পালন
ভজ রে বন্দেমাতরম্॥

—অজ্ঞাত

বীণার ঝঙ্কার, অমৃতলাল বসু, পৃঃ ৪৪

২২। রাগিণী পরজ—তাল একতালা

ছাড় হে অসার অলস, প্রস্তুত হও লভিতে যশ।
সাধন কর ভারতের, উন্নতি জন-সমাজে।
নিরখি দেখ কাল বিকল, পূর্ববিভব সকল বিফল।
অঙ্গভঙ্গ জন্ম-ভূমি, নতশির হয় লাজে॥
যাহে দুখ ভার যায়, একতায় সে উপায়।
ত্যজ ত্যজ ঔদাস্য ভাব, রত হও নিজ কাযে॥
মিলনে হয় হীন সবল, মিলিলে অতি লঘুতৃণ দল,
পায় লৌহ শৃঙ্খল বল, বান্ধে গজরাজে॥

হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১১৬

২৩।

জাগরে জাগরে ভারত সন্তান।
হিন্দু মুসলমান, হয়ে এক প্রাণ,
স্বদেশের হিতে সবে কর আত্মদান।

যে যেখানে ছিল সকলে জাগিল,
আপনার কাজ আপনি সাধিল,
আপনার পায়ে আপনি দাঁড়াল,
তার সাক্ষী দেখ দেখরে জাপান।
তোমাদের জ্ঞান তোমাদের প্রাণ,
তোমাদের শিল্প তোমাদের বিজ্ঞান,
লইয়া সকলে পেয়েছে পরাণ,
তোমরাই কেবল জড়ের (মৃত) সমান,
(স্বদেশের) নিজেদের অন্ন বিদেশে পাঠায়ে,
নিজেদের ধন পর হাতে দিয়ে,
কতকাল রবে পরমুখ চেয়ে,
সহিবে বল কত অপমান।
ধিক্‌রে জীবনে কর কিবা কাজ,
বদন দেখাতে নাহি হয় লাজ,
এখন কিনিছ বিদেশীয় সাজ,
হায় কি নি-লাজ পরাণ।
মার ছিন্ন দেহ দেখরে চাহিয়ে,
কাঙ্গালিনী বেশে আছেন বসিয়ে,
ঝরিতেছে অশ্রু অবিরল ধারে,
শোকে তাপে হ'য়ে ম্রিয়মাণ।
ত্রিশকোটী ছেলে মায়ের থাকিতে
পারে না কি মায়ের দুঃখ বিনাশিতে ?
এস এস ভাই সবে এক মতে,
করি মার দুঃখ অবসান,
জুড়াই মার তাপিত পরাণ।
উঠ নরনারী কোটী বদ্ধ করি,
এস সবে মিলি হুহুঙ্কার করি,
বল জয় জয় ভারতের জয়,
উড়ায়ে বিজয় নিশান।

—অজ্ঞাত

মাতৃপূজা, প্রকাশক হ. বসু, কালিকাতা, ১৯০৬, গা-২১, পৃঃ ২২-২৩

২৪।

জাগে নব ভারতের জনতা।
একজাতি একপ্রাণ একতা॥

একই স্বপনে-পাওয়া নূতন পথে,
এক সুখে দুখে ধাওয়া নূতন রথে,
আসে নব ভারতের আত্মার সারথি এ কংগ্রেস,
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে আলোড়িয়া শত প্রাণ শত দেশ,
মুক্তির একতারে বাজে সেই বারতা।
একজাতি একপ্রাণ একতা॥

আমার চলার পথে বাঁশি দিল যে,
আমার আঁধার ঘরে বাতি দিল যে,
ভূ-ভারত অধিরাজ চিনিয়াছি তোমারে যে কংগ্রেস,
নিজেরেও চিনিয়াছি, ঘুচাইলে মনোমাঝে মোহাবেশ,
ধনী দীন মাঝে তুমি আনিয়াছ সমতা।
একজাতি একপ্রাণ একতা॥

তুমি স্তবধ্বনি শত দেবদেউলের,
শুভ্র মমতা তুমি তাজমহলের,
মহাভারতের তুমি ·ব হিমালয়,
গংগার ধারা তুমি কলগীতিময়,
জাগ্রত জনগণ গৌরবে জানিয়াছে সে কথা,
একজাতি একপ্রাণ একতা॥

হিন্দু-মুসলমান-অস্থির বজ্র এ কংগ্রেস,
নবযুগসাধিকার চিত্তের শংখ এ কংগ্রেস,
শঙ্কা ও শৃঙ্খল অন্তরে ভাঙিল যে কংগ্রেস,
নবসুরে নবরঙে কোটিপ্রাণ রাঙিল যে কংগ্রেস,
চেতনার স্পন্দনে ভাঙিয়াছে জড়তা,
একজাতি একপ্রাণ একতা॥

—অভ্যুদয়

মুক্তির গান, সতীশচন্দ্র সামন্ত, গা-৪০, পৃঃ ৪৮-৪৯
ভারতের স্বদেশী গান, কমল রায়চৌধুরী, গা-২, পৃঃ ২-৪

২৫।

তাহাদের রেখো স্মরণে—
যারা নিঃশেষে, প্রাণ দিল হেসে,
অমর যাহারা মরণে।
এ মাটির প্রতি ধূলি কণিকায়—
লিখে রেখে গেল শোণিত লিখায়—
মুক্তির বাণী যারা ;
হে ভারতবাসী ভুল না তাদের
অমৃত পুত্র তারা।
তাহাদের স্মৃতি, মনে রেখ নিতি
প্রণাম যানায়ো চরণে॥

তোমাদের লাগি' আপনি তাহারা
নিয়েছে দুঃখব্রত
হে ভারতবাসী কৃতজ্ঞতায়
কর আজ মাথা নত।
জীবনে তাদের কর নাই দান—
কোন ফুলমালা, কোন সম্মান,
মরণের পারে শান্তি তাদের
মাগিও অভয় স্মরণে॥

—জাতীয় শিল্পী পরিষদ্

মুক্তির গান, সতীশচন্দ্র সামন্ত, গা-৯৭, পৃঃ ১১০

২৬।

নিশান রাখ উঁচু, তাতে যায় যদি যাক প্রাণ ;
পেতেই হবে মুক্তি দেশের, রাখতে হবে মান।
সুবর্ণভূমি আঁধার আজিকে শ্মশান বহ্নি-ধূমে—
চল্লিশকোটি প্রাণ কি রহিবে অচেতন মোহ ঘুমে ?
ছুটে আয়, ওরে কে আছ কোথায়, এসেছে যে আহ্বান—
দিতে হবে প্রাণ, দিতে হবে প্রাণ, দিতে হবে আজ প্রাণ।

ভয় কিরে তোর, ভাবনা কেন, শঙ্কা কিসের ওরে ?
বাজাও জয়শঙ্খ ওরে বাজাও আজি জোরে ;
উচ্চে গাহ গান
যায় যদি যাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ।
পথ জানা নাই, নাই থাক্ তবু চলতে হবে আগে,
ছেড়ে যাবে যারা, ছেড়ে যাক্, তবু থাক তোরা পুরোভাগে
সামনের বাধা ভেঙে ফেল, কর তারে খান্ খান্,
যায় যদি যাক্ প্রাণ, যায় যদি যাক্ প্রাণ, যায় যদি যাক্ প্রাণ॥

—জাতীয় শিল্পী পরিষদ্

মুক্তির গান, গা-৯৯, পৃঃ ১১১-১২
ভারতেব স্বদেশী গান, কমল রায়চৌধুরী, গা-২৮, পৃঃ ৩০

১৭।

বন্ধনভয় তুচ্ছ করেছি উচ্চে তুলেছি মাথা
আর কেহ নয় জেনেছি মোরাই মোদের পরিত্রাতা।
করিব অথবা মরিব—এ পণ
ভরিয়া তুলেছে ভারত ভুবন।
স্বপ্নের মাঝে শুনিতেছি যেন স্বাধীন ভারতগাথা।
জয় জয় জয়, ভারতের জয়, জয়তু ভারতমাতা॥
শুনিতেছ নাকি শৃঙ্খল ওই ভাঙ্গিতেছে খান্ খান্,
মুক্তি কেতন উড়িছে আকাশে তারি বন্দনা গান॥
করিব অথবা মরিব এ পণ
ভরিয়া তুলেছে ভারত ভুবন
লক্ষ প্রাণের বলি বেদীমূলে নূতন আসন পাতা
জয় জয় জয়, ভারতের জয়, জয়তু ভারতমাতা।
বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্॥

—অভ্যুদয়

হাজার বছরের বাংলা গান, গা-৫৯, পৃঃ ১৬৮-৬৯

২৮। জাতীয় সঙ্গীত খাম্বাজ—একতালা

ভারত যশ-কীর্তন
করিয়ে কাটাব এ ছাড় জীবন।
বেদ বীণা লয়ে করে, স্বদেশী-বিদেশী ঘরে,
গাইব করুণস্বরে করেছি মনন।
উচল-অচল শিরে, গাইব বন মাঝারে,
গাইব সাগরতীরে যখন তখন!
বনের বিহঙ্গ ধ'রে শিখাব যতন ক'রে;
গাইবে মধুর স্বরে ছাইয়া গগন।
দেখা ক'রে অলিসনে ব'লে দিব কানে কানে
গাইবে কুসুমবনে মাতায়ে পবন।
নির্জীব সজীব হ'বে, মরুভূমে ফল দিবে;
গাইবে জয় জয় রবে জ্বলন্ত তপন।

জাতীয় সঙ্গীত, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ দাস, গা-১, পৃঃ ১
সঙ্গীতকোষ, ২য় খণ্ড, উপেন্দ্রনাথ দাস, গা-৩১৪৬, পৃঃ ৯৭৭

২৯। লুং ঝিঁঝিট—একতালা

ভারতীজননী মলিনবদনী
অশ্রুজলমুখে শোকশেল বুকে কাঁদেন ভারত দুঃখে দিবস রজনী
ভারত শ্মশানে সঞ্চারিতে প্রাণে সাধেন কি শক্তি ধ্যানে মৃতসঞ্জীবনী
যদি পুনঃ জাগে সে দীপক রা…
নির্জীব ভারতে হবে পুনঃ জয়ধ্বনি।

-অজ্ঞাত

সঙ্গীতকোষ, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৫৭, পৃঃ ৯৮১
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৬৩

৩০।

ভায়ে ভায়ে বিসম্বাদে ভেঙ্গ না একতা বল,
বিদেশীর যাদুমন্ত্রে কেনরে হ'লে পাগল ?
এক পুকুরে করি স্নান, এক পুকুরে খাই জল,
একই দেশে করি বসতি ; একই দেশে খাই ফল।
তুমি হিন্দু, আমি মুসলমান, সবাইত বাঙ্গালীর দল।
একই সূত্রে গাঁথা মোরা একই ভাণ্ডে অন্নজল।
তুমি আমার, আমি তোমার সুখে দুঃখে বাহুবল,
রাত্ পোহালে দেখা দেখি, না দেখিলে হই চঞ্চল।
তোমার আমার গৃহবাদে, দেশটা যাবে রসাতল।
তোমার আমার বিবাদ রাখা, বিদেশীর এই কল কৌশল।

—অজ্ঞাত

স্বদেশ-গীতি, প্রকাশক হরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, গা-১৫, পৃঃ ১৬-১৭

৩১।

ভুল না ভুল না এদেশের কথা, এ যে বিক্রমের দেশ রে।
বত্রিশ সিংহাসন কোহিনূর মণি
তাল বেতাল যাদের ঘরে বাঁধা ছিল রে॥
এদেশের ছেলে চন্দ*, বাদল, পুত্ত,
জয়মল্ল, প্রতাপ, প্রতাপাদিত্য ;
কুমার মোহন, আদিল, মীরমদন,
রাজসিংহ, শিবাজী, দুর্গাদাসরে॥
এদেশের মেয়ে খনা, লীলাবতী,
পদ্মিনী, ভবানী, কর্ম্মদেবী, দুর্গাবতী ;
এদেশের মেয়ে ছিল চাঁদবিবি,
বীর্য্যবতী মেয়ে হারা'ল আকবরে॥

যাদের ছিল রঙ্গস্থল পাণিপথ মিরাট,
চিনিলওয়ালা সিন্ধু, হলদিঘাট,
যারা হীরাট হ'তে ছুটিত কর্নাট
খেলিত যাহারা দৃশদ্বতী তীরে ॥

—অজ্ঞাত

মাতৃমন্ত্র, গা-৩, পৃঃ ৩
স্বদেশ-গীতি, গা-৩৭, পৃঃ ৪০-৪১
* একটি গানে চণ্ড

৩২ । স্বদেশী

মায়ের ক্ষেতে ফলে পাকা সোনা, যেন মাণিক ঢালা ।
মায়ের ঘরে ঘরে দেখ গিয়ে রতন-প্রদীপ জ্বালা ॥
(মোদের সোনা মা)
মায়ের মুখের হাসিরাশি ফুটে জোছনায়,
মায়ের কণা আঁচোর চুরি করে মলয়-বায়,
মায়ের দশভুজে শোভে দশ প্রহরণ,
দুই পদে করেন মাতা অসুরে দলন,
এস সপ্তকোটিকণ্ঠে গাই মায়ের নাম-গান,
মায়ের চরণে সঁপিব আমরা সপ্তকোটি প্রাণ,
(আমরা মায়েরি সন্তান)
আমরা মা বিনা কারেও জানি না,
মা আমাদের সোনা, (মোদের সোনা মা) ॥

—অজ্ঞাত

বীণার ঝঙ্কার, পৃঃ ১১৮

৩৩ । ললিত—আড়া

যদি গাবে গাও বঙ্গে দুঃখের কাহিনী
মিলিয়া সহস্রস্বরে মাতাও মেদিনী

কামিনী কোমল গানে—মোজ না যুবকগণে
রসাতলে যেও নাক মদিরা সেবনে
উদ্বোধিয়া সাধুভাবে জাগাও নিদ্রিত জীবে
পুলকে বঙ্গের অঙ্গে নাচুক ধমনী
আর দুঃখ সহে না দেখিলে যাতনা
দিবানিশি দেখিতেছ তবুও ভাবনা—
বঙ্গের বিলাপগীত উঠুক গগনে
ভাসুক নয়ন নীরে বঙ্গের কামিনী।

—অজ্ঞাত

সঙ্গীতকোষ, গা-৩১৭৭, পৃঃ ৯৮৯
সূচীপত্রে গানটির বা রচয়িতার নাম উল্লিখিত নেই।
জাতীয় উচ্ছ্বাস, গা-৮৭

৩৪।

হে বঙ্গজননি, স্বর্ণ-প্রসবিনী,
আর মাগো তুমি কেঁদো না কেঁদো না।
ভাই ভাই মিলে, আমরা সকলে,
শিখেছি দেখাতে সমবেদনা।
কাঞ্চনে ফেলিয়ে, কাচে গের দিয়ে,
পাইয়ে অশেষ অন্তর-যাতনা।
মাগো তোর তরে, আজি ঘরে ঘরে,
শিখেছে সবাই করিতে ভাবনা।
বিলাতি বসনে, বিলাতি ভূষণে,
বিলাতি পোষাকে আর সাজিব না।
বিলাতি আহার, বিলাতি আচার,
ত্যজিতে করিব নীরব সাধনা।

(কলিকাতার ছাত্রসমাজ, ১৯০৬ খৃঃ গীত)

জাতীয় সঙ্গীত, পৃঃ ১০
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পৃঃ ১৯১-৯২

৩৫।

হুন ছিলিম চাচা, আইজ এ্যাক তুস্কুর হইয়্যা কৈবার চাই-আই-আই।
দ্যাশে এ্যাক বাও যে আইছে, যিবা চন্‌কা হিবা বইছে
বিলাইতি আর বোলে কিনন নাহি নাই-আঁই-আহাঁ-আই॥
কংজুনা নাট বাহাদুর দিছে পরাণা
বেবাক্ পরজা মুনীর কৈল্ল তালকানা
এহন কুম্পুনীর মল্লুক গ্যাল্ কুঠ্‌ঠাইকার কুন্ আসামো নিয়া
করবো খাজনা—আয়-আহা-আ॥
বাংলা মল্লুক বোর জবর,
এহানো বাপ দাদার হইছে কবর,
খবরাখবর কত বাতশা কর্‌ছে আজিত্বি-ই-ই—
এহন কুম্পুনী যাব কাবু অইয়া
খাজনা করবো ছত্রান অইয়া
মোহারাণীর আজিত্বে বাই ইকি বিকিত্তি—ইয়-ইহী-ইঃ॥
জগন্নাথ্‌গঞ্জ জাহাজ গাট আছে,
হেই জাহাজো যাওন সহরে,—
ছিলট পিচ্ছিল হিলং মিল—অং-অং
কুন্‌ঠাই নিবো আমাগরে-এয়-এহে-এ।
হে যে সতব অইলে গো জ্বর
প্যাটে অগ্‌টানা দরে,—এ, এ—
দিক্কে, অইল বালা ও নাজির বাই, গো-ও—
এ্যাহন মামানী হাইল্লো ফিলাই লইয়া
আইওগো গরে—এয়-এহে-এ॥
য্যাত মুন্‌সী মৌলায় করছে কুমৃটি
হুনাহুন্ হুনলাইম এঠাইতি
আরাম য্যাত নিমক চিনি কাপইর বিলাইতি ইহী-ঈ।

দ্যাশে বোলে কল অইতাছে,
হে হান থনে কাপইর চিনি আইবো হবাকার—আর-আহা-আর॥

নোয়ার হান্‌কী মোরা আছে খ্যাত,
বাইঙ্গা চুইরা ফালাও পথত,
মাও বহিন বিরাদার সজন
বাংখাও উইল্টা পাতাতো—ওহো-ও।

... ...

টাঙ্গাইল (মৈমনসিংহ)

বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬১-৪৬৩

৩৬। রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল

সতত রত হও যতনে, দেশহিত সাধনে
একমত ভাব ধরি, এক তানে।
অতুল বল মিলন হয়, সফল হয় মনন চয়
বিমল সুখ সলিল বয়, বিদ্যমানে॥
কি ছিল গুণ কি হল বল, কি হল সব বিভব বল,
ধিক জনম ধন বিফল হীন মানে।
বিনয় করি বচন ধর, খল অলস গরল হর,
যশ কুসুম চয়ন কর, পু..ক প্রাণে॥

—অজ্ঞাত

হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১১৫

৩৭। প্রসাদী সুর

সুখে যাবে সুখসাগরে ;—
ধর বয়কট্ বৈঠা শক্ত ক'রে।
সাহস পাল, বয়কট্ বৈঠা,
তেত্রিশ শত লক্ষ দাঁড়ে,
ডিঙাইবে বিপদ-সাগর,
ঠেক্‌বে না মৈনাক পাহাড়ে।

নৌকার চল্‌তি হেরি ; প্রাণে ডরি ;
হাঙ্গর, কুম্ভীর যাবে দূরে।
গিয়ে তাপিতাঙ্গ কর শীতল,
সুখ-সাগরে সুখের নীরে।
নিরাশ বাত্যায় পথ ভুলিয়ে
ঠেকিলে আলস্য চরে,
টেন অধ্যবসায় শক্ত গুণে—
প্রতিজ্ঞা-মাস্তুলে জু'ড়ে
(বড) ঢেউ হেরিয়ে প্রাণের ভয়ে
কেন র'লে হাত পা ছেড়ে ;
বলে কমরালী আদব বলি
ছাড নৌকা এ জুয়ারে।

—অজ্ঞাত

বন্দনা, নলিনীরঞ্জন সবকার, গা-৪১, পৃঃ ৬০-৬১

৩৮। খেলাফৎ গান

কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য কিসের লজ্জা কিসের ভয় ?
চল্লিশ কোটি ভ্রাতৃ মিলিয়া গাহিব যখন ধর্ম্মের জয়।
কষ্টের ভয়ে যখন আমার দেহ ছাড়িয়া যাইবে প্রাণ।
আমা হইতে মহান্ বীর প্রতিরুধির করিবে দান ॥
ধরা হইতে পাপের সরা মুছিতে মোস্লেম জনম লয়
পাপীর বিনাশ করিতে সাধন সহায় অপার মহিমাময়।
কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য কিসের লজ্জা কিসের ভয় ?
ইসলাম খলিফা করিতে ধ্বংস কখনো পারেনি' পারেনি' কেউ
ধ্বংসের স্রোতে ডুবিবে অরি, যখন উঠিবে উঠিবে ঢেউ।
খলিফা ধ্বংস করিতে সাদ্দাদ পারেনি কখনো পারেনি ফেরুওয়ান
ধ্বংস করিতে যাইয়া ধ্বংস হয়েছে কত বীর পালওয়ান।
মক্কা বিজয় করিতে যাইয়া আম্‌হাবে ফিল পাইল লয়।
আরাবীলের ক্ষুদ্রশক্তি বিরাট বাহিনী করিল জয় ॥

কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য কিসের লজ্জা কিসের ভয় ?
তোদের ডাকে জাগিল জগত জাগিল বর্ব্বর ইউরোপদেশ
তোদের শিক্ষার আলোক পাইয়া পরিতে পারিল সুসভ্য বেশ।
কিন্তু বুঝি না কালের গতি উলট পালট হইল সব
শিক্ষার অভাবে রয়েছে মরিয়া নাহিক মুখে একটু রব।
স্বাধীনতা যদিও নাহিক এবে সেজন্য তোদের কি আছে ভয়
স্বাধীন ইসলাম, স্বাধীন মোস্লেম, মানব স্বাধীন সতত রয়।
কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য কিসের লজ্জা কিসের ভয় ?

খেলাফৎ সঙ্গীত, আবদুল মতিন, গা-৪, পৃঃ ৩-৪

৩৯। খেলাফৎ গান

তুর্কীর সৈন্য, তুর্কীর বল, তুর্কীর ধন ও জনবল
বৃদ্ধি হউক বৃদ্ধি হউক বৃদ্ধি হউক হে খোদাওয়ান্দ।
তুর্কীর মাটি তুর্কীর জল তুর্কীর বায়ু তুর্কীর ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে খোদাওয়ান্দ ॥
তুর্কীর বাণী তুর্কীর গান তুর্কীর কথা তুর্কীর পণ
সত্য হউক সত্য হউক সত্য হউক হে খোদাওয়ান্দ ॥
তুর্কীর শঙ্কা তুর্কীর ভয় তুর্কীর শত্রু অরাতিচয়
লয় হউক লয় হউক লয় হউক হে খোদাওয়ান্দ।
তুর্কীর আশা তুর্কীর খেদ তুর্কী জাতির মহান জেদ
জয় হউক জয় হউক জয় হউক হে খোদাওয়ান্দ ॥

খেলাফৎ সঙ্গীত, আবদুল মতিন, গা-৩, পৃঃ ২-৩

৪০। খেলাফৎ গান

দেশ আজি ডাক্‌ছে তোরে
থাকিস্ নে আর ঘুমঘোরে
মরার মত থাক্‌বি যত
লুপ্ত গৌরব পা'বে নারে।
দেশ আজি ডাকছে তোরে ॥

আস্‌বে যদি আয়রে আয়
দেশটা আবার তোকেই চায়
বণিক জাতি মারবে লাথি
সে ব্যথা আর সইবে নারে ॥
দাসত্ব পশরা ফেলিয়া দিলে
স্বাধীনতা ধন মাথায় নিলে
আমার দেশে ভিখারী বেশে
মরবে না কেউ অনাহারে ॥
তোমরা যে মানুষ জাতি
জানুক নিখিল বসুমতি
পাখীর মত মরবি কত
ভায়ার বন্দুক শিকারে।

খেলাফৎ সঙ্গীত, আবদুল মতিন, গা-৭, পৃঃ ৭-৮

৪১। খেলাফৎ গান

কি জানি কি সুরে গাহিব গান
সে যে গো আজ গিয়াছি ভুলে।
ভুলে গেছি সুর ভুলে গেছি তাল
তাইত হে ঘটে সদাই বেতাল
ধরণী কাঁদিছে 'সামাল' 'সামাল'
তরী বুঝি ডুবে সাগরকূলে।
ভেঙ্গে গেছে মোর বীণাখান
কি লয়ে আজিকে গাব আমি গান
কেবা ধরে আজ মম সনে তান
সকলে ঘুমায় নিদ্রার কোলে।
সে দিন কি ফিরে আসিবে আবার
বিলাল লইয়ে সঙ্গীত সম্ভার
মাতাইতে প্রাণ এ বসুধার
জাগিতে সবাই আঁখিটি খুলে।

আসুক আবার সালাহ উসমান
বিয়াল্লিশ কোটী হ'য়ে একপ্রাণ
গাহিব যখন 'আল্লাহু মহান'
অরি লয় পাবে ক্রন্দন রোলে ॥

খেলাফৎ সঙ্গীত, আবদুল মতিন, গা-১, পৃঃ ১-২

৪২।

কানে কানে প্রাণে প্রাণে
মায়ের নাম আজ কে শুনাল
সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে আট কোটী
প্রাণ কে মাতাল।
বন্দেমাতরম্ মাতরম্ উঠছে ধ্বনি কি মধুরম্
মরতের জয়ধ্বনি স্বর্গের আসন কাঁপাইল।
শক্তি খেলে মায়ের নামে
পাষাণ গলে মায়ের গানে।
ভক্তিরস লীলা এবে নবীন বেশে দেখা দিল।
মরা প্রাণে ধরে আগুন প্রাণ পেয়ে প্রাণ জ্বলছে দ্বিগুণ
যা ভাবি নাই, যা শুনি নাই
সে আগুন আজ কে জ্বালাইল।

—এ্যান্টি পার্টিশন প্রোসেসন পার্টি

জাতীয় সঙ্গীত, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ দাস, পৃঃ ২৬

৪৩।

জাগ ভারতবাসি গাও বন্দেমাতরম্
আজ কোটী কণ্ঠে কোটী স্বরে—
উঠুক বেজে মাতরম্
(বন্দেমাতরম্ বলে রে, কোটী কণ্ঠে)

পেলে জননীর কোল—হতে হয় কিরে বিহ্বল,
মাকে দেখরে চেয়ে—বুক খালি আজ
অশ্রু নীরে ··· রিতম্।
(কোটী কোটী থাক্‌তে ছেলে—দেখ্‌রে চেয়ে)
এস এস সবে ভাই, সে কাল নিশি আর যে নাই,
এই জীবনটা ভোর ঘুমিয়ে কেটে
ঘুমাবার সাধ তবু এখন।
(অচেতন হয়ে রে ভাই,—এ জীবনটা ভ'র)
দেখ্‌ সোনার রাঙ্গামায়—কি করিয়াছে হায়
কোথা বিদেশ হ'তে বণিক এসে
হ'রে নিল সকল ধন।
(দলে বলে ছলে রে—বিদেশ হ'তে)
বুকে সাহসেরি ডোর—ভাই বাঁধ করে জোর,
প্রাণ থাক্‌তে দেহে মায়ের ছেলে সইবে
কি মার নির্য্যাতন।
(কোটী কোটী থাক্‌তে ছেলে)

—এ্যান্টি পার্টিশন প্রোসেসন পার্টি

জাতীয় সঙ্গীত, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ দাস, পৃঃ ১৩-১৪

৪৪। বাউলের সুর

সবে আয় রে আয়, জীবন উৎসর্গ করি মায়ের সেবায়।
হল বঙ্গ লণ্ডভণ্ড, তাকে কেটে কর্‌লে দুই খণ্ড,
থাকবো মোরা একই খণ্ড, সোনার বাঙ্গলায়।
আয় রে যাই ঘরে ঘরে, বলি রে মিনতি করে,
জাগ রে ভাই সত্বরে, সময় বয়ে যায়।
পরব না আর বিলাতী কাপড়, মায়ের দ্রব্যে করব আদর,
পরব মোটা ধুতি-চাদর, দিবেন যাহা মায়।
কর্‌ব দেশে বাণিজ্য বিস্তার, ঘুচিবে দুর্দ্দশা এবার,
হবে পূর্ণ ধনভাণ্ডার, সন্দেহ কি তায়।

আয় রে করি স্বার্থ বলিদান, হইবে এ দেশের কল্যাণ,
চাহিয়ে দেখ রে জাপান, যে আছ যথায়।
স্বদেশের উন্নতি তরে, থাক রে আত্মনির্ভরে
কাজ নাই আর ভিক্ষা করে, অপমান ভিক্ষায়।
নিজের ভাল পরের কাছে চায়, সে এ-কূল ও-কূল দুকূল হারায়
তাহার দুর্গতি না যায়, মরে দুরাশায়।
কর্‌ব ধন্য মানব-জীবন, পূজা করি মায়ের চরণ,
হবে না কখন মরণ, বিদিত ধরায়।
আয় রে বন্দেমাতরম্ বলে, মায়ের নাম গাই সকলে,
বলী হব নব বলে, সিদ্ধ সাধনায়।

(এ্যান্টি পার্টিশন প্রোসেসন পার্টি, ১৯০৭ খৃঃ গীত)

জাতীয় সঙ্গীত, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ দাস, পৃঃ ৩৮-৩৯
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পৃঃ ১৯২

৪৫। ইমন কাওয়ালী

আজি শৃঙ্খলে বাজিছে মাভৈঃ বরাভয়।
এযে আনন্দ-বন্ধন ক্রন্দন নয়।
ওরে নাশিতে সবার এই বন্ধন-ত্রাস,
মোরা শৃঙ্খল ধরি' তা'রে করি উপহাস,
সহি নিপীড়ন পীড়নের আয়ু করি হ্রাস,
এযে রুদ্র আশীর্বাদ লৌহ বলয়॥
মোরা অগ্র পথিক অনাগত দেবতার,
এই শৃঙ্খলে বন্দিছে চরণ তাঁহার,
শোন্ শৃঙ্খলে তাঁর আগমনী-ঝঙ্কার।
হবে দৈত্য কারায় নব অরুণ উদয়॥

—ইসলাম, নজরুল

নজরুলগীতি, ২য় খণ্ড, গা-২৩৬, পৃঃ ১২০-২১

৪৬। খাম্বাজ মিশ্র, দাদ্‌রা

আমার শ্যাম্‌লা বরণ বাঙ্‌লা মায়ের
রূপ দেখে যা, আয় রে আয়।
গিরি-দরী-বনে-মাঠে প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়॥
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে
দেখে যা মোর কালো মা কে,
ধূলি রাঙা পথের বাঁকে বৈরাগিনী বীণ্‌ বাজায়॥
ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লীগ্রামে একলাটী,
বিজন মাঠে গ্রাম সে বসায় নিয়ে কাদা খড় মাটী,
কাজল মেঘের ঝারি নিয়ে করুণা-বারি ছিটায়॥
কাজ্‌লা-দীঘির পদ্ম ফুলে যায় দেখা তার পদ্ম-মুখ,
খেলে বেড়ায় ডাকাত মেয়ে বনে লয়ে বাঘ ভালুক,
ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে, বেদের সাথে সাপ নাচায়॥
নদীর স্রোতে পাথর নুড়ির কাঁকন চুড়ি বাজে তার,
দাঁড়ায় সাঁঝের অলিন্দে সে টীপ প'রে সন্ধ্যা তারার,
ঊষার গাঙে ঘট ভরিতে যায় সে মেয়ে ভোর বেলায়॥
হরিৎ শস্যে লুটায় আঁচল ঝিল্লিতে নূপুর বাজে,
ভাটিয়ালী গায় ভাটার স্রোতে, গায় বাউল মাঠের মাঝে,
গঙ্গা-তীরে শ্মশান ঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায়॥

—ইসলাম, কাজী নজরুল

সুরসাকী, নজরুল ইসলাম, গা-৬৭, পৃঃ ৭০
নজরুলগীতি, ৪র্থ খণ্ড, সম্পাদক আব্দুল আজীজ, গা-৩৫৭, পৃঃ ২২১

৪৭। পাহাড়ী মিশ্র—কার্ফা

আমার সোনার হিন্দুস্থান।
দেশ-দেশ-নন্দিতা তুমি বিশ্বের প্রাণ॥
ধরণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা তুমি আদি মাতা,
তব পুত্র গাহিল বেদ-বেদান্ত সাম-গাথা,
তব কোলে বারেবারে এল ভগবান্॥

আদিম যুগের তুমি প্রথমা ধাত্রী,
তোমার আলোকে হ'ল প্রভাত রাত্রি,
সবে বিলাইলে অমৃত সঙ্গীত জ্ঞান ॥
সোনার শস্যে তব ঝলমল বর্ণ,
অন্তরে মাণিক্য-মণি-হীরা-স্বর্ণ,
তুমি বর্ব্বরে করিয়াছ মানব মহান্ ॥
হিংসা-দ্বেষ-ভোগ-ক্লান্ত এ বিশ্ব
আবার শিখিবে ত্যাগ, হবে তব শিষ্য,
তুমি বাঁচাবে সবারে করি, অমৃত দান ॥

—ইসলাম, কাজী নজরুল

সুরসাকী, নজরুল ইসলাম, গা-৬৯, পৃঃ ৬৯
নজরুলগীতি, ২য় খণ্ড, গা-২৩৭, পৃঃ ২২১

৪৮।

এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল প'রেই শিকল তোদের করব রে বিকল ॥
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হ'তে নয়,
ওরে ক্ষয় ক'রতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।
এই বাঁধন প'রেই বাঁধন-ভয়কে ক'রবো মোরা জয়,
এই শিকল বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল ॥
তোমার বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে করছ বিশ্বগ্রাস,
আর ত্রাস দেখিয়েই করবে ভা'বছো বিধির শক্তি হ্রাস।
সেই ভয়-দেখানো ভূতের মোরা করব সর্বনাশ,
এবার আন্‌বো মাভৈঃ-বিজয়-মন্ত্র বল-হীনের বল ॥
তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুটিই ধরব টিপে', করব তারে লয়।
মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয় ;
মোরা ফাঁসি পরে আনব হাসি মৃত্যুজয়ের ফল ॥

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল-ঝঞ্ঝনা,
এযে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা !
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হান্‌ছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বল্‌বে দেশে আবার বজ্রানল ॥

—ইসলাম, নজরুল

নজরুলগীতি, ৪র্থ খণ্ড, গা-৩৬৯, পৃঃ ২২২

৪৯।

জৌনপুরী মিশ্র—দাদ্‌রা

এস মা ভারত-জননী আবার
জগততারিণী সাজে।
রাজরানী মা'র ভিখারিণী বেশ
দেখে প্রাণে বড বাজে ॥
শিশু জগতেরে মায়ের মতন
তুমি মা প্রথম করিলে পালন,
আজ মা তোরি সন্তানগণ
কাঁদিছে দৈন্য লাজে ॥
আঁধার বিশ্বে তুমি কল্যাণী
জ্বালিলে প্রথম জ্ঞান-দীপ আনি',
হইলে বিশ্ব-নন্দিতা রানী
নিখিল নর-সমাজে ॥
দেখা মা পুনঃ সে অতীত মহিমা,
মুছে দে ভীরুতা গ্লানির কালিমা,
রাঙায়ে আবার দশদিক-সীমা
দাঁড়া মা বিশ্ব-মাঝে ॥

—ইসলাম, কাজী নজরুল

সুরসাকী, নজরুল ইসলাম, পৃঃ ৫১
নজরুলগীতি, ৩য় খণ্ড, গা-৪১৪, পৃঃ ২৭৩-৭৪

৫০।

কানাড়া মিশ্র—একতালা

উদার ভারত! সকল মানবে
দিয়াছ তোমার কোলে স্থান।
পার্সী জৈন বৌদ্ধ হিন্দু
খৃষ্টান শিখ মুসলমান॥
তুমি পারাবার, তোমাতে আসিয়া
মিলেছে সকল ধর্ম্ম জাতি,
আপনি সহিয়া ত্যাগের বেদনা
সকল দেশেরে করেছ জ্ঞাতি;
নিজেরে নিঃস্ব করিয়া, হয়েছ
বিশ্ব-মানব পীঠস্থান॥
নিজ সন্তানে রাখি' নিরন্ন
অন্য সবারে অন্ন দাও,
তোমার স্বর্ণ রৌপ্য মাণিকে
বিশ্বের ভাণ্ডার ভরাও;
আপনি মগ্ন ঘন তমসায়
ভুবনে করিয়া আলোক দান॥
বক্ষে ধরিয়া কত সে যুগের
কত বিজেতার গ্লানির স্মৃতি,
প্রভাত আশায় সর্ব্বসহা মা
যাপিছ দুখের কৃষ্ণা তিথি,
এমনি নিশীথে এসেছিল বুকে
আসিবে আবার সে ভগবান॥

—ইসলাম, নজরুল

সুরসাকী, নজরুল ইসলাম, গা-৮৫, পৃঃ ৮৯
নজরুলগীতি, ২য় খণ্ড, গা-২৩৮, পৃঃ ১২১-১২২

৫১।

কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী

ওরে ঐ তরুণ ঈশান, বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীন প্রাচীর ভেদি।
গাজনের বাজনা বাজা, কে মালিক কে সে রাজা,
কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে।
হা হা হা পায় যে হাসি, ভগবান পরবে ফাঁসি
সর্বনাশী শিখায় এ হীন তথ্য কে রে।
ওরে ও পাগলা ভোলা, দে রে দে প্রলয় দোলা
গারদগুলো জোরসে ধ'রে হ্যাঁচকা টানে
মার হাঁক হায়দারী হাঁক, কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক
ডাক ওরে ডাক মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে।
নাচে ঐ কাল বোশেখী, কাটাবি কাল বসে কি
দে রে দেখি ভীমকারার ঐ ভিত্তি নাড়ি।
লাথি মার ভাঙরে তালা, যত সব বন্দিশালায়
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি।

—ইসলাম, নজরুল

হাজার বছরের বাংলা গান, গা-৫৩, পৃঃ ১৬২-৬৩
নজরুলগীতি, ২য় খণ্ড, সম্পাদক আব্দুল আজীজ; গা-২৪০, পৃঃ ১২২-২৩

৫২।

গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ওই,
বহিয়া চলেছে আগের মত
কই রে আগের মানুষ কই ?
মৌনী স্তব্ধ সে-হিমালয়
তেমনি অটল মহিমাময়,
নাহি তা'র সাথে সেই ধ্যানী ঋষি,
আমরাও আর সে-জাতি নই ॥
আছে আকাশ সে ইন্দ্র নাই,
কৈলাসে সে যোগীন্দ্র নাই,
অন্নদা-সুত ভিক্ষা চাই,
কী কহিব এরে কপাল বই ॥

সেই আগ্রা, সে দিল্লী ভাই.
আছে পড়ে, সে বাদ্‌শা নাই,
নাই কোহিনূর ময়ূর-তখ্‌ত
নাই সে-বাহিনী বিশ্বময়ী।
আমরা জানি না, জানে না কেউ,—
কূলে ব'সে কত গণিব ঢেউ,
দেখিয়াছি কত, দেখিব এ-ও,
নিঠুর বিধির লীলা কতই॥

—ইসলাম, নজরুল

নজরুলগীতি, ৩য় খণ্ড, গা-৪১৮. পৃঃ ২৭৬-২৭৭

৫৩। মার্চ্চের সুর

কোরাস্‌ঃ

চল্‌ –চল্‌—চল্‌!
ঊর্দ্ধ-গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল. চল্‌ রে চল্‌ রে চল্‌।
চল্‌—চল্‌—চল্‌!
ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত, বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব নবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ, বাহুতে নবীন বল।
চল রে নৌ-জোয়ান, শোন্‌ রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে জীবনের আহ্বান।
ভাঙ্‌রে ভাঙ্‌ আগল, চল্‌ রে চল্‌ রে চল্‌
চল্‌—চল্‌—চল্‌॥
ঊর্দ্ধে আদেশ হানিছে বাজ—
শহীদী-ঈদের সেনারা সাজ,
দিকে দিকে চলে কুচ্‌কাওয়াজ
খোল্‌ রে নিদ্‌-মহল্‌!

কবে সে খেয়ালী বাদশাহী
সেই তো অতীতে আজো চাহি,
যাস্ মুসাফির গান গাহি'
ফেলিস্ অশ্রুজল।
যাক্ রে তখ্‌ত-তাউস্
জাগ্‌রে জাগ্‌ বেহুঁস!
ডুবিল রে দেখ কত পারস্য
কত রোম গ্রীক্ রুষ,
জাগিল তারা সকল,
জেগে ওঠ্‌ হীনবল!
আমরা গড়িব নূতন করিয়া
ধূলায় তাজমহল!
চল্—চল্—চল্॥
—ইসলাম, নজরুল

নজরুলগীতিকা, ডি. এম. লাইব্রেরী পৃঃ ২৪-২৫

৫৪।

জাগো জাগো জাগো হে দেশপ্রিয়।
ভারত চাহে তোমায়, হে বীর বরণীয়॥
চিতার ঊর্ধ্বে, হে অগ্নিশিখা
ঊর্ধ্বে কারার বন্ধনহারা, হে বীর জাগো,
শরণ দাও, হে চির-স্মরণীয়॥
ধূলির স্বর্গে যতীন্দ্র জাগো,
বজ্র-বাণী-অম্বরে হানি' জাগো,
তব ত্যাগের মন্ত্র শুনাইও॥
ভারত কাঁদে অনন্ত শোকে
নিদ্রাহীনা ধূলি-শয়নলীনা জাগো,
মথিয়া মৃত্যু আনো প্রাণ-অমিয়॥
—ইসলাম, নজরুল
(দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মহাপ্রয়াণে)

নজরুলগীতি, ৩য় খণ্ড, গা-৪২২, পৃঃ ২৭৯

৫৫। মালগুঞ্জ—জলদ্ তেতালা

ত্রিংশ কোটি তব সন্তান ডাকে তোরে।
ভু'লে আছিস্ দেশ-জননী কেমন ক'রে ॥
ব্যথিত বুকে মাগো তোমার মন্দির গড়ি'
করি পূজা আরতি কত যুগ যুগ ধরি',
ধূপ পুড়েছে মাগো, চন্দন শুকায়ে যায়,
আয় মা আয় পুনঃ রানীর মুকুট প'রে ॥
দুখের পসরা মা আর যে বহিতে নারি,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শুকায়েছে আঁখিবারি'
এ গ্লানি লজ্জা মা সহিতে নাহি পারি,
বিশ্ব-বন্দিতা এস দুখ-নিশি ভোরে ॥
··· মহিমা লয়ে এস মহিমাময়ী,
হীনবল সন্তানে কর্ মা ভুবন-বিজয়ী,
দুখ-তপস্যা মা কবে তব হবে শেষ,
আয় মা নব-আশা রবির প্রদীপ ধ'রে ॥

—ইসলাম, নজরুল

সুরসাক্ষী, নজরুল, গা-৮৬, পৃঃ ৯০
নজরুলগীতি, ২য়, গা-২৪৩, পৃঃ ১২৪

৫৬। বৃহন্নট—কেদারা। একতালা

কোরাস ঃ

দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত?
কে আছো জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার ॥

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী শান্ত্রীরা সাবধান।
যুগ যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার ॥

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি পণ!
হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র ॥

গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাত পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি' নিয়াছ যে মহাভার ॥

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর!*
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্ব্বার ॥

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়-গান
আসি' অলক্ষে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার ॥

—ইসলাম, নজরুল

* তরবারি

নজরুলগীতিকা, নজরুল ইসলাম, পৃঃ ১৩ ১৪

৫৭

বিশাল-ভারত-চিত্তরঞ্জন হে দেশবন্ধু এসো ফিরে
কাণ্ডারী হে দেখাও দিশা অসীম অশ্রু সাগর-নীরে

নাই দিশারী নাই সেনানী আজ জনগণ ত্রস্ত ভয়ে,
ভারত কাঁদে ব্যাকুল চিত্তে তোমার চিতার ভস্ম লয়ে,
সগর দেশের হে ভগীরথ, জাগো ভাগীরথীর তীরে ॥
রাজৈশ্বর্য্য বিলিয়ে, নিলে হে বৈরাগী ভিক্ষা-ঝুলি
সোনার অঙ্গে মাখলে তুমি পায়ে-চলা পথের ধুলি।
দেশ জননী ত্রিংশ কোটি সন্তানেরে বক্ষে নিয়া
ভুলতে নারে তোমার স্মৃতি, শূন্য তাহার মাতৃ হিয়া ;
কে পরাবে রাণীর মুকুট বন্দিনী মার রিক্ত শিরে।
(দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রয়াণে)

—ইসলাম, নজরুল

নজরুলগীতি, ৪র্থ খণ্ড, গা-৩৭১, পৃঃ ২৩৩

৫৮।

ভারতের দুই নয়ন-তারা হিন্দু-মুসলমান।
দেশ জননীর সমান প্রিয় যুগল সন্তান ॥
তাই ত' মায়ের কোল নিয়ে ভাই
ভায়ে ভায়ে বাধে লড়াই
এই কলহের হবেই হবে মধুর অবসান।
এক দেশেরই অন্নজলে এক দেহ এক প্রাণ ॥
আল্লা বলে কোরাণ তোমার, এরা বলে বেদ
যেমন পানি, জলে রে ভাই শুধু নামের ভেদ।
মোদের মাঝে দেয়াল তুলতে যে চায়
জানবে মোদের শত্রু তাহায়
বিবাদ করে এনেছি ভাই অনেক অকল্যাণ,
মিলনে আজ উঠুক জেগে নব-হিন্দুস্থান!
জেগে উঠুক হিন্দুস্থান।

—ইসলাম, নজরুল

নজরুলগীতি, ৪র্থ খণ্ড, গা-৩৭৪, পৃঃ ২৩৫

৫৯।

সুখরাই কানাড়া—কাওয়ালি

ভারত-লক্ষ্মী মা আয় ফিরে এ-ভারতে।
ব্যথায় মোদের চরণ ফেলে—অরুণ আশার সোনার রথে ॥
অশ্রু গঙ্গার জলে ধুই মা তোর চরণ নিতি—
ত্রিশ কোটী কণ্ঠে বাজে রোদনে তোর বোধন গীতি,
আয় মা দলিত রাঙা হৃদয় বিছানো পথে ॥
বিজয়া তোর হল কবে শতাব্দি চলিয়া যায়—
ভারত-বিজয়-লক্ষ্মী ভারতে ফিরিয়া আয়।
বিসর্জ্জনের কান্না মা
তুই এবার এসে থামা,
সফল কর্ এ তপস্যা মা স্থান দে স্বাধীন জগতে ॥

—ইসলাম, নজরুল

স্বরলিপি, নজরুল, পৃঃ ৪৮
নজরুলগীতি, ৪র্থ খণ্ড, গা ৩৭৩, পৃঃ ২৩৪

৬০।

মাঢ়—কার্ফা

লক্ষ্মী মা তুই আয় গো উঠে সাগর-জলে সিনান করি'।
হাতে লয়ে সোনার ঝাঁপি, সুধার পাত্রে সুধা ভরি' ॥
আন্ মা আবার আঁচলে তোর নবীন ধানের মঞ্জরী সে,
টুনটুনিতে ধান খেয়েছে, খাজনা মাগো দিব কিসে,
ডুবে গেছে সপ্ত ডিঙা, রত্ন বোঝাই সোনার তরী ॥
ক্ষীরোদ-সাগর-কন্যা যে তুই, খেতে দে ক্ষীর সর মা আবার,
পান্তা লবণ পায় না ছেলে, রাজরাণী মা'র এ কোন্ বিচার,
কার কাছে মা নালিশ করি, অনন্ত শয়নে হরি ॥
তোরও কি মা ধর্‌ল ঘুমে নারায়ণের ছোঁয়াচ লেগে,
বর্গী এল দেশে মাগো, খোকারা তোর কাঁদে জেগে,
তুই এসে তায় ঘুম পাড়া মা হাতে দিয়ে ঝিনুক কড়ি ॥

কোন্ দুখে তুই রইলি ভুলে বাপের বাড়ী অতল-তলে,
ব্যথার সিন্ধু মন্থন শেষ, ভর্‌ল যে দেশ হলাহলে,
অমৃত এনে সন্তানে বাঁচা, মা তোর পায়ে ধরি ॥

—ইসলাম, নজরুল

সুরসাকী,—নজরুল, গা-৫৮, পৃঃ ৭১
নজরুলগীতি, ৪র্থ খণ্ড, গা ৩৭৬, পৃঃ ২৩৬

৬১।

সিন্ধুর কল্লোল ছন্দে ত্রিশ কোটি সন্তান বন্দে,
গাহে তব জয় গাথা— প্রণমি ভারত মাতা।
জাগ্রত ভারতবর্ষ ॥
মেঘেরা তোমার চামর ঢুলায়
কটিতে নদীর চন্দ্রহার,
রবি-শশী-গ্রহ তারায় গাঁথা
মণিহার দোলে গলে তোমার।
সূর্যের অরুণ রাগে নিদ্রিত বন্দী জাগে,
রাত্রির কারাগার মাঝে আলোক-শঙ্খ বাজে।
জাগ্রত ভারতবর্ষ ॥
রাঙা বেদনার স্বস্তিকে তব
দেউল-দুয়ার হ'ল উজল,
নবজীবনের পূজায় লহ মা
নব দিবসের শ্বেত কমল।
বন্দিতা হে কল্যাণী, ঘুচাও শঙ্কা গ্লানি ;
জাগাও সত্যের ভাষা, বন্ধন মোচন-আশা।
জাগ্রত ভারতবর্ষ ॥

—ইসলাম, নজরুল

নজরুলগীতি, ৩য় খণ্ড, গা-৪৪৮, পৃঃ ৩০৪

৬২।

হায় পলাশী !
এঁকে দিলি তুই জননীর বুকে
কলঙ্ক-কালিমা রাশি
হায় পলাশী ॥
আত্মঘাতী স্বজাতি
মাখিয়া রুধির কুম্‌কুম্‌।
তোরই প্রান্তরে ফুটে ঝ'রে গেল
পলাশ কুসুম।
তোরই গঙ্গার তীরে পলাশ-সকাশ
সূর্য ওঠে যেন
দিগন্ত উদ্ভাসি' ॥

—ইসলাম, নজরুল

নজরুলগীতি, ৩য় খণ্ড, গা-৪৪৯, পৃঃ ৩০৪-৩০৫

দিল্লী দরবার

৬৩। বাউলের সুর

কেন গো আনন্দে আজি সকলে মেতেছে।
বিজয় পতাকা কেন বিমানে উড়িছে।
আনন্দে বাজনা বাজায়ে বাজায়ে হিন্দুরাজগণ আসিতেছে ধেয়ে
ভেটিতে কাহারে পুলকিত হ'য়ে নানাদিক হতে কেন গো আসিছে
হেরি কি সভা শোভার ব্যবহার হাসিতেছে ধরা আনন্দে অপার
কিসের আনন্দ হইল এবার তোপের ধ্বনিতে ধরণী কাঁপিছে
কোথা হৃষীকেশ পাণ্ডবতারণ পাণ্ডব প্রধান্য প্রকাশ কারণ
রাজসূয় কি হে পুনঃ আয়োজন এতকাল পরে পুনঃ কি হতেছে।

—কালীপদ

সঙ্গীতকোষ, গা-৩১৬৬, পৃঃ ৯৮৫

৬৪। কীর্ত্তনের সুর

এক দেশে থাকি, এক মাকে ডাকি
এক সুখে সুখী, ছিলাম সবে।
আজি অকস্মাৎ অশনি সম্পাত!
সমান বিষাদে কাঁদিতে হবে।
কে করে শ্রবণ, অরণ্যে রোদন?
কে চাহে তুষিতে তাপিত জীবন?
ব্যথিত বেদন, সমান রবে॥
কিন্তু ব্যবচ্ছেদে করিবনা খেদ
মিলালে হৃদয় কি হবে প্রভেদ?
মনের মিলন কে ভাঙ্গে কবে?
রাজবলে যদি নাম ভিন্ন হয়
সে ভেদে কি আর ভাঙ্গিবে হৃদয়,
মিলে ভাই ভাই রহিব ভবে॥

—কাব্যবিশারদ, কালীপ্রসন্ন

স্বদেশ সঙ্গীত, যোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা, গা-৪৬, পৃঃ ৪৮

৬৫। প্রসাদী সুর

এস, দেশের অভাব ঘুচাও দেশে।
সবার, আহার বিহার বিলাস বেশে॥
দেখ দেখি, মীলে আঁখি, যত ভিন্ন দেশী এসে।
দেশের যাছিল ধন, কচ্চে হরণ জাহাজভরে এক নিমেষে॥
গৃহ ধনধান্যে ভরা, আমরা মজি নিজের দোষে।
আমরা, কিছুই না পাই, হেলায় হারাই, নয়নজলে বেড়াই ভেসে॥
সকল কাজেই বিজ্ঞ সাজি অনভিজ্ঞ ধল্লে ঠেসে।
আসে, ত্যাগ স্বীকারের নামেই বিকার, দংশে যেন আশীবিষে॥
বসনভূষণ, যা প্রয়োজন,
পানভোজন নয় আত্মবশে।
যেন, বাসা থাকতে বাবুই ভিজে,
নিজের উপায় দেখে না সে॥

ধুতি চাদর মাঞ্চেষ্টারের চেয়ে দেখ সব সর্ব্বনেশে
ভরে, জাহাজগুলো, তোদের তুলো তোরাই কিনিস্ সেই জিনিসে ॥
যাদের তূলো তাদের দিয়ে
লাভ নিয়ে যায় সব বিদেশে।
আমরা, অলস হ'য়ে, আছি চেয়ে বিদেশবাসীর দয়ার আশে ॥
লজ্জা বারণ, শীতের দমন,
রেশম, পশম পাট কাপাসে।
বল, কিসের কসুর, খাবার প্রচুর, কিনা ফলে ক্ষেতের চাষে ॥
মাছ মাংস ফল, আছে সকল,
সব পাওয়া যায় বিনা ক্লেশে।
নদী, সরোবরে, স্নিগ্ধ করে, মিষ্ট জলে তৃষ্ণা নাশে ॥
গুড় চিনি আর মধু ফেলি
লোফ সুগারের মজি রসে।
আছে গোয়াল পোরা বোক্না গাভী কৌটাতে দুধ তবু আসে ॥
বিশ কোটী শ্রমজীবী হেথা,
পশু পুষ্ট মাঠের ঘাসে।
লোকে, অল্পে তুষ্ট, সহে কষ্ট, বাঁকায় না মুখ অসন্তোষে ॥
তবু কেন ভিক্ষা করি বিদেশবাসীর দ্বারদেশে।
কেবল স্বভাব দোষে অভাব ভাবি, নাহি দেখি কি হয় কিসে ॥
কাঞ্চন বিলায়ে দিয়ে,
কাঁচ খুঁজি হায় পরের বাসে।
পরে, নাহি দিলে, মুখে তুলে, দিন কেটে যায় উপবাসে ॥
দিয়ে, সোণা হীরের খনি,
আমদানী কাঁচ রাঙ্গতা সীসে।
যত, বিদেশবাসী নে যায় শস্য,
আমরা আছি সমান বসে ॥
চারিদিকে, দৃষ্টি রেখে,
কাজ করে যাও আবেগবশে।
সবে, করিলে পণ, অধঃপতন, হবে দমন অনায়াসে ॥
নিজের বলে হও না বলী,
আস্‌বে আর কোন্ সাহসে।

যখন, ঘরের পেলে, কার্য্য চলে,
কেন যাব পরের পাশে ॥
হ'য়ে যদি লুপ্তশক্তি সুপ্ত থাক নিদ্রাবেশে।
জেনো, সবার দুঃখে, অধোমুখে, শিয়াল কুকুর কাঁদবে শেষে ॥
আশার আলো, সামনে জ্বাল,
তুচ্ছ ভাব ভোগ বিলাসে।
আজি, কয় বিশারদ, যাবে বিপদ, হতাশবাণী উড়াও হেসে ॥

—কাব্যবিশারদ, কালীপ্রসন্ন

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ১০৩০
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৩০
স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক নরেন্দ্রকুমার শীল, গা-৭৬, * রচয়িতার নাম নেই।

৬৬। আশাবরী ঃ ধামার

(আস্থায়ী) ছিন্ন হল বঙ্গ কেন ভাব অমঙ্গল
রাজরঙ্গে আশাভঙ্গে কেন হব হীনবল ?

(অন্তরা) কি ফল বিফলে কাঁদি
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধি
দাঁড়ালে এ ব্যবচ্ছেদে
কি ভেদ হইবে বল।

(সঞ্চারী) খণ্ড খণ্ড করি রাখুক এদেশ
হউক ভূধরে সিন্ধু-সন্নিবেশ
কীর্তিনাশা জলে কিম্বা রসাতলে
সমগ্র ভূখণ্ড করুক প্রবেশ,

(আভোগ) মিলাইতে পারি যদি মন
কে খুলিবে সেই মিলন-বন্ধন ?
পরম করুণার আশায় আশায়
জীবনযাপনে ফলিবে কি ফল ?

(সঞ্চারী ফেরতা) বলিব বদনে জয় জন্মভূমি
শুনিব স্বপনে—জয় জন্মভূমি
আশায় ভাষায় ভক্তি করুণায়
অন্তরের স্তরে আগ্নেয় অক্ষরে
রাখিব লিখিয়া—জয় জন্মভূমি।

—কাব্যবিশারদ, কালীপ্রসন্ন

হাজার বছরের বাংলা গান, গা-১৮, পৃঃ ১২৭-২৮

৬৭.। ভীমপলশ্রী—একতালা

জাগো জাগো বরিশাল
তোমার সম্মুখে আজি পরীক্ষা বিশাল ॥
প্রাণ দিয়ে হুতাশনে
দেখাও জগৎজনে
বিশুদ্ধ কনককান্তি—সৌর করজাল ॥
বিশুদ্ধি কালিমা কত
হবে এবে পরীক্ষিত
আজি পরীক্ষার দিনে ঘুচাও জঞ্জাল ॥
দেখিব তোমার শক্তি
দেশভক্তি অনুরক্তি
দেখিব গৌরব তব রবে কতকাল ॥
বুঝিব দেশের তরে
কতটা রুধির ঝরে
মনুষ্যত্বে বরিশাল হবে কি কাঙ্গাল ?
নিরখি আরক্ত নেত্র
প্রহরীর করে বেত্র
হারাবে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গে ইহ-পরকাল ?
ভুলিও না কোন ভয়ে
থাকিও যাতনা স'য়ে
ঝুলুক বঙ্গের শিরে খর করবাল ॥

জন্মে মৃত্যু অনিবার্য
মানুষ করিবে কার্য
ভয়ে ভঙ্গ দেয় শুধু—নীচ ফেরুপাল ॥

—কাব্যবিশারদ, কালীপ্রসন্ন

স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৩১৩-৩১৪

৬৮। স্তোত্র

জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে।
মীনরূপ ধরি হরি, অবনীতে অবতরি
প্রলয় পয়োধি জলে বেদ ব্রহ্ম উদ্ধারিলে,
বিষম বিদেশী স্রোতে কে আজি উদ্ধার করে? জয় জগদীশ হরে।
এ বিশ্বে বিষম বৃষ্টি ডুবিল যখন সৃষ্টি
সঙ্কটে কমঠ হ'য়ে ও পিঠে ধরণী লয়ে
রেখেছিলে, রাখ আজি বিদেশী তরঙ্গ ভরে ॥ জয় জগদীশ হরে।
বরাহ আকার ধরি ভীষণ দশনোপরি
রেখেছিলে এই ভূমি সে যুগে যেমন তুমি
তেমনি ভারতে রাখ দেখা দিয়ে যুগান্তরে ॥ জয় জগদীশ হরে।
অথবা নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুভূপে
ভয়ঙ্কর বেশে নাশি ভীম মূর্ত্তি পরকাশি
যে ভাবে বাঁচালে বিশ্ব, এস সেই মূর্ত্তি ধরে ॥ জয় জগদীশ হরে।
দেশান্তর হ'তে পণ্য, হরিছে দেশের অন্ন
ভিখারী বামন হয়ে ত্রিপদে ত্রিলোক ছেয়ে
ত্রেতায় রেখেছ অন্ন, সে অন্ন কে আজি হরে ॥ জয় জগদীশ হরে।
বলদৃপ্ত ক্ষত্র সবে কোদণ্ড টঙ্কার রবে
হয়ে নিজ ভৃগু সুত করেছিলে পরাভূত
পশু-বলদৃপ্ত-দলে নাশ পশু শক্তি হরে ॥ জয় জগদীশ হরে।
কোথা নব দুর্ব্বাদল তনুরুচি সুকোমল
রাক্ষসের অত্যাচার বাড়িয়াছে পুনর্বার
বিনা সে শ্রীরামচন্দ্র কে নাশে রাক্ষসাদিরে ॥ জয় জগদীশ হরে।

দ্বাপরে কর্ষণ তরে করুণা বর্ষণ করে
যেরূপে দর্শন দিলে সেরূপে এস ভূতলে
অন্ন দিতে অন্নহীনে তাই ডাকি হলধরে ॥ জয় জগদীশ হরে।
যেরূপ ধরিয়া হরি জগতের হিংসা হরি
বুদ্ধ নামে খ্যাত ছিলে সেইরূপে দেখা দিলে
দুর্ব্বল-দলন যাবে প্রবলের পদভরে ॥ জয় জগদীশ হরে।
কলি যুগে কল্কি হয়ে ত্রাহি দেব ম্লেচ্ছ ভয়ে
দুর্ব্বলের বল তুমি এ তোমারই লীলাভূমি
দেখা দিবে বিশারদে, আর কত কাল পরে? জয় জগদীশ হরে।

—কাব্যবিশারদ, কালীপ্রসন্ন

স্বদেশ সঙ্গীত, যোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা, গা-৬১, পৃঃ ৬৪-৬৬

৬৯। সিন্ধু—কাওয়ালী

যদি এ দুঃখের নিশা কখন পোহায়,
যদি সুখ প্রভাকর
এ ভারতে দেয় কর
সুবিচার হিন্দুস্থানে আসে পুনরায়,
যদি কভু হিন্দুস্থান
হয় উল্লাসিত প্রাণ
দারুণ বিষাদানল যদি নিবে যায়,
যদি রাজকীয় কার্য্য,
পশু বলে শিরোধার্য্য,
করিতে না হয়, এই দগ্ধ বাঙ্গালায়,
তবেই হাসিব আর
লভিব সন্তোষ ভার
ভুলিব সকল দুঃখ সুখের আশায়!

—কাব্যবিশারদ, কালীপ্রসন্ন

স্বদেশ সঙ্গীত, যোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা, গা-৪৭, পৃঃ ৪৭

৭০।

বাহার—ধামার

দণ্ড দিতে চণ্ড মুণ্ডে এস চণ্ডি! যুগান্তরে।
পাষণ্ড প্রচণ্ড বলে অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে॥
হুঙ্কারে আতঙ্কে মরি শঙ্কা নাশ শুভঙ্করি!
এ ব্রহ্মাণ্ড লণ্ড ভণ্ড—দৈত্যপদ-দণ্ড ভরে।
এ যুগে আবার মা গো দুর্গতি নাশিতে জাগো—
এসে নিজে রক্তবীজে নাশ সেই মূর্ত্তি ধরে॥
এস মা ত্রিতাপ হরা স্তম্ভিত এ বসুন্ধরা
শুম্ভ নিশুম্ভের দম্ভে সর্ব্ব নেত্রে অশ্রুঝরে।
দশ দিকে হর-প্রিয়া, দশভুজ প্রসারিয়া—
ভূভারহরণ কর নাশিয়া মহিষাসুরে॥
আবার সে রূপ ধরি অবনীতে অবতরি—
"তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলে ডাক তেমনি ভীষণ স্বরে।
শুনে ভয়ঙ্কর শব্দ ত্রিভুবন হ'ক স্তব্ধ
বিশারদ ওই পদ কাতর হৃদয়ে স্মরে॥

—কাব্যবিশারদ, কালীপ্রসন্ন

স্বদেশ সঙ্গীত, যোগেন্দ্রনাথ শর্মা, গা-৫০, পৃঃ ৫১
বন্দনা, নলিনীরঞ্জন সরকার, পৃঃ ৩১-৩২

৭১।

খাম্বাজ—একতালা

নীতিবন্ধন ক'র না লঙ্ঘন, রাজশক্তি সার প্রজার রঞ্জন।
হইয়ে রক্ষক হও না ভক্ষক, অবিচারে রাজ্য থাকে না কখন।
ক'রেছ কলুষে এ রাজ্য অর্জ্জন, কলুষ-কল্মসে করো না শাসন,
অবাধে হবে না দুর্ব্বল-দমন, দুর্ব্বলেরি বল নিত্য নিরঞ্জন।
পাপ কংসাসুর-যদুবংশ-দল, চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ গেছে রসাতল,
গৌরববিহীন পাঠান মোগল; হয় পাপ পথে সবারি পতন।
কাল-জলধিতে জলবিম্ব প্রায়, উঠে কত শক্তি কত মিশে যায়,
তোমরা কি ছিলে, উঠেছ কোথায়! আবার পতনে লাগে কতক্ষণ!

—কাব্যবিশারদ, কালীপ্রসন্ন

বন্দনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭
স্বদেশ সঙ্গীত, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৩-৪

৭২। বাউলের সুর

ভাই সব দেখ চেয়ে, বাজার ছেয়ে
আসতেছে মাল বিদেশ হ'তে।
আমাদের বেচাকেনা, পাওনা দেনা
অভাব মোচন পরের হাতে॥
আমাদের পিতল কাঁসা, ছিল খাসা
কাজ চালাতেম কলার পাতে।
এখন এনামেলে, মাথা খে'লে
কলাই করার ব্যবসাতে॥
এখানে পরশ পাথর পায় না আদর
চটা উঠ্‌ছে পেয়ালাতে।
যত ঠুনকো পলকা, দরে হালকা
দ্বিগুণ মূল্য পালটে নিতে॥
ঘরে, নাইকো আহার বেশের বাহার
যাহার তাহার ঘাটে পথে।
হায়রে নিজের দেশে যায়না অভাব
অশন বসন সব বিলাতে।
ছেড়ে, পরের ঠাকুর ঘরের কুকুর
ইচ্ছা করে মাথায় নিতে।
বিশারদ, ছাড়তে নারে কেঁদে মরে,
কার্য সারে কোন মতে।

—বিশারদ, কালীপ্রসন্ন

স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৩০৬-৭
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৩১
স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক, নরেন্দ্রকুমার শীল, গা-৫১. * রচয়িতার নাম নেই।

৭৩

ভেইয়া দেশ্‌কা এ কেয়া হাল্।
খাক মিট্টি, জহর হোতি সব, জহর হোই জঞ্জাল।
ঘর ছোড়্‌কে সব পরকে সেবে
ভাই কো দেত্‌ ভগাই।

সাগর পার সব ধন গয়া আওর
ঘরমে লছমি নাই।
পীতল কাঁসা রহে ক্যায়সা
সোনা চাঁদি শেষ।
অব ইনামেল গিল্টি সীসা
ঘর্ ঘর্‌মে পর্‌বেশ।
পাট রুই সব য়ঁহাসে যাকর্
জাহাজ ভর্‌কে আতে।
দেশ্‌কা আদ্‌মি মূরখ্ বনকর্
চাঁদি দে কর্ লেতে।
গো শূয়র্‌কে লহুমে শোধিত
চিনি নিমক্ খাওয়ে।
সফেদি দেখ্ কর্ মন্ লল্‌চাতা
হাত্‌মে মোকৃস পাওয়ে।
গো-শালামে গৌয়ে কিত্‌নী
কিসিকো ইহ ন সুঝে
টিন ভরে যো দুধ বিলাতী
উস্‌কো মিঠা বুঝে।
দেশ্‌কে ধন সব চৌপট্ কর্‌কে
লেত্ পরদেশিয়া
ইঁহাকে লোগ্ সব্ ফকির বন্ যায়
না পাওয়ে রুপেয়া।
বেনারসি আওর শাল্ দোশালা
রেশম পশম ছোড়ি।
ছিট্ পাট্ নকলি মখ্‌মল গোটা
মোল্‌হি দেকর্ কৌড়ি।
গো শূয়র্‌কে চর্ব্বি দেকর্
যো বনাইলে বাস।
পেহুনে ওহি ভারতবাসী
ধরম কর্‌কে নাশ।

পুণ্যস্থান ইহ আরিয়া বর্ত্তমে
নাহি মিলে কোই চিজ্
আদ্মি বৌরা মূরখ্ হোকর্
ছোড় দিয়া তজ বীজ্।
আঁখকে আগে সব্হি পড়া হ্যায়
কোই না পাওয়ে রুখা।
ঘর্কে লছ্মি পরকে দেকর্
সব কোই রহেঁ ভুখা।
দীন বিশারদ গনই বিপদ
ভনো দুঃখ কি গীত।
হো মতিমান্ দেশ্কে সন্তান
করো স্বদেশ কি হীত।

—বিশারদ, কালীপ্রসন্ন

সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮৬-৮৮

৭৪। বাউলের সুর

মা গো, যায় যেন জীবন চলে,
শুধু জগৎমাঝে তোমার কাযে
'বন্দেমাতরম্' বলে॥
(যখন) মুদে নয়ন, করবো শয়ন
শমনের সেই শেষ কালে—
তখন, সবই আমার হবে আঁধার
স্থান দিও মা ঐ কোলে॥
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে॥
(আমার) মান অপমান সবই সমান
দলুক না চরণতলে।
যদি, সইতে পারি মায়ের পীড়ন,
মানুষ হ'ব কোন্ কালে? (আর)
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে॥

লাল টুপি কি কালো কোর্তা,
জুজুর ভয় কি আর চলে ?
(আমি) মায়ের সেবায় রইব রত
পাশব বলে দিক্ জেলে ॥
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥
আমায়—বেত মেরে' কি 'মা' ভোলাবে ?
আমি কি মা'র সেই ছেলে ?
দেখে, রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে ?
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥
আমি, ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের, বেত্রাঘাতে, কারাগারে
ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলে ॥
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥
যে মা'র কোলে নাচি, শস্যে বাঁচি
তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে।
বল, লাঞ্ছনার ভয়, কার কোথা রয়
সে মায়ের নাম স্মরিলে ?
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥
বিশারদ কয় বিনা কষ্টে
সুখ হবে না ভূতলে।
সে ত, অধম হয়ে সইতে রাজি
উত্তমে চাও মুখ তুলে ॥
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥

—কাব্যবিশারদ, কালীপ্রসন্ন

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, পৃঃ ৩৪০-৪১
স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৩০৪-৫
জাতীয় সঙ্গীত, গা-৪৩, পৃঃ ১৭
মাতৃবন্দনা, পৃঃ ৮৪-৮৫
সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড

৭৫। রাগ ভৈরব, তাল একতালা

সেই তো রয়েছ মা তুমি।
ফলফুলে সুশোভিতা শ্যামা জন্মভূমি ॥
শিরোপরি গিরিবর
সে শুভ্র কলেবর
পদতলে সেই সিন্ধু
আছে অনুগামী ॥
তেমনি বিহঙ্গকুল
কলরবে সমাকুল
তেমনি শুনিতে পাই
মধুপ-ঝঙ্কার
সেই ত সকলি আছে
তবে মা সবার পাছে
তোমার সন্তান কেন,
অধঃপথগামী ॥
কোথা তব সে গৌরব
সে সম্পদ কোথা সব
সকলি হয়েছে আজি
নিশার স্বপন—
ফিরিয়া আবার কি মা
আসিবে গো সে মহিমা
গাইবে তোমার কবি
তোমারে প্রণমি ॥
কি জানি কি পাপফলে
পড়ি পর পদতলে
শক্তিহীন তব সুত
ধুলাতে লুটায়—
বিশারদ সে বিষাদে
হতাশ হৃদয়ে কাঁদে,
তারে আজি কে দেখালে
এ দশা দশমী ॥

—কাব্যবিশারদ, কালীপ্রসন্ন

সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, 'স্বদেশী আন্দোলন' পৃঃ ৮৫-৮৬
স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৩০৮-৩০৯
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৩২
স্বদেশী সঙ্গীত, গা-৫৬, * রচয়িতার নাম নেই।

৭৬। হাম্বির—কাওয়ালি

(আস্থায়ী)

নবীন এ অনুরাগ রাখ রাখ মনে রাখ।
উঠেছ আবেগভরে দুদিনে তা ভুলো না কো॥

(অন্তরা)

খুলিয়া মুদিত আঁখি, নবভাব মনে রাখি,
বারেক জেগেছ যদি—এইভাবে জেগে থাক॥

(সঞ্চারী)

যে শিখা জ্বলেছে প্রাণে বিন্দু বিন্দু স্নেহ দানে
দীপ্ত রেখো সুপ্ত হয়ে নিবায়োনা তায়—

(আভোগ)

এ শিখা নিবিলে পরে, জ্বলিবে না যুগান্তরে
বিশারদ অন্ধকারে তাহারে আলোকে ডাক।

—কাব্যবিশারদ, কালীপ্রসন্ন

জাতীয় সঙ্গীত, পৃঃ ৪৪
স্বদেশী সঙ্গীত, গা-৭৪

৭৭। বেহাগ—ঢিমে তেতালা

স্বদেশের ধূলি

স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি'
রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান ;
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে
অনিলে মলয় সদা বহমান।

নন্দন কাননে কিবা শোভা ছার,
বনরাজিকান্তি অতুল তাহার
ফল শস্য তার সুধার আধার
স্বর্গ হতে সে যে মহাগরীয়ান॥

এ দেহ তোমার তারি মাটি হতে
হয়েছে সৃজিত, পোষিত তাহাতে
মাটি হয়ে পুন মিশিবে তাহাতে
ভবলীলা যবে হবে অবসান।

পিতামহদের অস্থিমজ্জা যত
ধূলিরূপে তাহে আছে যে মিশ্রিত
এই মাটি হতে হবে যে উত্থিত
ভাবীকালে তব ভবিষ্য সন্তান ॥

কংস-কারাগারে দেবকীর মত
বক্ষেতে পাষাণ লৌহশৃঙ্খলিত
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত
পরিচয় তুমি তাঁহারি সন্তান।

প্রকৃত সন্তান জেনো সেই জন,
নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জন,
যে করিবে মা'র দুঃখ-বিমোচন,
হবে তার মাতৃঋণ প্রতিদান ॥

—কাব্যবিশারদ, কালীপ্রসন্ন

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, মুখোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৪১-৪২
মৃত্যুহীন প্রাণ, সাহানা দেবী, পৃঃ ৫৭
জাতীয় সঙ্গীত, সম্পাদক, উপেন্দ্রনাথ দাস, গা-৫৩, পৃঃ ২৮
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ১০২*
হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক, প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-৪৬,* পৃঃ ১৫৫
* রচয়িতার নাম হরিদাস হালদার

৭৮। বাউলের সুর

আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হলো লাঠির ঘায়
ঐ যে মায়ের জয় গেয়ে যায় ॥ (বন্দেমাতরম্ বলে)
রক্ত বইছে শতধার, নাইকো শক্তি চলিবার
এবা মার খেয়ে কেউ মা ভোলে না সহে অত্যাচার,

এত পড়েছে লাঠি, ঝরছে রুধির,
তবু হাত তোলে না কারো গায় ॥
*
আছে দিব্যচক্ষু যার, খোল, ভবিষ্যতের দ্বার
সময় হ'লে পশুবলের দেখবে প্রতিকার—
হবে, ম্যাঞ্চেষ্টারের অন্নকষ্ট হাহাকার পেটের দায়।
শুনি য়িহুদীদের দল, যখন ছিল হীন বল,
হেরোদ রাজা বালকবধে গেল রসাতল ;
হ'ল হত শিশুর রক্তপাতে কংশের ধ্বংস মথুরায় ॥
ও ভাই, বলে বিশারদ এতো দু'দিনের বিপদ
হ'লে নিজের শক্তি স্বদেশ ভক্তি আসিবে সম্পদ।
আছেন দর্পহারী মধুসূদন দুর্ব্বলের শেষ দশায় ॥

—কাব্যবিশারদ, কালীপ্রসন্ন
(১লা বৈশাখ, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ)

জাতীয় সঙ্গীত, পৃঃ ৪২

৭৯। বাউলের সুর

এই কি সেই আর্য্যস্থান *১ আর্য্যস্থান,
(ও যার) তপোবলে যোগবলে কাঁপিত দেবতার প্রাণ !
সদা (ও যার) হেরে বীর্য্যবল স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতল,
সভয়ে কাঁপিত গিরি-সাগরের জল।
দিগ্‌দিগন্তরে শূন্যভারে উড়িত বিজয়-নিশান।
*২

—কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ

বাঙ্গালীর গান, পৃঃ ৫১৩
*১ আর্য্যসন্তান
*২ আরও ১৫টি অতিরিক্ত চরণ আছে
মাতৃবন্দনা, পৃঃ ১২

৮০।

ক্ষমা কর মা বঙ্গভূমি
ক্ষমা কর মা হৃদয় খুলে।
আমি যে তোর অবোধ ছেলে
লবিনে মা কোলে তুলে ?
অদৃষ্টের ঘোর নিষ্পীড়নে
কতই দুঃখ রইল মনে,
তোরি স্নেহ—তোরি আদর
সবই যে মা গেছে ভুলে।
তোর কথা মোর মনে হলে
আমি ভাসি নয়ন জলে,
পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াই
পথে ঘাটে নদীর কূলে।

—কায়কোবাদ

হাজার বছরের বাংলা গান, গা-১৭, পৃঃ ১২৬-২৭

৮১। লুম ঝিঁঝিট—পোস্তা

কতদিন দহিবে এ তুষ অনলে (হায়) মম অন্তর।
কে নিবাবে এ আগুন কেবা আছে আমার
কত জাতি হল গেল মম দুঃখ না ফুরাল
অদৃষ্টের মন্দ ফল না ঘুচিল কভু আর।
যে ভারত জয়রোলে কাঁপিত জাতি মণ্ডলে
সে ভারত পদতলে কত দুঃখ এবে তার।
নিয়ে যার বুদ্ধি ভাতি গর্ব্ব করে কত জাতি
সেই আমি হত মতি করে সবে অনাদর।
পূর্ব্বসুখ মনে হ'য়ে দ্বিগুণ জ্বলে যে হিয়ে
অসহ্য যাতনা লয়ে বাঁচি তবে কেন আর॥

—কেদারনাথ

সঙ্গীতকোষ, গা-৩১৪৯, পৃঃ ৯৭৮

৮২। ইমন—আড়াঠেকা

হ'বে কি ভারতে পুনঃ এমন সুদিন,
ভারত-সন্তান কি রে হইবে স্বাধীন ?
ভীষ্ম, কর্ণ, ভীমার্জ্জুন, অশ্বত্থামা আর্য্য দ্রোণ,
জামদগ্ন্য বীর পুনঃ জন্মিবে কি কোন দিন ?
কাঁপিবে বিমান পৃথ্বী, পুনঃ বিক্রমে নবীন,
রহিবে না পুণ্যভূমি চির পরাধীন।

—গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ

সঙ্গীতকোষ, ২য়, গা-৩২০৫
মাতৃবন্দনা, পৃঃ ৩৭
জাতীয় উচ্ছ্বাস, গা-৭৭

৮৩। সুরটমল্লার—আড়া

দ্বিজ হও, ক্ষত্র হও, বৈশ্য শূদ্র আর,
যে করেছ একদিন অস্ত্র ব্যবহার।
সেই রণবেশে সাজ, করে খর অসি ভাজ,
নতুবা যবন-হস্তে আর নাই রে নিস্তার।
বধিবে শিশুর প্রাণ, না রবে নারীর মান,
নরাধম, পাত্রাপাত্র করে না বিচার।
বীররক্ত যার শিরায় সে কাপুরুষের প্রায়,
কেমনে দেখিবে এই পাপ ব্যবহার।
অসহায়া রমণীর, রক্ষাহেতু দিবে শির,
যে থাক এমন বীর, ধর রাখি তার।
এস দলে দলে জুটে, রণক্ষেত্রে যাও ছুটে,
বীর পুত্র, বীর ধর্ম্ম রাখ আপনার।*

—গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ

সঙ্গীতকোষ, ২য়, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৭৬, পৃঃ ৯৮৯
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পৃঃ ৩৭
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৮৬, * রচয়িতা অজ্ঞাত।

৮৪। পাহাড়ী—আড়া

ভারত দুঃখিনী আমি পরভোগ্যা পরাধিনী,
কেমনে এ পাপ-দুখ দেখাইব কলঙ্কিনী।
মৃতপ্রায় অধোমুখে, কলঙ্কী সন্তান বুকে,
কাঁদে পর-গঞ্জনায়, কাঁদি আমি অভাগিনী,
চন্দ্র সূর্য্য বংশে আজি নিস্তেজ নক্ষত্ররাজি,
বিরাজে কহিব কারে হেন দুঃখের কাহিনী।
অল্পমতি হীনপ্রাণ, আর্য্য তেজ অভিমান,
হারাইয়া পরপদ সেবিছে দিবাযামিনী।
হিমগিরি ভেঙ্গে পড়, পাতালে প্রবেশ কর,
কোন্ লাজে উচ্চশিরে চেয়ে আছ হতমানী।
সাগর প্রসার গ্রাস, এ মাটির দেহ নাশ,
এ কলঙ্ক চিহ্ন বুকে, মুছে ফেল মা ধরণি।
চন্দ্র সূর্য্য খসে পড়, এস আদি অন্ধকার,
ঢেকে রাখ পাপমুখ এ অপার দুঃখগ্লানি॥

—গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক লাহিড়ী, পৃঃ ৯০৮
সঙ্গীতকোষ, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৯৮২
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক, জলধর সেন, গা-৬৬

৮৫। খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি

না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।
অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি,
হও "বীরজায়া, বীর প্রসবিনী"।
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীরগুণ গাঁথা, বিক্রম কাহিনী,
স্তন্য দুগ্ধ যবে পিয়াও জননি।

বীরগর্ব্বে তার নাচুক ধমনী'
তোরা না করিলে এ মহা সাধনা,
এ ভারত আর জাগে না। জাগে না।

—গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ

মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পৃঃ ৩৬
সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৭ম খণ্ড, (ক্রমিক ৮০) পৃঃ ৩০
বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক লাহিড়ী, পৃঃ ৯০৭-৮
হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-৯, পৃঃ ১১৯

৮৬। মল্লার—আড়া

সোনার ভারত আজ যবনাধিকারে।
ভারত সন্তান বক্ষঃ ভাসে অশ্রুধারে
জ্ঞান রত্নাদির খনি সভ্যতার শিরোমণি
আজি সেই পুণ্যভূমি ডোবে গভীর আঁধারে।
যার ধমনী প্রবাহে আর্য্যের শোণিত বহে
সে কিরে কখন সহে এ ভীষণ অত্যাচারে।
সে বংশে-যে জন্মে থাক জাতির সম্মান রাখ
যবনের রক্তে আঁক আর্য্যকীর্ত্তি চরাচরে।
পুরুষেরা অস্ত্র ধর যুদ্ধে যেয়ে মেরে মর
অনলে প্রবেশ কর যত রমণী নিকরে
ভারত শ্মশান হোক মরু হয়ে পড়ে রোক্
তবু অধীনতা বেড়ি রেখ না রে পায়ে ধরে।

—গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ

সঙ্গীতকোষ, সম্পাঃ উ. না. মুখোঃ গা-৩১৭৫, পৃঃ ৯৮৮
মাতৃবন্দনা, সম্পাঃ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য পৃঃ ১৯০

৮৭। পাহাড়ী—আড়া

নির্ব্বাণ আশার দীপ, সব অন্ধকার।
পারি না বহিতে এ পাপ জীবন আর।
রোগে শোকে জীর্ণ জ্বরা, জীয়ন্তে হয়েছি মরা,
মিছে কেন বসুন্ধরা, বহ এ দেহের ভার।
নিজ দেহে দেহ ঠাঁই, মাটি হয়ে মিশে যাই,
লুপ্ত হোক একবারে, শেষ-চিহ্ন অভাগার।
ভালবাসা স্নেহপ্রীতি, মুছে ফেল পূর্ব্ব-স্মৃতি,
বাসিয়াছ যারা ভাল নিজ গুণে আপনার ;
কাঁদায়েছি কাঁদিয়াছি, এই শেষ-ভিক্ষা যাচি,
স্মরিও না হতভাগ্যে ফেলিও না অশ্রুধার।
অশ্রুযোগ্য নয় সে যে, কর্ম্মক্ষেত্র যেই ত্যজে,
না উৎসর্গী দেহ-প্রাণ, করিতে দেশ-উদ্ধার!

—গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ

সঙ্গীতকোষ, গা-৩১৬৪, পৃঃ ৯৮৪
মাতৃবন্দনা, পৃঃ ৩৮
বাঙ্গালীর গান, পৃঃ ৯০৮
জাতীয় উচ্ছ্বাস—গা-৬৯

৮৮। কামোদ-খাম্বাজ—জলদতেতালা

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা?
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর,
ধরাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা।

--গুপ্ত (রামনিধি) নিধুবাবু

গীতাবলী, রামনিধি গুপ্ত। পৃঃ ১০৪ (২য় সং)

৮৯। পাহাড়ী—একতালা

দেখ গো ভারতমাতা তোমারি সন্তান
ঘুমায়ে রয়েছে সবে হয়ে হতজ্ঞান
সবে বলবীর্য-হীন অন্ন বিনা তনুক্ষীণ
হেরিয়ে এদের দশা বিদারিয়ে যায় প্রাণ
মরি এ দশা তোমার হেরিতে না পারি আর
অপার জলধিপাস চলিলাম ছাড়ি এ স্থান।

—গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ

সঙ্গীতকোষ, গা-৩১৭১, পৃঃ ৯৮৭
জাতীয় উচ্ছ্বাস, গা-৭৪

৯০। ললিত, আড়া

এত দিনে পোহাইল ভারতের দুঃখ-রজনী।
প্রকাশিল শুভক্ষণে নববেশে দিনমণি।
দেখে পাপেতে কাতর, সর্বজনে জরজর,
পাঠালেন স্বর্গরাজ্য, মুক্তিদাতা পিতা যিনি।
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এসো সবে আনন্দেতে,
ছিন্ন করি পাপ-পাশ বীর-পরাক্রমে।
উর্ধ্ব দিকে হস্ত তুলি' গাও তাঁরে সবে মিলি,
'জয় জগদীশ' বলি কর সদা জয়ধ্বনি॥

—গোস্বামী, বিজয়কৃষ্ণ

ব্রহ্মসঙ্গীত, ৮ম অধ্যায়, গা-৮১৯, (পৃঃ ৪০৭)
বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৬০৩

৯১। কাফি—একতালা

উর গো বাণি বীণাপাণি,
উর গো কল্প-কাননে।
উর গো বঙ্গ-বিনোদি আজ,
বীণার মধুর নিঃস্বনে॥

আছে দেহ, তাহে নাহি প্রাণ,
না চলে ধমনী, নাহি জ্ঞান,
প্রাণময়ী কর প্রাণ দান, পীযূষ-শক্তি সিঞ্চনে।
আছে আঁখি নাহি দেখি তায়,
জীবিত কি না মৃত, হায় কি দায়,
জীবনে জীবনী দেও মাতঃ
তাড়িত তেজ-স্ফুরণে॥

—ঘোষ, কালীপ্রসন্ন

বাঙ্গালীর গান, পৃঃ ৭৬৯
সঙ্গীতকোষ, গা-৩:৮৩
জাতীয় উচ্ছ্বাস, গা ৯০

৯২। জংলা—খেমটা

গাওরে ভারতসঙ্গীত, সবে প্রাণ ভ'রে।
ভারতীর আরতীতে ভক্তিপূত বীণা-করে॥
মিলি আজ প্রাণপণে, জনমতীর্থ স্থানে,
জননীর নাম গানে, ভাস আনন্দ সাগরে।
কত আর ঘুমে রবে, জাগরে জাগ সবে,
ঐ শুন বাজে ভেরী আশার মোহন স্বরে॥
সাধনায় সিদ্ধি ফলে, সাধিলে·· বলে,
একথা কণ্ঠ খুলে, ঘোষ সবে ঘরে ঘরে।
গিরি বিদরে যদি, শুষে যায় সিন্ধু নদী,
তথাপি মন্ত্রযোগে, সাধিবে মন্ত্র অন্তরে।
হৃদয়ে আরাধনা রসনায় উদ্দীপনা,
আহুতি প্রাণ মন, শক্তির সোপান' পরে॥

—ঘোষ, কালীপ্রসন্ন

বাঙ্গালীর গান, পৃঃ ৭৯২
সঙ্গীতকোষ, গা-৩১৫৬
মাতৃবন্দনা— পৃঃ ৩৫
জাতীয় উচ্ছ্বাস— গা-৬২।* রচয়িতা অজ্ঞাত।

৯৩। জংঙ্গলাট—খেম্‌টা

জননী জন্মভূমি স্বর্গ তুমি মহীতলে।
পূজিব পা-তুখানি আজি মোরা অশ্রুজলে ॥
আমরা অভাজন, জানি না মা কেমন,
তবু মা পালিতেছ অন্ন জলে রাখি কোলে ॥
নাহি মা অঙ্গে বল, সম্বল অশ্রুজল,
দিব তাই ভক্তি-ফুলে শ্যামল পদ-কমলে।
হৃদয়ের ছিন্ন তারে, ডাকি আজ মা তোমারে,
হৃদয়ে ভাত তুমি ফুল্ল শ্বেত শতদলে ॥

—ঘোষ, কালীপ্রসন্ন

বাঙ্গালীর গান, পৃঃ ৭৯২
সঙ্গীতকোষ, গা-৩১৬৭
জাতীয় উচ্ছ্বাস, গা-৭১

৯৪।- নটবেহাগ—পোস্তা

নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা।
সোনার প্রতিমা, আজি শোকে মলিনা ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে যাঁর, কোকিল কণ্ঠে
খেলিল সুধা তরঙ্গ ;
সে কবি নিকুঞ্জ কান্তি, *শ্মশান সমানা।
বীর-রাগ-মদে, যেই তানে গর্জ্জিত ভারত,
আজি সে দীপক-রাগ, শ্রবণে শুনি না ॥

—ঘোষ, কালীপ্রসন্ন

বাঙ্গালীর গান, পৃঃ ৭৯২
স্বদেশী সঙ্গীত, গা-১৪
মাতৃবন্দনা— পৃঃ ৩৫ *"নিকুঞ্জ আজি"

৯৫

নয়ন জলে গেঁথে মালা পরাব দুঃখিনী মায়।
ভক্তি-কমল কলি দিব মায়ের রাঙ্গা পায়॥
শিখ হৃদি উচ্চ শিক্ষা, মাতৃমন্ত্রে লহ দীক্ষা,
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা, রহ জননী সেবায়॥
যে নামে দুরিত হরে, রাখ যত্নে হৃদে ধরে,
অবনী তারে আদরে, জননী প্রসন্না যায়॥

—ঘোষ, গিরিশচন্দ্র

মাতৃবন্দনা, পৃঃ ৩৬
জাতীয় উচ্ছ্বাস, গা-৪২
হাজার বছরের বাংলা গান, গা-৮, পৃঃ ১১৮

৯৬।

কেন আর ভাবৃছ অত, দু'দিন থাক র'য়ে স'য়ে।
এস ভাই থাকি সবাই, মায়ের ছেলে মায়ের হ'য়ে॥
স্বদেশী কাপড় নিতে, পেছিয়ো না ভাই দু'পাই দিতে,
হার হ'বে না, যাবে জিতে, দেশে টাকা যাবে র'য়ে॥
ভয় করো না চড়া দরে, সস্তা হ'বে দু'দিন পরে,
তাঁত বসেছে ঘরে ঘরে, সস্তা কাপড় দেবে ব'য়ে॥
কাজ কি বিদেশী ধাঁজে, ফক্কিকারী কিনে বাজে,
আধা দিলে দেশের কাজে, কেউ তো ভাই যাব না ক্ষয়ে॥
প'ড়ে থেকে পরের পায়ে, পেটে ভাত নাই, বস্ত্র গায়ে,
মাথা দিতে আপন দায়ে, ভীরু যে সে পেছোয় ভয়ে॥
দুখের তো নাই অবধি, দেখি কিছু হয় হে যদি,
সইবো কত নিরবধি, যা' হবার থাক্ হ'য়ে ব'য়ে॥

—ঘোষ, গিরিশচন্দ্র

স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ২৩৬-৩৭

৯৭। মালকোষ—ঝাঁপতাল

জাগো শ্যামা জন্মদে !
প্রসীদ প্রসন্নময়ী বর দে মা বরদে ॥
তনয়ে হৃদয়ে ধরি, উঠ মা শোক পাশরি,
শুভ দে গো শুভঙ্করি, মাগি পদ-কোকনদে ॥
পোহাল যামিনী ঘোরা, উঠ গো জননী ত্বরা,
হেরি সুখ দুখহরা, ভাসিব আনন্দহ্রদে ॥

—ঘোষ, গিরিশচন্দ্র

জাতীয় সঙ্গীত, পৃঃ ৪৮
জাতীয় উচ্ছ্বাস, গা-৪৩

৯৮

শুনিস্ নে আর কারো কথা আপন পথে চল আপনি।
পারে না কেউ ফিরাতে বিধাতার আদেশ-বাণী ॥
যত সব দাঁড়াক পথে,
শেষে সবাই আস্‌বে সাথে,
বিধাতা হাল ধরেছেন, ডোবে কি রে আর তরণী ॥
যারা আজ ভাব্‌ছে পাগল,
হবে ভাই তারাই পাগল,
হতাশে কাঁদবে শেষে আপনার শেল আপনি হানি ॥
উঠেছে নবীন রবি
ভারতের নাই সে ছবি,
এসেছে সুদিন ফিরে কোলে নিবেন আজ জননী ॥

—ঘোষ, হরেন্দ্রচন্দ্র

মাতৃমন্ত্র— গা-১১, পৃঃ ১১-১২
স্বদেশগীতি, গা-২৩, পৃঃ ২৫-২৬

৯৯। ব্যাণ্ডের সুর

চল্ রে চল্ রে চল্ রে ও ভাই
জীবন-আহবে চল ; চল্ চল্ চল্।
বাজবে সেথা রণভেরী,
আসবে প্রাণে বল ; চল্ চল্ চল্।
ছেড়ে দিয়ে সুখ, দূরে রেখে মান,
বীর সাজে আয় হাতে নিয়ে প্রাণ,
বীর দর্পে কাঁপবে ধরা,
করবে টলমল ; চল্ চল্ চল্।
বেঁচে থেকে ভাই সুখ কি আছে ?
লাগুক জীবন দেশের কাজে,
জীবন গেলে জীবন পাব
হউক জনম সফল ; চল্ চল্ চল্।
উঠ্‌ছে দেখ্ ঐ তরুণ তপন,
ফুটছে কেমন আশার কিরণ ;
ঐ আশাতে বুক বেঁধে ভাই।
আয়রে দলে দলে ; চল্ চল্ চল্।*
জয় জয় রবে কাঁপুক গগন
দলিত অরিতে মেদিনী মগন
বীর রঙ্গে বিঘ্ন বাধা
পদতলে দল ; চল্ চল্ চল।
জননীর ডাক ওই শোনা যায়
আয়রে সকলে ছুটিয়া আয়
বন্দেমাতরম্ আজি
প্রাণে প্রাণে বল ; চল্ চল্ চল্।

—চক্রবর্ত্তী, মনোমোহন

জাতীয় সঙ্গীত, সম্পাঃ উপেন্দ্রনাথ দাস, (পৃঃ ১৬-১৭)। দু'টি স্তবক অতিরিক্ত।
মাতৃবন্দনা, সম্পাঃ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য (পৃঃ ৯১)* গানটি এখানেই শেষ। রচয়িতার নাম উল্লিখিত আছে। প্রথম সংকলনে নেই।

১০০। 'বৃটেন্‌স কল'-এর সুরে গৃহীত

বঙ্গের আহ্বান

বাজে রণের ভেরিরে!
আজি বঙ্গ জাগরে।
জীবনে মৃত থেকনা ভাইরে,
চলরে, চলরে (এবার) চল, যাইরে।
যারা পড়ে থাকে পিছে,
তারা মরে থাকে মিছে;
স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা
এসব লয়ে অলস থেক না।
ডাকে যে রাজা, ডাকে ওই জননী।
জেগে উঠে প্রাণ শুনে সেই বাণী;
গগন মাঝে ডাক উঠেছেরে
কে আর মোদের রাখে ধরে!
উদিত বঙ্গে নূতন তপন,
উঠেছে ঝঙ্কারি আশার গান,
নবীন জীবনে নব জাগরণ।
(হবে) রাজার (জর্জের) জয় এদেশের মান!
দেবদেবীদের আশিস ফলে
মিলে মোরা আজ স্বদলবলে
বিজয় হুঙ্কার তুল্‌ব আকাশে।
আস্‌বে শান্তি সকল দেশে।
শত্রু দম্ভ করিব খর্ব্ব,
রাখিব আর্য্যকুলের মান,
আনিব মোরা করিয়ে গর্ব্ব
পাতিত অরাতি রণ নিশান। *১

—চট্টোপাধ্যায়, করুণাকুমার

বঙ্গের আহ্বান, করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯১৮। *১ এই একটি গান ও স্বরলিপিময়ই বই।

১০১। মল্লার—আড়াঠেকা

ভারত-উদ্ধার বল হবে হে কেমনে। ধর্ম্মবল মহাবল লভ প্রতিজনে
বচনে বল কোথায়, জেগেছে মানবচয়
জীবন উৎসর্গ-বিনা বাঁচে না জাতি জীবন।
জেনেছ যাহা উচিত, কিম্বা যাহা অনুচিত
কার্য্যে কর পরিণত দৃঢ়তা দেখাও জীবনে।
সত্যেতে নির্ভর যার ঈশ্বর সহায় তার,
জাতীয় গৌরব চাহ, গঠন কর জীবনে।

-চট্টোপাধ্যায়, কালীচরণ

সঙ্গীতকোষ, গা-৩১৫০, পৃঃ ৯৭৮
জাতায় উচ্ছ্বাস, গা-৫৭

১০২। আলাইয়া—একতালা

প্রভু এই তব পদে করি নিবেদন
কাঁদে যেন আমার মন ভারত যতদিন পরাধীন
জননী যে মৃতপ্রায় এবে ধরণী লোটায়
লোকে তাঁরে মৃতসাজে দেখি যে সাজায়
এ দেখে বল্ কি করে হাঁসি খেলি এ সংসারে
কাঁদাও কাঁদাও মোরে কাঁদুক ভ্রাতাভগ্নীগণ।
যতদিন বেঁচে রব চক্ষের জল ফেলিব মরণ সময়ে এই বলিয়ে যাব
কে কোথা আছ রাখ রে আমার এই ভার
কাঁদিতে রহ জীবনে কেঁদেছি আমি—খন।

—চট্টোপাধ্যায়, কালীচরণ

সঙ্গীতকোষ, গা-৩১৮৭, পৃঃ ৯৯৩
জাতীয় উচ্ছ্বাস, গা-৯৩

১০৩। মল্লার—কাওয়ালী তাল

"বন্দেমাতরম্
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং
মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটীকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখর-করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং
নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং
মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্
অমলাং অতুলাম্

সুজলাং সুফলাম্
মাতরম্
বন্দেমাতরম্
শ্যামলাং সরলাম্
সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরনীম্
মাতরম্ ।"

—চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র

আনন্দমঠ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১ম খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ। সা পরিষদ পৃঃ ২১-২২ (১৮৮২)
সাহিত্য পরিষদ সং-ভূমিকা, পৃঃ ১৩-১৬
বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক লাহিড়ী, পৃঃ ৬৯৮* রাগ—তিলককামোদ-ঝাঁপতাল
বন্দেমাতরম্, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, গা-১, পৃঃ ৯, রাগ—তিলককামোদ-ঝাঁপতাল
জাতীয় সঙ্গীত, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ দাস, গা ৩৮, পৃঃ ৩
সঙ্গীতকোষ, ২য় খণ্ড, ভারতসঙ্গীত, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোঃ, গা-৩১০৬ (পৃঃ ১০০)
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-১,
স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক নরেন্দ্রকুমার শীল, গা ১,

১০৪

মুক্তি মোদের পরাণ বঁধু, বন্দীশালা—বাসর ঘর।
মরণ মোদের পিয়ায় মধু, কামান শোনায় বাঁশীর স্বর ॥
স্বাধীনতার প্রেমে পাগল, তাই ভেঙেছি ঘরের আগল।
আপন বুকের রক্তে রাঙা, মোদের মাথায় লাল টোপর ॥
অমূল্য ধন মুক্তি রতন বাইরে কোথায় খুঁজিস্ তায়?
দুঃখের বুকে সৃষ্টি তাহার, বন্দীশালার কারখানায় ॥
ভালো তারে বাসল যেজন, ব্যথায় তাহার ভরলো জীবন;
দৈন্য হোলো সাথের সাথী, সঙ্গী হোলো প্রলয় ঝড় ॥

—চট্টোপাধ্যায়, বিজয়লাল

মুক্তির গান, সতীশচন্দ্র সামন্ত, গা-৭৮, পৃঃ ৯১-৯২

১০৫।

চাই স্বাধীনতা, সাম্য চাই,
গাহ দিকে দিকে চারণদল,
পীড়িত দলিত বন্দী নর,
সবলে দুহাতে ভাঙো শিকল।
মুক্তির কভু নাই মরণ,
কোটি-হিয়া-তলে তার আসন,
সাম্যের জয় চিরন্তন,
এই বিশ্বাসে রহ অটল।
শুভ্র পতাকা ফেলিয়া দাও,
ঊর্দ্ধে উড়াও লাল নিশান,
শান্তির কথা ভুলিয়া যাও,
প্রলয় নাচন নাচে ঈশান।
মরণ-পথের-পথিক বীর,
ভীরুরা থাকুক আঁকড়ি তীর,
তুমি বিদ্রোহী, তুমি অধীর,
দিকে দিকে জ্বাল কাল অনল।

—চট্টোপাধ্যায়, বিজয়লাল

মুক্তির গান, গা-৭৪, পৃঃ ৮৮
ভারতের স্বদেশী গান, কমল রায়চৌধুরী, গা-৫১ পৃঃ ৬০

১০৬।

খাম্বাজ—আড়াঠেকা

ছিল গো ভারত তব একই অধিকার
তাহেও বঞ্চিত প্রায় হইলে এবার
অবিচার উৎপীড়নে দহিলে পরাণমনে
মুক্তকণ্ঠে স্বাধীনতা ছিল তব কাঁদিবার
দুঃখ দাবানলে দহি দুঃখের কাহিনী কহি
একই উপায় ছিল শান্তিবারি লভিবার

এমনি কপাল তোর দুঃখ দাহে দহি ঘোর
সে ঘোর দুঃখের কথা কহিতে নারিবে আর।

—চট্টোপাধ্যায়, শীতলাকান্ত

সঙ্গীতকোষ, গা-২২০৩, পৃঃ ১০০০

১০৭। চরকা স্তোত্র

অবনত ভারতের দুঃখ দৈন্য-ম্লান মুখ
হেরি কি কাঁদিল তব প্রাণ,
তাই সুদর্শনধারী, প্রেরিলা আপন চক্র
করিতে ভারতে আজি ত্রাণ!
সিন্ধুতটে তাপসেরে স্বপনে দিলে কি দেখা
শিখাইলে মুক্তিমন্ত্র সার,
তোমারি বরেতে সে কি দেশ গর্বে উচ্চশির
চর্কা মন্ত্র করিলা প্রচার?
তামসী রজনী শেষে ঊষার আলোক সম
জ্যোতিরূপে চক্র দিল দেখা,
জাতির উত্থান তরে অবসাদ পারাবারে
তরীরূপে আইল চরকা।
সম্ভ্রমে নমিয়া সবে পূজে সুদর্শনে আজি—
চরকা উৎসব ঘরে ঘরে;
নমঃ নমঃ সুদর্শন, নমঃ চর্কা নমঃ পুনঃ
বিরাজ ভারতে চিরতরে॥

—চৌধুরী, হেমদাকান্ত

মুক্তির গান, গা-১১৩, পৃঃ ১২৫
জাতীয় সঙ্গীত, প্রকাশক বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী, মুখপত্র।

১০৮। রাগিণী বাহার—তাল জং

লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে।
লুঠিতেছে পরে এই রত্নের আকরে॥
সাধিলে রতন পাই, তাহাতে যতন নাই।
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে॥
দেশান্তর-জনগণ, ভুঞ্জে ভারতের ধন,
এ দেশের ধন হায়, বিদেশীর তরে॥
আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা,
মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে॥

—ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ

হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১১৫
সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫৪
বাঙ্গালীর গান, পৃঃ ৭০৯
জাতীয় সঙ্গীত, গা-৪৮, পৃঃ ৪৭
সঙ্গীতকোষ, গা-৩১৪৪, পৃঃ ৯৭৬

১০৯। নটবেহাগ—ঝাঁপতাল

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি,
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-বারি।
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,
আজি এ মলিন-মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি।

—ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ

বন্দেমাতরম্, পৃঃ ৫৮
বাঙ্গালীর গান, পৃঃ ৬০৮
শতগান, গা-৪৯, পৃঃ ১৩০, শেষ চরণটি নেই।
সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৫
জাতীয় সঙ্গীত, পৃঃ ৩১
সঙ্গীতকোষ, গা-৩১৯৩, পৃঃ ৯৯৫
জাতীয় উচ্ছ্বাস, গা-১৪

১১০।

আয় রে আয় দেশের সন্তান
গৌরবের দিন এসেছে ;
অত্যাচার ঐ দ্যাখ্-গগনে
রক্ত-ধ্বজা তুলেছে।
শুনিছ না ক্ষেত্র মাঝে
ভীষণ সৈন্যের হুঙ্কার ?
ওরা আসে বুকের পরে
করিতে স্ত্রী-পুত্র সংহার।
ধর অস্ত্র পৌরজন
কর ব্যূহ সংগঠন ;
চলো-চলো-মোদের ক্ষেত্রে
শত্রু রক্ত হোক্ সিঞ্চন।

—ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫৬

১১১। শঙ্করা—কাওয়ালী, সুর প্রচলিত

চল্ রে চল্ সবে ভারত-সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান।
বীর-দর্পে পৌরুষ-গর্বে
সাধ্ রে সাধ্ সবে দেশের কল্যাণ।
পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈন্য
কে করে মোচন ?
উঠ, জাগো, সবে বল—মা গো !
তব পদে সঁপিনু পরাণ।
এক তন্ত্রে কর তপ,
এক মন্ত্রে জপ্ ;
শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোর এক,
এক সুরে গাও সবে গান।

দেশ-দেশান্তে যাও রে আন্‌তে
নব নব জ্ঞান
নব ভাবে, নবোৎসাহে মাতো
উঠাও রে নবতর তান।

লোকরঞ্জন লোক-গঞ্জন
না করি দৃক্‌পাত
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায়
তাহাতে জীবন কর দান।
দলাদলি সব ভুলি
হিন্দু-মুসলমান;
এক পথে এক সাথে চল
উড়াইয়ে একতা-নিশান।

—ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

'বীণাবাদিনী' পত্রিকা, ১৮৯৮, চৈত্র সংখ্যা

১১২।

"জাগ জাগ জাগ সবে ভারতসন্তান।
মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান?
দেখ দেখি জননীর দশা একবার
রুগ্ন শীর্ণ কলেবর অস্থিচর্মসার;
অধীনতা অজ্ঞানতা রাক্ষস দুর্জ্জয়,
শুষিছে শোণিত তাঁর বিদারি হৃদয়;
স্বার্থপর অনৈক্য বিশাচ প্রচণ্ড
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেহ করে খণ্ড খণ্ড।"

—ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

১১৩। রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা

"গাও ভারতের জয়"

মিলে সব ভারত সন্তান,
একতান মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
কোন্ অদ্রি অভ্রভেদী হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত-খনি কত মণি-রত্নের নিধান!
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয় ॥
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়!
রূপবতী সাধ্বীসতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
* হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত-ভূষণ।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয় ॥
বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি!
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয় ॥
ভীষ্মদ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীরগণ।
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল-ধূমকেতু
আর্তবন্ধু দুষ্টের দমন!
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয় ॥

কেন ডর, ভীরু কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্মস্ততো জয় !
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল
মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইবে নিশ্চয় ।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয় ॥

—ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, বন্দ্যোঃ+মুখোঃ পৃঃ ৩১২-৩১৩
হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, যোগেশচন্দ্র বাগল। পৃঃ ১১৩-১১৪
শতগান, সরলা দেবী, গা-৫৫, (পৃঃ ১৩৯)*
* একতালা ছন্দ, সুরকার রবীন্দ্রনাথ।
সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ (পৃঃ ২০-২১) (ক) (S.N. ৬৭)
বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক লাহিড়ী, (পৃঃ ৬১২-১৩)* একটি অতিরিক্ত চরণ "শর্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা, অতুলনা ভারত-ললনা"। *(পৃঃ ৬০-৬২)
বন্দেমাতরম্, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-১০
স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক নরেন্দ্রকুমার শীল, গা-৩৯

১১৪ । বেহাগ—তেওরা

ওহে বিশ্বশোভন মুক্ত চেতন
মাগিছে ভারত তোমার শরণ
খোলো হে তাহার রুদ্ধ দুয়ার
মেলো হে তাহার গভীর চেতন।
ভারতপূজিত তোমার মূরতি
ভারতবিদিত তোমার ভারতী
ভারত গগনে তোমার আরতি
হেরিতে আজি চাহিছে ভুবন।
দাও হে তাহার বাঁধন খুলিয়া
তোমার চরণে লও হে তুলিয়া
কত না কালের ধুলায় ঢাকিয়া
রয়েছে তাহার মুদিত নয়ন।

তরাও তাহার দুঃখ পাথার
ঘুচাও তাহার মৃত্যু আঁধার
অমর বীণায় বাজাও হে তার
অমর সুরের অমর জীবন।

—ঠাকুর, হেমলতা

সুর ও স্বরলিপি ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

১১৫। সিন্ধুভৈরবী—একতালা

আজি মঙ্গল মোহন তানে ভারত যশ গাও রে,
স্বদেশের হিত লাগি প্রাণ ঢেলে দাওরে।
ও ভাই আর্য্যনামে, কি সম্ভবে, জীবনে দেখাওরে
নরনারী মিলি সবে ভারতবর্ষে আজি,
দেশের কাজের জন্যেরে ভাই স্বার্থ ভুলে যাওরে ॥

—দত্ত, অশ্বিনীকুমার

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক লাহিড়ী, পৃঃ ৬৮৪

১১৬। ঝিঁঝিট—একতালা

আয় রে আয় রে ভারতবাসী, আয় সবে মিলে
প্রণমি ভারতমাতার চরণকমলে।
আয় রে মুসলমান ভাই, আজ জাতিভেদ নাই,
এ কাজেতে ভাই ভাই, আমরা সকলে।
ভারতের কাজে আজি, আয় রে সকলে সাজি,
ঘরে ঘরে বিবাদ যত, সব যাই ভুলে।
আগে তোরা পর ছিলি, এখন তোরা আপন হলি,
হইবে তবে গলাগলি, ভাই ভাই বলে।
ভারতের যেমন মোরা, ওরে ভাই তেমনি তোরা,
ভেদাভেদ যত কিছু, কোথা গেছে চলে।

আয় রে ভাই সবে মিলি, মাখি ভারতের ধূলি,
এমন আর পবিত্র ধূলি নাহি ভূমণ্ডলে।
এ ধূলি মস্তকে লয়ে ভাবেতে প্রমত্ত হয়ে
হিন্দু-মোস্লেম কাজ করিব, জাতিভেদ ভুলে।
এ ধূলিতে আকবর তোদের এ ধূলিতে শ্রীরাম মোদের,
আরও শৌর্য্যবীর্য্য কত, মিশিয়াছে কালে।
ওরে ভাই এ ধূলির গুণে, খাটি সবে প্রাণপণে ;
ভারতের দুর্দ্দশা মোরা নাশিব সমূলে।

—দত্ত, অশ্বিনীকুমার

অশ্বিনীকুমার রচনাসম্ভার, গা-৩৩, পৃঃ ২৪
স্বদেশী সঙ্গীত, গা-৭১

১১৭। বেহাগ—আড়া

আয় আয় সবে ভাই যাই দ্বারে দ্বারে,
ভারতের ভাগ্য দেখি ফেরে কিনা ফেরে।
সোনার এরাজ্য ছিল, ক্রমে ক্রমে সকল গেল,
এমন যে ভারতবর্ষ গেল ছারেখারে।
অন্নপূর্ণ রাজ্য হারে, 'হা অন্ন হা অন্ন' করে,
লক্ষ্মীর ঘরে এমন কষ্ট, কে সহিতে পারে,
ছিল ধন ধান্যে ভরা, হল এমন কপাল পোড়া,
অন্নাভাবে হা হতোঽস্মি প্রতি ঘরে ঘরে।
এই দেশেতে তুলা হয়, এই তুলা বিলাতে যায়,
এই তুলাতে কাপড় তথায় বোনে মাঞ্চেষ্টারে ॥
মাঞ্চেষ্টার হতে এসে, ঘরের টাকা নেয়রে শুষে,
এদিকে দেশের তাঁতি অনাহারে মরে ॥
এই কি দেশের ভালবাসা,
তাঁতি ভাইদের এই দশা,
তাদের এই দুঃখ তোরা, দেখিস্ কেমন করে ;

আয়রে চেষ্টা করি সবে,
দেশী কাপড় বিক্রী হবে,
সাজারে দেশী তাঁতি সবে, ধন রত্ন হারে।
ইংরাজ শিল্পী দেখ গিয়ে, বাঙ্গালীর টাকা নিয়ে,
তেতালা চৌতালায় কেমন, সুখে বিরাজ করে।
(আর) বাঙ্গালী শিল্পী যারা, অনাহারে মরে তারা,
দেখে তাদের এ দুর্দ্দশা, প্রাণ যে কেমন করে।
*১ (নাহিরে পূর্ব্ব ভারত, গেছে সেদিন জন্মের মত,
ছি ছি বলে দেখে সবে, ভারতসন্তানে।
ছিল যারা প্রপূজিত নানাগুণে বিভূষিত.
স্বাধীনতা ভাবে মত্ত, খ্যাত বীর নামে ;
(আজ) করে গোলামীর কাজ,
গোলামীতে নাহি লাজ,
গোলামীর পরে গোলামী, পুরুষানুক্রমে।
কি দেখিবিরে বিদেশী, আজি হেথা অমানিশি,
কতশত বর্ষ শশী, না দেখি নয়নে।
হারে ভাই কি দেখিবি, ছিল যে বিচিত্র ছবি,
রম্য হর্ম্ম্য-সৌধ যত, বিনষ্ট লুণ্ঠনে।)

—দত্ত, অশ্বিনীকুমার

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৬৮৪-৮৫
অশ্বিনীকুমার রচনাসম্ভার, সম্পাদক মণীন্দ্রকুমার ঘোষ। অধ্যয়ন, কলি, ১৯৬৮, গান, সংখ্যা ৩২, পৃঃ ২৩

*১ শেষের অংশটি পৃথক। সেখানে আছে—
"একসমান জিনিসও হ'লে, যেটারে বিলাতী বলে,
দেশী জিনিস ছেড়ে তাই, নেয় কুলাঙ্গারে ;
কেন কুলাঙ্গার হব ? দেশের মোরা ধন বাড়াব,
সুখে রাখিব যত দোকানদারে।
আয় সবে দ্বারে দ্বারে, ভাই সকলের পায়ে পড়ে,
(যাতে) দেশী লোকের টাকা হয়, বলি গে সবারে ;
বিলাতী ফাঁকিতে ভুলে, আর যেন না টাকা ফেলে,
যতন যেন করে যাতে দেশের টাকা বাড়ে।" (পৃঃ ২৩-২৪)

১১৮। বেহাগ—আড়া

ওরে শশী কি দেখিস্ আর এ ভারত-ভুবনে।
সোনার উদ্যান আজি পরিণত শ্মশানে ॥
এই কি সেই ভারতবর্ষ, যাকে শত শত বর্ষ,
রঞ্জিয়াছ তুমি শশী, ঐ সুস্নিগ্ধ কিরণে ;
আজি শশী হায় হায়, দেখ অন্ধকারময়,
যত জ্যোৎস্না ঢাল তুমি, মেঘভরা গগনে।
কি আর বলিব শশী, ত্রিশ কোটি শব তথা,
গৃধিনী শকুনি তাদের, টানিতেছে সঘনে ॥
তোমার সেই চন্দ্রবংশ, ক্রমে ক্রমে হল ধ্বংস,
সে খবর বুঝি শশী, পশে নাই শ্রবণে।
থাক্ শুনে কাজ নাই, শুনিবে সে খবর যাই,
পরিবে কালিমা রেখা, হাসি মাখা বদনে ॥

—দত্ত, অশ্বিনীকুমার

বাঙ্গালীর গান, সম্প্রাদক লাহিড়ী, পৃঃ ৬৮৫

১১৯। বাউলের সুর

ওরে ভাই কিসের লেগে দিনে দিনে এমন হলে ?
ওরে আর্য্যকুলে জনম ল'য়ে সকলই কি ভুলে গেলে ?
কিসে যে ভাই এমন হল বিদ্যাবুদ্ধি সকল গেল,
ওরে কপাল ভেঙ্গে এমন করে কি যে পেলে ?
ওরে ইন্দ্রিয় সেবাতে ভাইরে দিবানিশি মজে রইলে।
(ও ভাই) নাচেগানে থিয়েটারে কেমন এক মূর্ত্তি ধরে,
বেড়াও মিলে সবে পান চিবিয়ে দলে দলে ;
ওরে দিনান্ত রে দেশের দশা একবার ও ভাই না ভাবিলে।
দেশী তাঁতি কর্ম্মকারে অনাহারে ভাতে মরে,
(তুমি) বিদেশী বিলাসের খোঁজে কাল কাটালে ;
ওরে দেশের ভালবাসা নাই রে জনমিয়ে আর্য্যকুলে।

ইংরেজী নভেল পড়ে বেড়াও সদা গর্ব্ব করে,
ও ভাই আর্য্যঋষির গাঁথা যত জলে ফেলে,
এভাব দেখে তোমার ভাই রে আমরা ভাসি সদা নয়নজলে।

—দত্ত, অশ্বিনীকুমার

সঙ্গীতকোষ, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৮৪, পৃঃ ৯৯২
জাতীয় উচ্ছ্বাস, গা-৯১
স্বদেশী সঙ্গীত, গা-৬৫
অশ্বিনীকুমার রচনাসম্ভার, গা-৩৪, পৃঃ ২৫

১২০। সুরাট মল্লার—আড়া

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।
ছাড়ি জন্মভূমি-মায়া কি সুখে রয়েছ বসি ?
নাহি রে সে ভাগীরথী, নাহি সে শারদ শশী
(হায় হায় কি হইল,
এত দৈত্য দানব এল,
লুটি নিল যাহা ছিল,
এ স্বর্ণমন্দিরে পশি।)
যাতে এ দুর্গতি যাবে,
এস চেষ্টা করি সবে,
হিন্দু মোস্লেম মিলে সবে,
এস কটি বাঁধি কষি।

—দত্ত, অশ্বিনীকুমার

অশ্বিনীকুমার রচনাসম্ভার, গা-৩০, পৃঃ ২২

১২১। মল্লার—আড়া

বিধি কি নিদ্রিত আজি মনে কর বিদেশীগণ ?
আজিও সে ন্যায়দণ্ডে করিছে সবে শাসন ;
গরবে প্রমত্ত সদা নাহি মান কোন বাঁধা,
পদে পদে বাঙ্গালীরে কর নির্য্যাতন।

কথায় কথায় চক্ষু রাঙ্গাও, পদাঘাতে পীলে ফাটাও,
বিকারেতে সবা হেন দেখ ত্রিভুবন।
মনে ভাবিয়াছ সার, দণ্ড দিতে নাই কেউ আর ;
চিরদিন এমনি ভাবে করিবে যাপন ?
যে দেশে যে ব্যক্তি যখন করেছে লোকপীড়ন,
বিধির নিয়মে তার হয়েছে পতন।
তখনও ছিলেন যে বিধি, এখনও আছেন সে বিধি,
সে বিধির বিধি কদাপি না হইবে খণ্ডন।
যত মূর্খ সবে মিলি ধর্ম্মে দিয়ে জলাঞ্জলি,
সোনার এই রাজ্য আর করো না দহন।

—দত্ত, অশ্বিনীকুমার

অশ্বিনীকুমার রচনাসম্ভার, গা-৪০, পৃঃ ৩১

১২২।

শ্মশান তো ভালোবাসিস্ মাগো,
তবে কেন ছেড়ে গেলি ?
এত বড় বিকট শ্মশান এ জগতে কোথা পেলি ?
দেখ্ সে হেথা কি হয়েছে
ত্রিশকোটি শব পড়ে আছে
কত ভূত-বেতাল নাচে, রঙ্গে ভঙ্গে করে কেলি।
ভূত-পিশাচ-তাল-বেতাল,
নাচে আর বাজায় গাল,
সঙ্গে ধায় ফেরুপাল এটা ধরি ওটা ফেলি।
আয় না হেথা—নাচবি শ্যামা
শব হব শিব পা ছুঁয়ে মা
জগত জুড়ে বাজবে দামা, দেখবে জগৎ নয়ন মেলি।

—দত্ত, অশ্বিনীকুমার

হাজার বছরের বাংলা গান, গা-১৫, পৃঃ ১২৫

১২৩।

"গান"

মধুর চেয়েও আছে মধুর—
সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধূলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি!
চন্দনেরি গন্ধে ভরা,—
শীতল-করা,—ক্লান্তি-হরা,—
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখান্‌টিতেই শীতল-পাটি!
শিয়রে তার সূর্য্য এসে
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে,
নিদ্‌মহলে জ্যোৎস্না নিতি
বুলায় পায়ে রূপার কাঠি।
নাগের বাঘের পাহারাতে
হচ্ছে বদল দিনে রাতে,
পাহাড় তারে আড়াল করে,
সাগর সে তার ধোঁয়ায় পাটি।
মউল্‌ ফুলের মাল্য মাথায়,
লীলার কমল গন্ধে মাতায়.
পায়জোরে তার লবঙ্গ ফুল
অঙ্গে বকুল আর দোপাটি।
নারিকেলের গোপন কোষে
অন্নপানী' জোগায় গো সে,
কোল ভরা তার কনক ধানে,
আট্‌টি শীষে বাঁধা আটি।
সে যে গো নীল-পদ্ম-আঁখি,
সেই তো রে নীলকণ্ঠ পাখী,—
মুক্তি-সুখের বার্ত্তা আনে
ঘুচায় প্রাণের কান্নাকাটি।

—দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ

হাজার বছরের বাংলা গান, গা-৪৯, পৃঃ ১৫৮-৫৯

১২৪। ঝিঁঝিট—মধ্যমান

হায় কি তামসী নিশি ভারত-মুখ ঢাকিল।
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল॥
শোক-সাগরেতে ভাসি, ভারত-মা দিবানিশি,
স্মরি পূর্ব্ব যশোরাশি, কান্দিতেছে অবিরল;
কে এখন নিবারিবে, জননীর অশ্রুজল!

—দাস, উপেন্দ্রনাথ

জাতীয় সঙ্গীত, পৃঃ ৩৪
মাতৃবন্দনা, পৃঃ ৫১
সঙ্গীতকোষ, গা-৩২০০, পৃঃ ৯৯৮
জাতীয় উচ্ছ্বাস, গা-৩৬

১২৫। কালাংড়া—আড়াঠেকা

এস হে ভারতবাসী প্রীতির কুসুম হারে
খুঁজিব সকলে মিলি বীণাপাণি সারদারে
ওঠ বাল্মিকী ব্যাস ভবভূতি কালিদাস
বাজাও ভৈরববীণা গভীর মেঘমল্লারে।
ওঠ জয়দেব বঙ্গে মধুর মুরলী সঙ্গে
বাজাও মধুরতানে মৃদু বসন্ত বাহারে
কেন রহিলে নীরবে গাও এক তানে সবে
জাগায়ে ভারত সুপ্ত গিরিধন পারাবারে।

—দাস, গোবিন্দচন্দ্র

সঙ্গীতকোষ, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'ভারত-সঙ্গীত', গা-৩১৮৮, পৃঃ ৯৯৩

১২৬। মুলতান—আড়াঠেকা

বহুদিন হতে রে ভাই শ্রীহীনা অমরাপুরী
আগের নাহি সে কিছু ঐশ্বর্য্য রূপমাধুরী।

(অসুর দস্যুর বেশে প্রবেশি ত্রিদিব দেশে
লুঠিয়াছে রত্নাকর কহিনুর গেছে চুরি।)
দেবতার সুধা যাহা দানবের ভোগে তাহা
কত কষ্ট অমরের আহা আহা মরি মরি
সহে না পরাণে আর এ যাতনা অনিবার
এস ভাই একবার সবে প্রাণপণ করি
ভাগ্যসিন্ধু দেবতার বহু রত্ন গর্ভে তার
উদ্যম মন্দিরে মথি আশার বাসুকী ধরি।
উঠিবে সে ঐরাবত ধনরত্ন শত শত
লইয়া অমৃতকুম্ভ উঠিবে সে ধন্বন্তরী।
যদি উঠে হলাহল করিব কণ্ঠের তল
বল না কি ভয় তাহে ? প্রতিজ্ঞা বাঁচি কি মরি।

—দাস, গোবিন্দচন্দ্র

সঙ্গীতকোষ, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৬৯, পৃঃ ৯৮৬
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৭৩
ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী, সম্পাদক নবকান্ত চট্টোপাধ্যায

১২৭।

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে ? এ দেশ তোমার নয় ;—
এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোমার ইহা হত যদি,
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয় ?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্ম্মা ভরা চুনি মণি,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয় ?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয় !

(২)

এই যে ক্ষেতে শস্য ভরা, তোমার ত নয় একটি ছড়া,
তোমার হ'লে তাদের দেশে চালান কেন হয় ?
তুমি পাওনা একটি মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্ত গুষ্টি,
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি—জগৎ ভরা জয়।
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয়।

(৩)

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়,
এই যে জাহাজ, এই যে গাড়ী, এই যে পেলেস—এই যে বাড়ী,
এই যে খানা জেহেলখানা—এই বিচারালয়,
লাট ছোট লাট তারাই সবে, জজ মাজিষ্টর তারাই হবে,
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়—
বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয় !

(৪)

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়,
আইন কানুনের কর্ত্তা তারা, তাদের স্বার্থ সকল ধারা,
রিজার্ভ করা সুখসুবিধা তাদের ভারতময়,
তোমার বুকে মেরে ছুরি, ভরছে তাদের তেরজুরি,
তাদের চার্চ্চে তাদের নাচে তাদের বলে ব্যয় ;
এক-শ রকম টেক্‌স দিবা, বায়ের বেলায় তোমরা কিবা
গাধার কাছে বাধার বল বাঘের কবে ভয় ?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয় !

(৫)

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোমার নয়,
যে দেশ যাদের অধিকারে, তারাই তাদের বল্‌তে পারে,
কুকুর মেকুর ছাগল কবে দেশের মালিক হয় ?
সে সব বাবু বিলাত গিয়ে, বাবুনীদের সঙ্গে নিয়ে,
প্রসবিয়ে আন্‌ছে তাদের শাবক সমুদয়,
'ব্রিটিশ বরণ' ব'লে দাবি, কর্লে নাকি বিলাত পাবি ?
লজ্জাহীনের গোষ্ঠী তোরা নাইক লজ্জা ভয় !
এই যদি রে 'ব্রিটিশ বরণ' মরণ কারে কয় ?

—দাস, গোবিন্দচন্দ্র

সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৭ম খণ্ড, ক্রমিক সংখ্যা ৭৪, পৃঃ ৪৭-৪৯
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য (আরও অতিরিক্ত স্তবক আছে), পৃঃ ৫৮-৬০

১২৮।

নিয়েছ যে ব্রত, পালনে বিরত থেক না বঙ্গবাসিগণ,
ব্রতভঙ্গ হলে হাসিবে সকলে, দেশের কলঙ্ক ছাইবে ভুবন।
কঠিন আঘাতে না হলে চৈতন্য, ঘুচিবে না আর দেশের দুঃখদৈন্য,
খাট প্রাণপণে স্বদেশের জন্য, জাগিয়া উঠুক জাতীয় জীবন।
সবাই মোরা হুজুগেতে মাতি, ঘুচাও এ কলঙ্ক জাতীয় অখ্যাতি,
কার্যে দেখাও সবে মোরা আর্যজাতি দেশহিতে দাও আত্মবিসর্জন।
এত অপমান না জাগিলে প্রাণ, জাগিবে না কভু ভারতসন্তান
জলাঞ্জলি দিয়ে জাতি-কুল-মান, কি সুখে করিছ জীবন ধারণ?
পরাধীন জাতি প্রাণ সঁপেছে পরে, লালায়িত সদা গোলামীর তরে,
দেশের দশা হেরি হৃদয় বিদরে, করিতেছ শিরে পাদুকা বহন।
না হলে এ জাতি অসারের আসর
সোনার বাঙ্গালা কেন হবে ছারখার?
না জানি কি কোপ বঙ্গে বিধাতার
(বুঝি) দেব অভিশাপে দেশের পতন।
বিশকোটি ছেলে যে মায়ের ঘরে
তার এ দুর্দ্দশা দেখিস কেমন করে?
কামার কুমার তাঁতি অন্নাভাবে মরে,
মড়ার মতন আছিস ঘুমে অচেতন।

—দাস, চন্দ্রনাথ

হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-৪৮, পৃঃ ১৫৭-৫৮

১২৯।

পণ করে সব লাগ রে কাজে,
খাটবো মোরা দিন কি রাত।
(এই) বাংলা যখন পরের হাতে,
কিসের মান আর কিসের জাত॥
মারোয়াড়ী দিল্লীওয়ালা
উড়ে পার্শী ভাটিয়ারা,

তারা মোটর হাঁকে, চৌতালায় থাকে,
আমাদের নাই পেটে ভাত ॥
যেদিকে চাই বাংলাদেশের,
(আজ) সকল দিকই করছে গ্রাস,
তোরাই শুধু কেরানীর দল,
এক ঘোড়ের চালেই হলি মাত ॥
এমন করে পরের হাতে*
বিকিয়ে দিলি সোনার দেশ।
ধিক্ বাঙ্গালী নীরব রইলি,
থাকতে কোটী কোটী হাত ॥*

—দাস, মুকুন্দ

চারণকবি মুকুন্দদাস, সম্পাদক জয়গুরু গোস্বামী, গা-১৫, পৃঃ ২১৭
*পাঠান্তর আছে

১৩০। বাউলের সুর

ছেড়ে দেও কাঁচের চুড়ী বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর প'রো না।
জাগ গো ও জননী ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেকো না ॥
কাঁচের মায়াতে ভুলে শঙ্খ ফেলে,
কলঙ্ক হাতে প'রো না।
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী ধর্মসাক্ষী,
জগৎ ভ'রে আছে জানা।
চটক্‌দার কাঁচের বালা ফুকের মালা,
তোমাদের অঙ্গে শোভে না ॥
বলিতে লজ্জা করে প্রাণ বিদরে,
কোটী টাকার কম হবে না।
পুঁতি কাঁচ ঝুঁটো মুক্তায় এই বাংলায়,
নেয় বিদেশী কেউ জানে না ॥

ঐ শোন্ বঙ্গমাতা শুধান কথা,
জাগ আমার যত কন্যা।
তোরা সব করিলে পণ মায়ের এ ধন,
বিদেশে উড়ে যাবে না॥
আমি অভাগিনী কাঙ্গালিনী,
দু'বেলা অন্ন জোটে না।
কি ছিলেম, কি হইলেম, কোথায় এলেম,
মা যে তোরা চিনলি না॥*

—দাস, মুকুন্দ

চারণকবি মুকুন্দদাস, সম্পাদক জয়গুরু গোস্বামী, গী-৫২, পৃঃ ২৪৯
মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, 'ধর্মক্ষেত্র', পৃঃ ৪৬
চারণকবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী, সম্পাদক কালীপদ দাস, গী-৫৯, পৃঃ ৪৬-৪৭
স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, সৌমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৩১৯
* গানটি মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর নামে সংগৃহীত।
* মুক্তি-সংগ্রাম, রবীন্দ্রকুমার বসুও গানটি মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর বলে উল্লেখ করেছেন। (পৃঃ ৬৮-৬৯)

১৩১।

কি আনন্দধ্বনি উঠল বঙ্গভূমে।
বঙ্গভূমে বঙ্গভূমে বঙ্গভূমে ভারতভূমে।
জেগেছে আজ ভারতবাসী আর কি মানা শোনে;
লেগেছে আপন কাজে যার যা নিচ্ছে মনে।
মায়ের কৃপায় পেলেম ফিরে চরকা হেন ধনে—
তাই রেখেছি আমি অতি সযতনে আমার চরকা-ধনে।
চরকা আমার মাতা-পিতা, চরকা বন্ধু সখা;
চরকায় ভাত কাপড় পরি জোড়ায় জোড়ায় শাঁখা।
মুকুন্দ দাসে বলে ভাল সুযোগ পেলে,
তোমরা সবে ধর চরকা হবে সুখ কপালে।

—দাস, মুকুন্দ

চারণকবি মুকুন্দদাস, সম্পাদক জয়গুরু গোস্বামী, গা-৩৮, পৃঃ ২৩৭

১৩২।

আমি দশহাজার প্রাণ যদি পেতাম
তবে ফিরিঙ্গী বণিকের গৌরব-রবি—
অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম।
শোন সব ভাই স্বদেশী,
হিন্দু মোছলেম্ ভারতবাসী।
পারি কিনা ধরতে অসি,
জগতকে তা দেখাইতাম॥
কথা শুনে প্রাণ যদি মজে,
সেজে আয় বীরসাজে।
দাস মুকুন্দ আছে সেজে,
দাঁড়ি পেলে তরী ভাসাইতাম॥

—দাস, মুকুন্দ

চারণকবি মুকুন্দদাস, সম্পাদক জয়গুরু গোস্বামী, গা-৬৫, পৃঃ ২৬১
চারণকবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী, সম্পাদক কালীপদ দাস, গা-৭৩, পৃঃ ৫৮-৫৯

১৩৩।

জাগ গো জাগ জননী

তুই না জাগিলে শ্যামা, কেউ জাগিবে না গো মা,
তুই না নাচালে কারো, নাচিবে না ধমনী॥
ডেকে ডেকে হনু সারা কেউ সাড়া দিলে না মা,
খুঁজে দেখলাম কত প্রাণ, কারো প্রাণ কাঁদে না মা।
তুই না জাগালে প্রাণ, কাঁদিবে কি কারো প্রাণ—
না জাগিলে সবার প্রাণ, পোহাবে কি রজনী॥
নাম ধর দয়াময়ী, দয়া কি মা আছে তোর,
দয়া থাকলে মরে কি আজ কোটী কোটী ছেলে তোর।
মরি তাতে ক্ষতি নাই, বাসনা মা দেখে যাই,
ভারতের ভাগ্যাকাশে উঠেছে দিনমণি॥

নিবেদিলাম তব পায়, ঠেল না পায় তারিণী ;
ছেলের কথা চিরদিন রাখে জানি জননী।
মুকুন্দের কথা রাখ, করুণা নয়নে দেখ,
অকূলে পড়েছি মোরা, তার দীন তারিণী ॥

—দাস, মুকুন্দ

চারণকবি মুকুন্দদাস, সম্পাদক জয়গুরু গোস্বামী, গা-২৯, পৃঃ ২৩০

১৩৪।

ফুলার—আর কি দেখাও ভয় ?
দেহ তোমার অধীন বটে !
মন তো তোমার নয়।
হাত বাঁধিবে পা বাঁধিবে,
ধরে না হয় জেলেই দিবে—
মন কি ফিরাতে পারবে,
সে তো পূর্ণ স্বাধীন রয় ॥
বন্দেমাতরম্ মন্ত্র কানে,
বর্ম এঁটে দেহে মনে।
রোধিতে কি পারবে রণে—
তুমি কত শক্তিময় ॥

—দাস, মুকুন্দ

চারণকবি মুকুন্দদাস, সম্পাদক জয়গুরু গোস্বামী, গা-৬৫, পৃঃ ২৬২
চারণকবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী, সম্পাদক কালীপদ দাস, গা-১৪, পৃঃ ৫৯

১৩৫।

ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে,
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে ॥
তাথৈ তাথৈ থৈ দ্রিমী দ্রিমী দং দং,
ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে।
দানব-দলনী হয়ে উন্মাদিনী,
আর কি দানব থাকিবে বঙ্গে ॥

সাজ রে সন্তান হিন্দু মুসলমান,
থাকে থাকিবে প্রাণ না হয় যাইবে প্রাণ।
লইয়ে কৃপাণ হও রে আগুয়ান,
নিতে হয় মুকুন্দে-রে নিও রে সঙ্গে॥

—দাস, মুকুন্দ

চারণকবি মুকুন্দদাস, সম্পাদক জয়গুরু গোস্বামী, পৃঃ ২০৫

১৩৬। টোরি-ঝুলন

বাবু বুঝবে কি আর ম'লে!
কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে, একদম দফা সার্‌লে॥
খেতে ভাত সোনার থালে,
নাউ সেটিস্‌ফাইড্‌ ষ্টীলের থালে,
তোদের মত মূর্খ কি আর, দ্বিতীয়টি মেলে!
পমেটম্‌ লাইক করিলি, দেশী আতর ফেলে—
সাধে কি তোদের দেয় রে গালি,
ব্রুট্‌ ননসেন্স ফুলিশ বলে॥
ছিল ধান গোলা ভরা, শ্বেত ইঁদুরে করল সারা,
চোখের ঐ চশমা জোড়া, দেখ্‌ না তোরা খুলে।
কুল নিয়েছে, মান নিয়েছে, ধন নিতেছে কলে,
ডু ইউ নো, বাঙ্গালী বাবু—
ইওর হেড্‌ ফিরিঙ্গীর বুটের তলে॥
মুকুন্দের কথা ধর, এখনো সামলে চল,
সাহেবি চালটি ছাড়, যদি সুখ চাও কপালে।
বন্দেমাতরম্‌ বাজাও ডঙ্কা, জাগুক ভাই সকলে,
দেখে মুকুন্দ ডুবে যাক আজ, প্রেমময়ীর প্রেম সলিলে।

—দাস, মুকুন্দ

চারণকবি মুকুন্দদাস, সম্পাদক জয়গুরু গোস্বামী, গী-২৫, পৃঃ ২২৭
চারণকবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী, সম্পাদক কালীপদ দাস, গী-২৭, পৃঃ ২১-২২
স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, সৌমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গী-২৮, পৃঃ ৩২৪-২৫

১৩৭।

মা মা বলে ডাক্ দেখি ভাই,
ডাক্ দেখি ভাই সবে রে।
মা মা বলে কাঁদলে ছেলে,
মা কি পারে রইতে রে॥
জাগিবে জননী কুলকুণ্ডলিনী,
জাগিবে শক্তি জাগিবে রে।
খুলে যাবে প্রাণ দিতে পারবি প্রাণ,
স্বদেশ কল্যাণ তরে রে॥
মায়েব শ্রীচরণ তরী ভরসা করি,
ভাসাও দেহ তরী রে।
মা হবে কাণ্ডাবী সুখে যাবে তরী,
ভয় কি অকূল পাথারে॥
দেখ্ ভারতবাসী ঐ এলোকেশী,
মায়ের হাতে অসি কেঁপেছে রে।
এ মুকুন্দ কয় আর কারে ভয়,
জয় জয় ডঙ্কা বাজা রে॥

—দাস, মুকুন্দ

চারণকবি মুকুন্দদাস, সম্পাদক জয়গুরু গোস্বামী, গা-৫৬, পৃঃ ২৫২-৫৩

১৩৮। খাম্বাজ—কাহার্‌বা

রাম রহিম না জুদা কর ভাই,
মনটা খাঁটী রাখ জী।
দেশের কথা ভাব ভাই রে,
দেশ আমাদের মাতাজী॥
হিন্দু মুসলমান এক মায়ের ছেলে,
তফাৎ কেন কর জী;
দু' ভাইয়েতে দু' ঘর বেঁধে,
করি একই দেশে বসতি॥*১

টাকায় ছিল আট মণ চাউল ভাই,
এখন বিকায় পোয়া পশারি।
এর পরেতে হতে হবে,
গাছের তলায় বসতি ॥*২

—দাস, মুকুন্দ

পাঠান্তর *১ কাপড়, জুতা, চিনি, ছুরী, কাঁচি বিলাতী।
(মোদের) ভাইরা সকল পায় না খেতে, জোলা, কামার আর তাঁতী।

পাঠান্তর *২ দেশের দিকে চাও ফিরে, (ভাই) দেশ লুটিছে বিদেশী।
মোদের টাকা নিয়ে দেয় রে চাবুক, চাপড়, কীল, ঘুঁসি।

চারণকবি মুকুন্দদাস, সম্পাদক জয়গুরু গোস্বামী, গা-৫০, পৃঃ ২৪৭
মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী বসুমতী সাহিত্যমন্দির, 'কর্ম্মক্ষেত্র', পৃঃ ২৬
চারণকবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী, সম্পাদক কালীপদ দাস, গা-৫৬, পৃঃ ৪৪
স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, সৌমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গা-৩২, পৃঃ ৩২৭
গানটি ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতি রচিত বলে উল্লিখিত।
হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-৫০, পৃঃ ১৫৯-৬০

১৩৯

বন্দেমাতরম্ বলে নাচ রে সকলে,
কৃপাণ লইয়া হাতে।
দেখুক বিদেশী হাসুক অট্টহাসি,
কাঁপুক মেদিনী ভীম পদাঘাতে ॥
বাজাও দামামা কাড়া ঘণ্টা ঢোল,
শঙ্খ করতাল জয়ডঙ্কা খোল ;
নাচুক ধমনি শুনিয়ে সে রোল,
হউক নূতন খেলা শুরু এ ভারতে ॥
এখনো কি তোদের আছে ঘুমঘোর,
গেছে কুল মান, মোছ্ আঁখি লোর।
হও আগুয়ান ভয় কি রে তোর—
বিজয় পতাকা তুলে নিয়ে হাতে ॥

কবে যে ভারতে আসিবে সেদিন
ভেবে তা মুকুন্দ দিন দিন ক্ষীণ।
আজ কাল বলে কেটে গেল দিন,
দিন পেলে লীন হতেম চরণেতে ॥

—দাস, মুকুন্দ

চারণকবি মুকুন্দদাস, সম্পাদক জয়গুরু গোস্বামী, গী-৩১, পৃঃ ২৩১-৩২
চারণকবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী, সম্পাদক কালীপদ দাস, গী-৩৪, পৃঃ ২৬-২৭

১৪০।

মায়ের নাম নিয়ে ভাসান তরী—
যেদিন ডুবে যাবে রে, যেদিন ডুবে যাবে রে।
সেদিন রবি চন্দ্র ধ্রুবতারা,
তারাও ডুবে যাবে রে, তারাও ডুবে যাবে রে ॥
নবভাবের নবীন তরী মাকেই করেছি কাণ্ডারী।
হউক না কেন তুফান ভারী,
আর কি তরী ডুবে রে, আর কি তরী ডুবে রে ॥
বহুদিন পরে আবার মরা গাঙে পেয়ে জোয়ার,
জোয়ারে ধরেছি পাড়ি—
আর কি তরী ঠেকে রে, আর কি তরী ঠেকে রে ॥
মুকুন্দ দাসে ভণে উজানেও ভয় করিনে,
মায়ের নামের বাদাম টেনে,
উজান ধরে যাব রে, উজান ধরে যাব রে ॥

—দাস, মুকুন্দ

১৪১।

অতীত গিয়াছে অতীতে মিলায়ে,
সম্মুখে মহা ভবিষ্যৎ।
আলোকে পুলকে জ্ঞানে পুণ্যে ;
দৃপ্ত যেন সে ত্রিদিববৎ ॥

শাসন যাহার অস্ত্রে নহে,
প্রেমই কেবলমাত্র।
গড়িয়া উঠিবে নূতন তন্ত্র যাহার শাসন আত্মদান,
দেখাইবে মহা মুক্তিপথ।
ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, লভিয়া নূতন প্রাণ,
সমান সূত্রে হইবে মিলিত, হিন্দু মুসলমান।
কামনা হবে মূর্তিমতী আশা হবে ফলবতী,
গিয়াছে সেদিন আসিছে সুদিন
কর সবে তারে দণ্ডবৎ।

—দাস, মুকুন্দ

চারণকবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী, সম্পাদক কালীপদ দাস, গী-২৬, পৃঃ ২০-২১
মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, 'ব্রহ্মচারিণী', পৃঃ ৩১

১৪২।

স্বরাজ সেদিন মিলিবে যেদিন,
চাষার লাগিয়া কাঁদিবে প্রাণ।
তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে,
সপ্তমে তোরা তুলিবি তান।
দেবতার আশিস বর্ষিবে সেদিন,
অজস্র ধারায় মাথার উপর,
আসিবে নামিয়া নূতন শকতি
নব বলে সবে হবি বলীয়ান—
শক্তিতে হবি শক্তিমান॥
কোটি কোটি মিলিত কণ্ঠে;
তখন উঠিবে গান,
যে গানে আবার হইবে মিলিত,
হিন্দু মুসলমান।
মা-মা বলিয়া উঠিবে ফুকারি,
ভারতের নরনারী—

হোমানল জ্বালি বসিবে যজ্ঞে
পূর্ণাহুতি করিবে দান ;
সাধনায় সিদ্ধি স্বরাজ তোদের,
তখনি হইবে মূর্তিমান।

—দাস, মুকুন্দ

চারণকবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী, সম্পাদক কালীপদ দাস গী-১০, পৃঃ ৭

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত—চারণকবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী, গী-১৭, পৃঃ ৯-১৩

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—মুকুন্দদাসের গীতাবলী, গী-১৫, পৃঃ ৯০

মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, 'ধর্মক্ষেত্র', পৃঃ ৫০

১৪৩।

জয়তু গান্ধীজী

জয়তু গান্ধীজী প্রণাম গান্ধী মহারাজে।
ওই শোনো বন্দন বাজে
বন্ধন-মুক্তির আনন্দ-উল্লাস-মাঝে
জয়তু গান্ধীজী প্রণাম গান্ধী মহারাজে ॥
দুর্বল দুস্থের অন্তরে সন্তরে আশা
নির্বাক মূঢ় মূক মুখে ফোটে জীবনের ভাষা
জাগে প্রাণস্পন্দন এ মৃতসমাজে ॥
যে এনেছে মন্থিয়া দুস্তর হিংসার সাগরে
মাভৈঃ মন্ত্র হেথা সকলে শরণ তাঁর মাগো রে ;
কর সম্বল সবে নির্ভয় অহিংসা-মন্ত্র
নিস্ফল হবে ত্বরা কূট দুঃশাসন-তন্ত্র
বিভেদ-দ্বন্দ্ব মুখ লুকাইবে লাজে ॥

—দাস, সজনীকান্ত

ভারতের স্বদেশী গান, গা-১৯, পৃঃ ২৩

১৪৪।

আমরা চাই না তব শিক্ষা—
মোরা পেয়েছি নব দীক্ষা।
(এই নবীন যুগের নবীন মন্ত্রে)
(এই 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে)
(যা'র বর্ণে বর্ণে তড়িৎ ছুটে)
ঘুম-পাড়ানো এই মন্ত্র, ভাব-তাড়ানো এই তন্ত্র,
বল-ভাংগানো এই মন্ত্র—
(আমরা চাইনা চাইনা হে), এ যে শিক্ষা নয় শুধু ভিক্ষা।
(আমরা) শিখিব আপন শাস্ত্র, পরিব নিজেরি বস্ত্র,
ধরিব আত্ম-অস্ত্র—করিতে আপন রক্ষা।

—দাস, সুন্দরীমোহন

মুক্তির গান, সম্পাদক সতীশচন্দ্র সামন্ত, গা-৮৩, পৃঃ ৯৬
জাতীয় সঙ্গীত, প্রকাশক বিজয়কুমার চক্রবর্তী, পৃঃ ৫০
বন্দনা, সম্পাদক নলিনীরঞ্জন সরকার, পৃঃ ৬৫

১৪৫।

আমরা সবাই মায়ের ছেলে, মাকে পেলে কাকে ডরাই ?
আকাশেতে মনের সাধে মায়ের নামে নিশান উড়াই।
বঙ্গভূমি আমাদের মা, জগতে তাঁর নাই তুলনা,
লোকে করে ধনের গর্ব, আমরা করি মায়ের বড়াই।
মায়ের শস্যে জীবন ধরি, মায়ের জলে তৃষ্ণা হরি,
মায়ের নামে মায়ের প্রেমে মায়ের কোলে নেচে বেড়াই।
মায়ের কোলে যবে থাকি, কিছুতে ভয় নাহি রাখি
মা মা বলে অবহেলে, বিপদবাধা সকল এড়াই।
মা আমাদের অগ্নিময়ী, মায়ের নামে বিশ্বজয়ী,
আমরা সবে মিলেমিশে দেশে দেশে আগুন ছড়াই।

—দাশগুপ্ত, রামচন্দ্র

হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-৪২, পৃঃ ১৫০

১৪৬। প্রসাদী সুর—একতালা

নিক্ না মোদের জেলে ধরে।
বিনে অপরাধে অবিচারে ॥
মাতৃমন্ত্রে নিয়ে দীক্ষা, পেয়েছি যে নূতন শিক্ষা,
মা'র চরণ পেয়ে ভিক্ষা, ঘরের ছেলে ফির্‌ব ঘরে।
ভারতের জয় বলে মুখে, জেল খাটুনী খাটব সুখে ;
মা'র মূরতি রেখে বুকে, কাজ করিব হাতের জোরে ॥
জীবে জীবে ভগবান, সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান,
ওরে, মা মোদের সর্ব্বপ্রধান, বল্‌ব ইহা যারে তারে ॥
মার জিনিস পরে নেবে, কোন্ ছেলে সহিতে পারে ?
ছোট হয়ে আছি মোরা, সে দুঃখ আর বল্‌ব কারে।
সচেতন হও ভাই সকল, বলে পথিক সকাতরে,
ওরে, সুখ-দুঃখ সমান করি ঝাঁপ দিও কর্ম্মসাগরে।

—দেবী, সরোজিনী

জাতীয় সঙ্গীত, সরোজিনী দেবী, গা-১০, পৃঃ ৯-১০

১৪৭। বেহাগ—একতালা

কি ভাবিছ সব, ভারত গৌরব,
মহাত্মাকে আজি জেলে নিল ধরে।
স্বদেশী সমাজে, যে আলোক রাজে,
নিভিবে কি তাহা একই ফুৎকারে ?
দেশের যদি হও প্রকৃত সন্তান,
এমন কালে কেহ হারাইও না জ্ঞান,
এক মনে কর মাতৃপদ ধ্যান,
ভুলিও না কেহ বিদেশী আদরে।
মহাত্মার জন্য ভয় নাহি গণি,
ভারতের ধর্ম্ম স্থাপিতে অবনী,
ভগবান গান্ধি অবতার তিনি,
এসেছেন এই ভারত উদ্ধারে।

*

এক ভাবে কভু যায় না চিরদিন,
যতদিন আছে এক দুই তিন,
সময়েতে সব হয়ে যাবে ক্ষীণ,
এই দুঃখ নহে চিরদিন তরে।
একনিষ্ঠা হয়ে ব্রতপালন কর,
মাতৃ আশীর্বাদ শিরোপরে ধর,
তাহাতে সুফল ফলিবে সত্বর,
ভারতের আশা-তরুর উপরে।

—দেবী, সরোজিনী

জাতীয় সঙ্গীত, সরোজিনী দেবী, গা-২০, পৃঃ ১৭-১৮

১৪৮। বেহাগ—একতালা

ও চরণ বন্দি প্রণমি হে গান্ধি।
মহাত্মার উদ্দেশে করি নমস্কার।
ভারতের পতন, উত্থান কারণ,
গান্ধিরূপে হলে দেব অবতার।
মহাত্মার ইঙ্গিতে অগ্রসর কাজ,
সমগ্র ভারত জাগিল রে আজ,
ভবিষ্যৎ আশা লভিতে স্বরাজ,
গান্ধির আদর্শে কর গো আচার।
মনে কর সবে পাঞ্জাব কাহিনী,
যেরূপে বধিল না রইল এক প্রাণী,
সেই শোকে কাঁদে আজিও জননী,
মনে কর তাদের দস্যু ব্যবহার।
যাহারা হত্যা করিল পাঞ্জাবে,
তাদের দরুণ আর কভু ভাল হবে?
না হলে এ জ্ঞান অচিরে ডুবিবে,
ভারতের আর না হবে সুসার।

বিদেশীর মায়ায় যেও না ভুলিয়ে,
মায়ের ছেলে এস ঘরেতে চলিয়ে,
বন্দেমাতরম্ মুখেতে বলিয়ে,
মহাত্মার কাছে এস একবার।

—দেবী, সরোজিনী

জাতীয় সঙ্গীত, সরোজিনী দেবী, গা-১৪, পৃঃ ১২-১৩

১৪৯।

মা তোমারি তরে এসেছি এ ঘরে
পতিত সন্তান রাখ চরণে
আমরা দুর্বল বিদেশী প্রবল
আশীষে সবল কর এ সন্তানে।
এ হৃদয়বীণা ধরিবে মা তান,
গাহিবে তোমারি জয়গুণগান,
ভারতবর্ষে যত হিন্দু-মুসলমান,
মাতিয়া উঠিবে সে গভীর তানে।
আমরা অক্ষম কলঙ্ক মলিন
জেগেছে জাপান, জাগিয়াছে চীন,
নিজদোষে আছি হয়ে দীনহীন,
অবশ অলস না দেখি নয়নে।
অ্যামেরিকা আদি আর অষ্ট্রেলিয়া,
আরো কত দেশ উঠিল জাগিয়া,
আমরাই শুধু অলসে ঘুমিয়া,
সুখের শয্যায় এখনো শয়নে।
ভারতজননী মাতা গরীয়সী
পরের অধীনে কাঁদিছেন বসি
মায়ে প্রবোধিয়ে ধর ত্যাগ অসি
মাতৃ-আশীর্বাদ ধার্য করি মনে।

—দেবী, সরোজিনী

হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-২১, পৃঃ ১৩১

১৫০।

(১)

বন্দেমাতরম্ ব'লে আয়রে ভাই দলে দলে।
হইরে আগুয়ান, যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
মায়ের কাজে আত্মদান করব সবাই কুতূহলে।

(২)

বল ভাই বন্দেমাতরম্।
সাত সমুদ্রের ঢেউ তুফানে খেলুক গানের রং।
অস্ত্র নাইক হাতে, (মোদের) ভাবনা কিরে তাতে!
ভক্তি মহাশক্তি ও ভাই অজেয় ভূতলে।
আয়রে ভাই আয়রে চলে, বন্দেমাতরম্ বলে।

(৩)

আমরা রক্ত বীজের ঝাড,
মরণ মাঝেই গোপন মোদের সঞ্জীবনী বাড়।
চাইনা রক্তপাত (আমরা) কোর্ব্বনা আঘাত,
ব্যর্থ করব অরির অস্ত্র ধর্ম্ম কৃপা বলে।
আয়রে ভাই দলে দলে, বন্দেমাতরম্ বলে।

—দেবী, স্বর্ণকুমারী

গীতিগুচ্ছ, স্বর্ণকুমারী দেবী, গা-৩, পৃঃ ৩

১৫১।

লক্ষ ভায়ের দাঁড়ের টানে ভাস্‌লো রণতরী,
ভাবনা কি আর হবই ত পার, তুফানে কি ডরি!
পরেছি বীর-বর্ম্ম সাজ, মাতৃভূমির ঘুচাব লাজ,
হঠ্‌ব না ভাই হঠ্‌ব না আজ, বাঁচি কিম্বা মরি!
(কোরাস্) জয় জয় জয় জয় বল বল হো,
দিগ্‌সীমান্তে চল চল হো,
গাও জয় রণজয় গগন ভরি,
আমরা তুফানে কি ডরি।

ছিলাম একা, আজ্‌কে কোটি, কাঁদব না আর ধূলায় লুটি,
শপথ নেছি সবে জুটি, মায়ের চরণ ধরি।
শাণিত কৃপাণ দর্পে খুলে, মাভৈঃ বলে দিব তুলে,
অন্যায়েরি বক্ষমূলে, মৃত্যু বরণ করি।

(কোরাস্) জয় জয় জয় জয় ⋯ ⋯ কি ডরি।

তপ্ত রক্ত শিরায় জাগে,—নাম্‌রে কূলে চল্‌রে আগে,
দাঁড়াই গিয়ে পুরোভাগে,—অরির প্রতাপ হরি।
ধন্য হোক তুচ্ছ জীবন ; ধন্য মানি স্তন্যগ্রহণ,
জয় সমুদ্রে পার হব ভাই—ধর্ম্মরাজে স্মরি।

(কোরাস্) জয় জয় জয় জয় ⋯ ⋯ কি ডরি।

—দেবী, স্বর্ণকুমারী

গীতিগুচ্ছ, স্বর্ণকুমারী দেবী, গা-১৪, পৃঃ ২৭

১৫২। সুখরাই কানেড়া—ঝাঁপতাল

শতকণ্ঠে কর গান জননীর পূত নাম,
মায়ের রাখিব মান—লয়েছি এ মহাব্রত।
আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা,
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত।
সাক্ষী তুমি মহাশূন্য, না লব বিদেশী পণ্য,
ঘুচাব মায়ের দৈন্য, করিলাম এ শপথ।
পরি ছিন্ন দেশী সাজ, মানি ধন্য ধন্য আজ,
মায়ের দীনতা লাজ হবে দূর-পরাহত।
এই আমাদের ধর্ম, এই জীবনের কর্ম,
এই অস্ত্র, এই বর্ম* আমাদের মুক্তি-পথ।
নমোনম বঙ্গভূমি, মোদের জননী তুমি,
তোমার চরণে নমি নরনারী মোরা যত।

—দেবী, স্বর্ণকুমারী

স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, সৌমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিশিষ্ট, গা-২৩, পৃঃ ৩২১-২২
ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, সম্পাদক বন্দ্যোঃ এবং মুখোঃ, পৃঃ ৩৩৪
* পাঠান্তর এই বস্ত্র, এই ধর্ম।
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৭ * পাঠান্তর এই মন্ত্র, এই ধর্ম।

১৫৩। ইমনকল্যাণ, তেওরা

আজ এস সবে গীতরবে বন্দি ভারতে।
মায়ের চরণ বিনা শরণ কোথায় মরতে।
দেশ বিদেশে যেথায় থাকি,
দেশের মাকে মনে রাখি।
দেশের ভাই সব চলব নাকি মিলি একপথে? *
দেশপ্রেমের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়ে কল্যাণ রথে॥
এই দেশের কোলে জন্মেছি যে, এই দেহপ্রাণ
মায়ের তরে অকাতরে করব নাকি দান?
আবার মোরা মানুষ হলে
দেশের ছেলে ঐক্যবলে
বিপদ বাঁধা যাব দ'লে কি ভয় কার হতে?
তখন মায়ের নামে মানের আসন পাব জগতে॥

—দেবী চৌধুরানী, ইন্দিরা

'সুরঙ্গমা', ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, বিশেষ সংখ্যা, 'জাতীয় সঙ্গীত', গা-৬, পৃঃ ১৮-১৯

১৫৪।

মোরা আশ্রম দুহিতা,
মোরা দেশের দুহিতা।
মোরা সবাই যে বোন সবাই মায়ের সেবায় নিবেদিতা॥
হেথা রক্ষা করেন ধর্ম, হেথা পুণ্য মোদের কর্ম,
হেথা শিক্ষা মোদের লক্ষ্য, হেথা কর্ম মোদের নিত্য॥
হেথা গৃহহীনার মিলে গেহ, মাতৃহীনার মেলে স্নেহ;
শক্তিহীনা নয় কেহ, সবে সুস্থ সুরচিতা।
যবে বাহিরিব কাজে মাকে লজ্জা দিব না যে,
হৃদে সদা যেন বাজে মোদের আশ্রমের এই গীতা।

—দেবী চৌধুরানী, ইন্দিরা

'সুরঙ্গমা', ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, বিশেষ সংখ্যা, গা-৮, পৃঃ ২৩

১৫৫। পিলু

স্বাগত ! স্বাগত ! স্বাগত !
পূর্ব্ব, পশ্চিম, দখিণ, উত্তরাগত—
লোক সেবক, দেশ ভকত,
বিদূষী বিদ্বৎগণ স্বাগত !
বঙ্গ অঙ্গন হল উজ্জল শোভন,
বঙ্গাঙ্গনা আজি অতি নন্দিত চিত,
করপল্লবে আনে অর্ঘ্য চন্দন,
অগুরু, কুসুমমালা, ভকতি সিঞ্চিত
কহে সমস্বরে স্বাগত ! স্বাগত ! স্বাগত !

—দেবী চৌধুরানী, সরলা

গীতি-ত্রিংশতি, সরলা দেবী চৌধুরানী, গা-৫, পৃঃ ১২

১৫৬

রণরঙ্গিণী নাচে, নাচে রে, নাচে ! ঐ নাচে !
রুণ্ রুণ্ ঠুন্ ঠুন্ নাচে রে, নাচে রণ মাঝে !
ঝাঁঝর ঝম্ ঝম্ বাজে রে বাজে শুন বাজে !
ডম্ ডম্ ডমরু আওয়াজ রে বাজে, শুন বাজে !
(কোরাস্) গরজে তোপ কামান মাঝে
জগজ্জননী, সমর সাজে রে
নাচে, ঐ নাচে, আজি নাচে রণ মাঝে।

অভয়ার ডঙ্কা বাজে রে বাজে রণ মাঝে
রক্ত তপ্তকর হুঙ্কারে শঙ্খ নিনাদে জয়নাদে
পায়ে পায়ে তালে তালে চল্‌রে চল্ সবে চল্ আগে চল্ !
মারিতে মরিতে চল্, চল্‌রে ত্বরিতে দলে দল দলে দল !
(কোরাস্) গরজে তোপ কামান মাঝে ... ...

মাভৈঃ মাভৈঃ রবে চল ছুটে সবে আহবে আগে কে হবে !
বিজয় বা স্বরগের স্বাদ কেবা লবে আহবে আগে কে হবে !

আমি সে, আমি সে, আমি আমি আমি !
যেতে দে আগে হতে দে
রণরঙ্গে মার সঙ্গে হতে দে আগে যেতে দে ।
(কোরাস্) গরজে তোপ কামান মাঝে ··· ··· ···

—দেবী চৌধুরানী, সরলা

গীতি-ত্রিংশতি, সরলা দেবী চৌধুরানী, গা-৮, পৃঃ ২০

১৫৭ । বাউল

বালাই নিয়ে মরি তোদের আন্ ধরমের ভাই ।
বুকের আসন পেতে করি তোদের বসার ঠাঁই ।
আন্ ধরমের ভাইরে মোদের আন্ ধরমের ভাই ।
তোদের ঠেলে দূরে মোদের ধরম্ করম্ নাই
মোর ঠাকুরটি তোর তোষে তুষ্ট রোষে পুড়ে ছাই ।
আন্ ধরমের ভাইরে মোদের আন্ ধরমের ভাই ।
ডাকিস তাঁরে পৃথক নামে তাতেই ক'রে অভিমান
মান যদি না দিলাম তোরে তাঁরি হল অপমান
আন্ ধরমের ভাইরে মোদের আন্ ধরমের ভাই ।
আচার প্রথায় বলায় কওয়ায় কিছুটা নয় ভেদ
নাই বা হল একলা তাতে কেন তোদের খেদ ?
আন্ ধরমের ভাইরে মোদের আন্ ধরমের ভাই ।
জগৎখানা বিশাল হেন বিচিত্রতায় ভরা
অপরূপ সে কারিগরের আপন হাতে গড়া ।
আন্ ধরমের ভাইরে মোদের আন্ ধরমের ভাই ।

—দেবী চৌধুরানী, সরলা

গীতি-ত্রিংশতি, সরলা দেবী চৌধুরানী, গা-৯, পৃঃ ২৩

১৫৮। ইমনকল্যাণ

মন্ত্রস্তব্ধ জড় কণ্ঠরুদ্ধ
তেত্রিশ কোটী আজি হও প্রবুদ্ধ !
পুণ্যস্মৃতি সেই আর্য্যাবর্ত্ত
গ্রাসে গহন ভীম কাল আবর্ত্ত
বেদ ঘোষ ওঙ্কার ধ্বনিতে
বীরহস্ত টঙ্কার ধ্বনিতে
কর হে কর পুনঃ দশদিশি ক্ষুব্ধ।
তেজধাম সেই ভারতবর্ষ
নাশে মূঢ়তা বৃথা সংঘর্ষ
ক্ষত্রিয় বৈশ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্রে
ধনী নির্ধনে মিল বৃহতে ক্ষুদ্রে
মানবী প্রেমে উজ্জ্বল শুদ্ধ।
কারা ভূমি সেই হিন্দুস্থান
উপবাসে করে মৃত্যু প্রয়াণ
বহু মত শরণ বিশাল ক্রোড়
হত মান নিপতিত দাস্যে ঘোর
মুক্ত করহ ছাড় ভাই ভাই যুদ্ধ।

—দেবী চৌধুরানী, সরলা

গীতি-ত্রিংশতি, সরলা দেবী চৌধুরানী, গা-৩, পৃঃ ৭

১৫৯। খাম্বাজ—একতালা

বন্দি তোমায় ভারত-জননি, বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি
বর-পুত্রের তপ-অর্জিত গৌরব-মণি-মালিনী।
কোটি-সন্তান-আঁখি-তর্পণ-হৃদি-আনন্দ-কারিণি
মরি বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি!
যুগযুগান্ত তিমির-অন্তে হাস মা কমল-বরণি!
আশার আলোকে ফুল্ল হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী।
নবজীবনের পসরা বহিয়া

আসিছে কালের তরণী, হাস মা কমল-বরণি!
এসেছে বিদ্যা, আসিবে ঋদ্ধি
শৌর্যবীর্যশালিনি!
আবার তোমায় দেখিব জননি
সুখে দশদিক্‌-পালিনী।
অপমান-ক্ষত জুড়াইবি মাতঃ
খর্পর-করবালিনি! শৌর্যবীর্যশালিনি।

—দেবী চৌধুরানী, সরলা

শতগান, সম্পাদিকা সরলা দেবী চৌধুরানী, গা-৪১, পৃঃ ১১৭
ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, সম্পাদক বন্দ্যোঃ এবং মুখোঃ, পৃঃ ৩৭৪-৭৫
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ১১৩
বন্দেমাতরম্, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, পৃঃ ১১-১২
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৪৪
স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক নরেন্দ্রকুমার শীল, গা-৬৩
হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-৪২, পৃঃ ১৫১-৫২

১৬০। খাম্বাজ—একতালা

নমো নমো জগত-জননি
বিশ্ব-আর্ত্তি-হারিণি!
কল্যাণি! শিবানি!
দুর্গমত্রাণকারিণি!
ভারত-ব্যসন-তপ্ত হৃদয়ে
ম্লান কালীবরণি।
ঘোর-রূপ-ধারিণি।
যুগযুগান্ত তিমির অন্তে
হাস মা বিমলবরণি।
আশার আলোকে ফুল্লহৃদয়ে
আবার শোভিছে ধরণি।
নবজীবনের পসরা বহিয়া
আসিছে কালের তরণী।
হাস মা বিমল-বরণি।

এসেছে বিদ্যা আসিবে ঋদ্ধি
শৌর্য্যবীর্য্যশালিনি।
আবার জগতে দেখিব জননি
সুখে দশদিক্-পালিনি।
অপমান-ক্ষত জুড়াইবি মাতঃ
খর্পর-করবালিনি।
অসুরমুণ্ডমালিনী।

—দেবী চৌধুরানী, সরলা

শতগান, সম্পাদিকা সরলা দেবী, 'জাতীয় সঙ্গীত'।

১৬১। খাম্বাজ

জয় যুগ আলোকময়, জয় যুগ আলোকময়,
জয় যুগ আলোকময়।

(১) হল অন্যায়চ্যুত শাসন নিষ্ঠুরাচার নাশন
সংস্কার-দৃঢ়-আসন হল ক্ষয়, দিলে বরাভয় যুগ আলোকময়,

(কোরাস্) আজি তেজভরিত ভারতবক্ষ নির্ম্মল বোধ পুষ্টপক্ষ
মুক্তমানব লক্ষ লক্ষ গাহে জয়। জয় যুগ জয় যুগ
জয় যুগ আলোকময়!

(২) হল অন্ধ তমস ছেদন অযুত ভ্রান্তি ভেদন
আত্মার শত ক্লেদন অপনয়, দিলে বরাভয় যুগ আলোকময়!

(কোরাস্) আজি ... ... আলোকময়!

(৩) হল বুদ্ধির মোহ মোচন যুক্তির অতি রোচন
উন্মেলি শুভলোচন হে সদয়, দিলে বরাভয় যুগ আলোকময়!

(কোরাস্) আজি ... ... আলোকময়!

(৪) হল শক্তির পুনঃ বোধন পৌরুষ ঋণ শোধন
আর্ত্তের প্রাণ মোদন বীরোদয়, দিলে বরাভয় যুগ আলোকময়!

(কোরাস্) আজি ... ... আলোকময়!

—দেবী চৌধুরানী, সরলা

গীতি-ত্রিংশতি, সরলা দেবী চৌধুরানী, গা-৪, পৃঃ ৯

১৬২। খাম্বাজ

কোন্ রূপসাগরে ডুব দিলিরে বাঙ্গালী সেপাইরা !
তোদের দেখে চক্ষু জুড়ায় আমার মাণিক ভাইরা !
দেখেছি সুন্দর শিখ, মারাঠা, গোর্খা বীর,
এমন মোহন মুরতি যে নাই সে কোনটির।
বাঙ্গালী সেপাইরা ! আমার মাণিক ভাইরা !
আহা কোন্ জননীর কোলের ধনরে কাদের বুকের ভাতি,
সবার মাথা উচ্চ হল, তোরা পাতলি ছাতি
দেশের শত্রু নিপাত তরে যুদ্ধ তৃষায় মাতি !
বেতনকাঙাল ভাবখানি নয়, ত্যাগের বাঁকা ঠাম,
মৃত্যুঝাঁপা অমৃতলোক: কান্তি অভিরাম
পূর্ণ হ'ল তোদের দেখে জাতির মনস্কাম !
বাঙ্গালী সেপাইরা ! আমার মাণিক ভাইরা !
তোদের দেশের মানের মেরুদণ্ডে খাড়া সিধা পিঠ,
তার লজ্জা মোচন পণের ডোরে কষা মনের গিঁট ;
তারে মরণ ছেঁচা রতন দিয়ে পরাবি কিরীট !
ভারতলক্ষ্মীর আশীষভরা তোদের মুখের আলোক,
বঙ্গলক্ষ্মীর আশায় গড়া তোদের রূপের ঝলক !
দেখে দেখে সাধ না মেটে পড়তে না চায় পলক
বাঙ্গালী সেপাইরা ! আমার মাণিক ভাইরা !

—দেবী চৌধুরানী, সরলা

গীতি-ত্রিংশতি, সরলা দেবী চৌধুরানী, গা-৭, পৃঃ ১৬

১৬৩। মিশ্র খাম্বাজ—ফেরতা

অতীত-গৌরববাহিনী মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান।
মহাসভা-উন্মাদিনী মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান !
কর বিক্রম-বিভব-যশঃ-সৌরভ পূরিত সেই নামগান !
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান !

হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান।
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান!"
(কোরাস্) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান—"নমো হিন্দুস্থান!"
ভেদ-রিপুবিনাশিনি মম বাণি! গাহ আজি ঐক্যগান!
মহাবল-বিধায়িনি মম বাণি! গাহ আজি ঐক্যগান!
মিলাও দুঃখে, সৌখ্যে সখ্যে, লক্ষ্যে, কায় মনঃ প্রাণ!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ.
গুর্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান!
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান!"
সকল-জন-উৎসাহিনি মম বাণি! গাহ আজি নূতন তান!
মহাজাতি-সংগঠনি মম বাণি! গাহ আজি নূতন তান!
উঠাও কর্ম-নিশান! ধর্ম-বিষাণ! বাজাও চেতায়ে প্রাণ!
বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মান্দ্রাজ, মারাঠ,
গুর্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান!
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান!"
(কোরাস্) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান—"নমো হিন্দুস্থান!"

—দেবী চৌধুরানী, সরলা

শতগান, সম্পাদিকা সরলা দেবী চৌধুরানী, গা-৪০, পৃঃ ১১৩-১৪
ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, সম্পাদক বন্দ্যোঃ এবং মুখোঃ, পৃঃ ৩৭১-৭২
রবীন্দ্র-জীবনী, ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৫২৫
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ১১৩-১৪
বন্দেমাতরম্, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, পৃঃ ৪৬-৪৭
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৫০
হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-২৯, পৃঃ ১৪০-৪১

১৬৪। বাগেশ্বরী—জলদ তেতালা

আজি কিসের এদিন! করহ চিন্তন ভারতসন্ততিগণ
যেই সুবিখ্যাতস্থানে ভরত আদি ভূপগণে

আর্য্যজাতি যশঃখ্যাতি করিল স্থাপন
ভারতেরি ভাগ্যক্রমে আজি সেই পুণ্যভূমে
অধীশ্বরী ভিক্টোরিয়া হইছে ঘোষণ
জ্যোতিহীন আর্য্যজাতি নাহি সে অন্তরভাতি
অলীক আলোকে তাই পুলকিত মন
পিতৃগণ যে প্রদেশে ধায়িত বীরের বেশে
আজি তথা নটসাজে আর্য্যের নন্দন।
পূজি যথা সূর্য্যদেবে পূর্ব্ব-পূজ্য-আর্য্য সবে
যবন ম্লেচ্ছরে পদে করিল দলন
আজি আর্য্যসুত তথা প্রাণভয়ে হেট মাথা
দেবমালি পূজিতেছে ম্লেচ্ছেরি চরণ
এ দীন দৃশ্য মানসে ভাবিয়া দীন প্রকাশে
পুত্রহীন ভীমার্জ্জুন প্রকৃত বচন।

—ধর, দীননাথ

সঙ্গীতকোষ, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'ভারত সঙ্গীত', গা-৩১৭৪, পৃঃ ৯৮৮
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা ৮৫

১৬৫। বাগেশ্বরী—জলদ তেতালা

রে বিধি, কেন আমারে নানা রত্ন-অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছিলে?
এতেক সনুয় যদি না হতে তুমি রে বিধি
আসিতো না নির্য্যাতিতে নানা জাতি দস্যুদলে
ছিনু ডুবে সিন্ধুজলে আদরে দুকরে তুলে
হিমাদ্রি কোলেতে কেন আমারে স্থাপিলে
করিয়ে পরের দাসী পরের অন্ন প্রত্যাশি
তবে কেন ওরে বিধি আগে মান বাড়াইলে
আর্য্যকুল নারী আমি আর্য্যধর্ম্ম অনুগামী
যবন করেতে তুমি আমারে সমর্পিলে
বিস্তৃত এই সিন্ধুনীরে কেন না ডুবালে মোরে
ঘটিত না এই সব তা হ'লে এ দগ্ধ ভালে।

—ধর, দীননাথ

সঙ্গীতকোষ, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'ভারত সঙ্গীত', গা-৩১৮৫, পৃঃ ৯৯২
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৯২

১৬৬। মূলতান—একতালা

আর সহে না, সহে না, জননী, এ যাতনা আর সহে না ;
আর নিশিদিন হয়ে শক্তিহীন পড়ে থাকি, প্রাণ চাহে না।
তুমি মা অভয়া জননী যাহার, কি ভয় কি ভয় এ ভবে তাহার,
দানব-দলনী ত্রিদিব-পালিনী, করাল-কৃপাণী তুমি মা ;—
উর মা! আজিকে সে-রূপে পরানে, ডাকি মা কালিকে! ডাকি গো সঘনে,
নয়নে অশনি জাগাও জননী! নহিলে এ ভয় যাবে না।
উর মা বাহুতে, শকতিরূপিণী, উর মা হৃদয়ে ও রণরঙ্গিণী!
রিপুকুল মাঝে, সন্তান ল'য়ে দাঁড়া মা হৃদয়-রমা ;—
প্রলয়-হুঙ্কারে, হর-হৃদি হতে উঠিয়ে দাঁড়া মা এ ভারত মাঝে ;
শোণিত-তরঙ্গে, মাতি' রণরঙ্গে, মাভৈঃ বাণী আজ শোনা মা।
নৃমুণ্ডমালিনী, তুই মা কল্যাণী, তুই শিবে শিবমনোমোহিনী।
বিনা তোর কৃপা, বিনা তোর কৃপাণ, এ ভারত-বন্ধন ঘুচে না।

—পাল, বিপিনচন্দ্র

স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, সৌমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৩১৮
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৬৩-৬৪

১৬৭।

বাজায়োনা আর মোহন বাঁশী
আজি রুদ্ররূপে ভীমবেশে প্রকাশ' পরাণে আসি ॥
বন্ধ কর সব কুসুম গন্ধ,
রুদ্ধ কর মলয় মন্দ,
স্তব্ধ কর যত ললিত সুছন্দ, প্রকাশি অট্টহাসি।
জীবন-মায়া আজি কর হে ভিন্ন,
দয়া-বন্ধন কর হে ছিন্ন,
জাগাও সংহার জগত-পূর্ণ প্রলয়-পয়োধি-রাশি ॥
দলিত কর হে চরণতলে
সকল ভীরুতা সব দুর্ব্বলে,
ভীম অসি ধরে, শ্মশানে মশানে, ভীষণ সাজাও আসি ॥

—পাল, বিপিনচন্দ্র

মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৬৪
হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-১৪, পৃঃ ১২৪

১৬৮। বেহাগ-মিশ্র—একতালা

কে আছ মায়ের মুখ-পানে চেয়ে, এস কে কেঁদেছ নীরবে ;
মা'র মুখ চেয়ে আত্মবলি দিয়ে সে মুখ উজ্জ্বল করিবে ॥
নিজেরে ভাবিয়ে অক্ষম দুর্ব্বল, বাড়ায়েছ মায়ের যাতনা কেবল,
যার মাতৃকণ্ঠে বাজিছে শৃঙ্খল, দুর্ব্বল সবল সে কি ভাবিবে ?
জাননারে মূঢ় জননী তোমার পুরাকাল হ'তে কি শক্তি আধার,
সন্তানের কণ্ঠে শুনিলে হুঙ্কার, নয়নে বিজলি খেলিবে।
ক্ষুদ্র স্বার্থে মজি এখনও কি ভাই, মা হ'তে সুদূরে রবে ঠাঁই ঠাঁই।
হিন্দুমুসলমান এস সবে যাই, মা যে ঐ ডাকিছে সবে।
কে আছ আজিও পরপদসেবি, এস উঠে এস মার পুত্র সবই,
ধমনী ভিতরে এক রক্ত বহে, একই মাতৃ-নামে উন্মত্ত সবে।
কে আছ বিদেশী আদেশে গোপনে, আছ ভাই মাতৃ-সেবক সন্ধানে
চেয়ে দেখ আজ মা চাহে তোমায়, তাঁরে কি কাঁদায়ে ফিরিয়ে যাবে ?
কে আছে বিপদে না করি দৃক্‌পাত, মৃত্যু নির্য্যাতন দৈব বজ্রাঘাত,
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে মার মুখ চেয়ে এস কে মরিতে পারিবে ?
এস শীঘ্র এস বেলা বয়ে যায়, এনেছে জাপান উষা এশিয়ায়।
মধ্যাহ্ন গরিমা "স্বাধীন ভারত" আনিবে নিশ্চয় আনিবে।

—প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী

মাতৃমন্ত্র, প্রকাশক অমূল্যচন্দ্র অধিকারী, গা-৯, পৃঃ ৯-১০

অহং-একতালা

১৬৯। "ভারত সঙ্গীত"

"আর ঘুমাইওনা, দেখ চক্ষু মেলি,
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী,
বিবিধ মানব জাতিরে লয়ে।

মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।

হোথা আমেরিকা—নব অভ্যুদয়,—
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।

মধ্যস্থলে হেথা আজন্ম পূজিতা
চির-বীর্য্যবতী বীর-প্রসবিতা,
অনন্তযৌবনা য়ুনানী মণ্ডলী,
মহিমা-ছটাতে জগত উজলি,
সাগর ছেঁচিয়া, মরু গিরি দলি,
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়॥

আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়॥"

এই কথা বলি, মুখে শিঙ্গা তুলি
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী
গায়িতে লাগিল অনেক যুবা।

আয়ত-লোচন, উন্নত-ললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু, সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিল বিজলী,
বদনে ভাতিল অতুল আভা।

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
"বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারত-ভূমি যবনের দাস ?
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা !

আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা ?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধাঁ !

ধিক্ হিন্দুকুলে ! বীর-ধর্ম ভুলে,
আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,
সোনার ভারত করিতে ছার !

হীনবীর্য্য সম হ'য়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরী-পদধূলি,
হাদে দেখ ধায় মহাকুতূহলী
ভারত নিবাসী যত কুলাঙ্গার ॥

এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্তভূমে,
দিক্ অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গ-মত্ত পূর্ব্বপিতৃগণ
যখন তাঁহারা করেছিলা রণ,
করেছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাঁহারা কজন ছিল ?

আবার যখন জাহ্নবীর কূলে
এসেছিলা তারা জয়ডঙ্কা তুলে,
যমুনা, কাবেরী, নর্মদা-পুলিনে,
দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্য-বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে ;
তখন তাঁহারা কজন ছিল ?

এখন তোরা যে শত কোটি তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার ;

পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরী অবধি কুমারী হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়ে করিলে পণ।

তবে ভিন্ন-জাতি-শত্রুপদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে,
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস্ মন ?

অই দেখ্ সেই মাথার উপরে
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা ক'রে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন(ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখন(ও) উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখন(ও) ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।

কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন-সম
হিন্দু-বীরদর্প, বুদ্ধি, পরাক্রম ?
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধি সীমা ?

সকলি ত আছে, সে সাহস কই ?
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই ?
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই ?
কোথা রে আজি সে জাতি-মহিমা !

হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি !
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি,
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী !—
আর কি ভারত সজীব আছে ?

সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর-পদভরে মেদিনী দুলিত,

ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সে দিন ঘুচিয়া গেছে।"

এই কথা বলি, অশ্রুবিন্দু ফেলি,
ক্ষণমাত্র যুবা শৃঙ্গনাদ ভুলি,
পুনর্ব্বার শৃঙ্গ মুখে নিল তুলি,
গর্জ্জিয়া উঠিল গম্ভীর স্বরে—

"এখন(ও) জাগিয়া ওঠ রে সবে,
এখন(ও) সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবিকরসম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে॥

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।

জপ, তপ আর যোগ আরাধনা,
পূজা, হোম যাগ, প্রতিমা-অর্চ্চনা
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর কৃপাণে কর্ রে পূজা।

যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু, উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধ'রে,
স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হও।

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বীসহ সমকক্ষ হতে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।

ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ।

এখন সে দিন নাহি রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার
হবে না, হবে না,—খোল্ তরবার ;
এ সব দৈত্য নহে তেমন।

অস্ত্রপরাক্রমে হও বিশারদ,
রণ-রঙ্গ-রসে হও রে উন্মাদ,*—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ,
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।

কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান বুদ্ধি জ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও ?

অই দেখ সেই মাথার উপরে
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল ;

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন(ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখন(ও) উন্নত,
সেই জাহ্নবীবারি এখন(ও) ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল ?

বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক্ সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?"

—বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র

হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, 'কবিতাবলী', পৃঃ ১১৫-১২৯
সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৪-৫৭
ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতা সংকলন, সম্পাদক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩০৫-৩১০

* উন্মদ

১৭০।

ওঠ্‌রে ওঠ্‌রে ওঠ্‌রে তোরা
হিন্দু মুসলমান সকলে ভাই !
বাজিছে বিষাণ উড়িছে নিশান
আয়রে সকলে ছুটিয়া যাই।
দেখ্‌রে দেখ্‌রে যায় রসাতল,
জাতীয় উন্নতি বাঙ্গালীর বল,
রাজদ্বারে আর নাহি প্রতীকার
আপনার পায়ে দাঁড়ারে ভাই।
নগরে নগরে জ্বাল্‌রে আগুন
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ,
বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত
মায়ের দুর্দ্দশা ঘুচারে ভাই !
আপনি বিধাতা সেনাপতি আজ
হিন্দু মুসলমান সাজ্‌রে সাজ
স্বদেশী সংগ্রাম চাহে আত্মদান
বন্দেমাতরম্‌ গাওরে ভাই।

—বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র

জাতীয় সঙ্গীত, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ দাস, পৃঃ ১৪
স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক নরেন্দ্রকুমার শীল, গা-২৯
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ১১২। (গানটির কথা অনেকাংশে ভিন্ন)
হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-৪৫, পৃঃ ১৫৪

১৭১। বেহাগ

"জাতীয় সঙ্গীত"

গৃহে গৃহে তোমার হাসি জাগাও—
চিত্তে মনে তোমার বাঁশি বাজাও।
সবাই সবায় বাসুক ভালো
প্রেমের প্রদীপ হৃদে জ্বালো
স্বার্থ হিংসা দ্বন্দ্ব ও দ্বেষ ;
এ দেশ হ'তে ঘুচাও।

সবাই সবায় জানুক আপন ভাই
সবাই সবায় দিক্ হৃদয়ে ঠাঁই।
সবাই জানুক চিত্তে তোমায়
প্রণাম করুক তোমার ও পায়
ভালবাসুক তোমায় সবাই
তুমি স্বর্গ হেথা সাজাও ॥

—বড়াল, নির্মলচন্দ্র

'অর্চ্চনা'—(মাসিক পত্রিকা) ২২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২, পৃঃ ১২৪

১৭২। বাউলের সুর

ওরা জোর ক'রে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান।
আমরা রব অন্তরঙ্গ, এক অঙ্গে মনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণ
আমরা জাত বাঙ্গালী প্রেম-কাঙালী—
ভাবচিস্ তোরা মন ভাঙালি,
তা নয়, জ্বালিয়ে আগুন ক'রে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলি প্রাণের টান।
আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের কুঁড়েতে,
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়েতে,
আবার কর্কচেতে হয়েছে রুচি, চাই নে তোদের লবণ দান।
আমাদের ভাতের সঙ্গে তাঁত বজায় থাক্,
নাই বা দেখাই সাজের জাঁক,
তোদের, ওই চক্‌চকান মধুর চাকে কর্‌বো না আর বিষপান।
তোদের কাচের বাসন কাচের চুড়ি,
[ফেলবো ভেঙ্গে মেরে তুড়ি,]
ক'রে দেবতা সাক্ষী ঘরের লক্ষ্মী শাখার আবার রাখবে মান।
তোদের শাপে হ'ল আশীর্ব্বাদ
দৃঢ় হ'ল মনের বাঁধ,
এই, বিসংবাদে বঙ্গভেদে, আমরা হলুম আবার তেজীয়ান্।
পেয়ে মর্ম্মে আঘাত, কর্ম্মে হাত বাকি্য ছেড়ে দেবে বুদ্ধিমান্ ॥

—বসু, অমৃতলাল

সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫২
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৪১
স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক নরেন্দ্রকুমার শীল, গা-৫৮
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৫
হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-১১, পৃঃ ১২০-২১

১৭৩। লক্ষ্ণৌ-ঠুংরি

আয় লো স্মৃতি আয়, দয়া ক'রে আয়।
সেই পুরাণ সঙ্গীত শুনা লো আমায়।
যুগ যুগ হ'ল সে গান নীরব।
সে সুখ স্বপন ফুরাইল হায়॥
যখন পশ্চিমে যবন প্লাবন,
গ্রাসিল নগরী বন উপবন।
মনোল্লাসে মরি, আর্য্যকুলনারী
দেহ-তরী হেলায় ভাসাইল তায়
যবে রাজবারার সমর অনল,
ধূ ধূ করি চারি ভিতে জ্বলিল।
রাজপুত সতী রাখিতে কুলমান।
সোণার শরীর ঢালিল চিতায়।
কুলের মহিলা, কেশে বাঁধি ছিলা,
সম্মুখ সমরে ভৈরবী ছুটিলা।
পতির উদ্দেশে ভিখারিণী-বেশে,
দেশে দেশে ভ্রমি করিলা দেহক্ষয়।
তোমাদের দশা হেরে কেঁদে প্রাণ
তোমরা কি হায়! তাঁদের সন্তান।
উঠ উঠ বোন, ত্যজি মলিন বেশ।
পূবে সুখ-রবি ঐ দেখা যায়॥

—বসু, দীনেশচরণ

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৭১২
সঙ্গীতকোষ, 'ভারত সঙ্গীত', সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮৩
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৬৮

১৭৪। পূরবী—আড়া

এ সুখ সন্ধ্যায় আজি জাগরে নিদ্রিত মন।
আশার কুসুম তুলি গাঁথ মালা সুচিকণ।
ভারত উদ্যানে কত, ফুটি পুষ্প শত শত,
অকালে পড়িল খসি, স্মরিলে কাঁদে পরাণ।

নাহি সে বসন্ত আর, নাহি সে পিক-ঝঙ্কার।
নীরব বাল্মীকি-বীণা, নীরব কবি-কানন।
নাহি গাণ্ডীব টঙ্কার, নাহি সে বীর হুঙ্কার,
কাল-নিদ্রা কোলে আজি জীবকুল অচেতন ॥
ভারত-জননী, শোকে তাপে, বিষাদিনী,
তুমি কি মন এ সময়ে রবে ঘুমে অচেতন ॥

—বসু, দীনেশচরণ

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৭১২-১৩
সঙ্গীতকোষ, 'ভারত সঙ্গীত', সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৫৫, পৃঃ ৯৮০
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৬১

১৭৫। ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

বিমল জ্ঞানের স্নিগ্ধ বারি প্রাণ-ভরি,
পান কর লো সবে ; অজ্ঞানতার তিমির ঘোর,
মনের আঁধার দূরে যাবে।
ভাবিয়ে দেখ লো ভগিনীগণ,
যে দেশের ভালে শোভে রতন,
খনা লীলাবতী যার কিরণ,
কাল-সিন্ধু উজলিছে
তোমরা কি সেই ভারতভূমে,
ডুবি আঁধারে রহিবে ঘুমে,
পূরব-ভানু যায় পশ্চিমে,
এখনও কি উঠি বসিবে ?

-বসু, দীনেশচরণ

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৭১৩
সঙ্গীতকোষ, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৯৮১
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৬৪

১৭৬।

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা

দিনের দিন্ সবে দীন* হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ!

সে সাহস বীর্য নাহি আর্যভূমে, পূর্ব গর্ব সর্ব খর্ব হলো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে, লজ্জা-রাহু-মুখে লীন। ১

অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল, যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল, এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন! ২

তুঙ্গ দ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে, সারা শস্য গ্রাসে যত ছিল দেশে
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে, হায় গো রাজা কি কঠিন। ৩

তাঁতি, কর্মকার, করে হাহাকার, সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর, হ'লো দেশের কি দুর্দিন। ৪

আজ যদি এরাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ, কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ?
ধ'র্বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ—বাকল্, টেনা, ডোর, কপিন? ৫

ছুঁই সূতো পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে; দীয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে;
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে; কিছুতেই লোক্ নয় স্বাধীন। ৬

—বসু, মনোমোহন

মনোমোহন বসুব গীতাবলী।

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, সম্পাদক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮০

হিন্দুমেলাব ইতিবৃত্ত, যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃঃ ৭৯। গানটি 'হবিশ্চন্দ্র' নাটকে (১২৮১, পৌষ) সংযোজিত হয়।

বাঙ্গালীর গান, দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত, পৃঃ ৫৩৪ 'ভৈরবী—একতালা'।

সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৪র্থ খণ্ড, সংখ্যা ৫১, পৃঃ ৫৪ রাগিণী ভৈরবী।

বন্দেমাতরম্, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, পৃঃ ৩৫-৩৬

সঙ্গীতকোষ, ২য় খণ্ড, 'ভারত সঙ্গীত', সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৯৫, পৃঃ ৯৯৬*

মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৯*

জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-১৭*

সত্তর বৎসর, আত্মজীবনী—বিপিনচন্দ্র পাল, পৃঃ ১৭৩। গানটির সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক নরেন্দ্রকুমার শীল, গা-১৫ *

* ১'ভারত' শব্দটি অতিরিক্ত আছে।

১৭৭। রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা

"উন্নতি উন্নতি"—উল্লাস-ভারতী, কেন দিবারাতি বল রে ?
কিসের উন্নতি ? দেশের দুর্গতি ; দেখে শুনে তবু ভোলো রে !
বটে জলে স্থলে, ভারতমণ্ডলে ; যেন মন্ত্রবলে, ধোঁয়া-যন্ত্র চলে—
একই দিবসে কাশী যাও চ'লে !—তাই কি উল্লাসে গল রে ? ১
চঞ্চলা-দামিনী-বিমান-চারিণী, তব বার্ত্তা বহে আসিয়া অবনী ;
এ নব বিভব অদ্ভুত কাহিনী ;—তাই কি বিস্ময়ে টল রে ? ২
কিন্তু একবার ভেবে দেখ সার্—এত যন্ত্র দেশে, যন্ত্রী কেবা তার্ ?
স্বত্ব-অধিকার, তাহে কি তোমার ? মিছা আশা-দোলে দোল রে। ৩
নদী-সিন্ধু-নীরে, পোত থরে থরে—গর্ভে গুরুভার, চলে গর্ব্ব ভরে !
তা দেখে পুলকে ভাব কি অন্তরে, দেশের দারিদ্র্য গেল রে ? ৪
কিন্তু রে অবোধ্ ! সে পোত কাহার ? স্বত্ব-অধিকার, তাহে কি তোমার ?
যাদের বাণিজ্য, তাদের ব্যাপার—ব্যাপারী ধবল-দল রে। ৫
চিনির্ বলদ্ তোমরা কেবল্— কেরানী, মুহুরী, সরকারের দল্ !
কাকের কি লাভ, পাকিলে শ্রীফল ? উচ্ছিষ্ঠ খোসা সম্বল রে। ৬

-বসু, মনোমোহন

মনোমোহন গীতাবলী, মনোমোহন বসু, গা-৮, পৃঃ ২২৬
সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৪র্থ খণ্ড, সংখ্যা ৫১, পৃঃ ৫৪-৫৫
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৫৫
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৮-৯

১৭৮। রাগিণী বিভাস—তাল একতালা

নরবর নাগেশ্বর শাসন কি ভয়ঙ্কর !
দে কর, দে কর, রব নিরন্তর করের দায় অঙ্গ জর জর !
সিন্ধুবারি যথা শুষে দিনকর,
শোণিত শোষণ করে শত কর,
করদাহে নর নিকর কাতর,
রাজা নয়, যেন বৈশ্বানর ! ১

ভূমির কর মাত্র ছিল দেশে কর,
কে জানিত এত কর দুখাকর ?
কর বিনা রাজা করে না বিচার,
ধর্ম্মে নয়, ধনে জয়ী নর ! ২
বাড়ী-ঘর-আলো-শান্তি-জল-কর—
স্থলপথে আর সেতুর উপর,
জলে গেলে তরী ধরে রাজচর--
শূন্য বই গতি নাহি আরো ! ৩
গো-অশ্ব-শকট-কর বহুতর—
পশু-নর, কারো নাহিক নিস্তার !
নীচ কর্ম্মে খাটে তাদের ধরে কর—
নীচাশয় এমি রাজ্যেশ্বর ! ৪
আয়কর শুনে, গায় আসে জ্বর !
অস্থি-ভেদী রথ্যা-কর কি দুষ্কর !
লবণটুকু খাব, তাতেও লাগে কর !
কত আর কব মুনিবর ! ৫
মাদকতা-কর ছলে দেশময়,
মদ্যের বিপণি ; নিত্য বৃদ্ধি হয় ;
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয় !
হাহাকার রব নিরন্তর ! ৬

—বসু, মনোমোহন

হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃঃ ৭৮

১৭৯ । কীর্ত্তন

কে আছিস্ দেখ্ সে এসে কেমন শোভা হয়েছে
(আজ) দেশবিদেশের সবাই এসে আলো করে বসেছে
কারো নাইকো জাতি কুলের অভিমান
একটি গানে একটি তানে সবাই বীণা সেধেছে
আজ ভারতবাসী মহাযজ্ঞে মায়ের নামে মেতেছে
ওরে সামান্যজন নয়কো এরা একদিন এরাই ছিল জগৎ সেরা

এখন যতন বিনে দিনে দিনে দশাহারা হয়েছে
কপাল দোষে কালের বশে প্রাণে মরে রয়েছে
কোথায় গো মা মহারাণি—আমরা তোমা বিনে কূল দেখিনি
'মা' বলে মা। সবাই যে তোর মুখের পানে চেয়ে আছে
ছেলে বলে কোলে নে মা ভয়াতুরে অভয় দে মা
মায়ের পরাণ কেমন করে চুপ করে আজ রয়েছে।

—বসু, সুরেন্দ্রচন্দ্র

সঙ্গীতকোষ, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায, গা-'১৮০, পৃঃ ৯৯০
স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক নবেন্দ্রকুমার শীল, গা ৪৮

১৮০। বাউল

"বাউল"

ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস,
এই বেলা তুই দিয়ে দেনা।
ওরে, মায়ের তরে প্রাণটি দিবার
এমন সুযোগ আর হ'বে না।
যখন দুদিন আগে, দুদিন পরে
তফাৎ মাত্র এই ;—
তখন অমূল্য এই মানব জনম
বৃথা দিতে নাই,—ওরে ক্ষ্যাপা!
মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন
দে রে মায়ের তরে ;
অমর জীবন পাবিরে ভাই,
জগৎ মায়ের ঘরে
কি দিয়েছিস লিখবে যখন
পরকালের খাতা ;—
তখন তোরই দানে হবে আলো
বইয়ের প্রথম পাতা,—ওরে ক্ষ্যাপা!

—বাগচী, যতীন্দ্রমোহন

অর্ঘ্য, 'স্বরাজ সঙ্গীত' (১৯২১) পৃঃ ৪৪-৪৫
গীতিমালিকা, অতুলচন্দ্র ঘটক।
বন্দনা, নলিনীরঞ্জন সরকার, পৃঃ ৫৭-৫৮
স্বদেশ-গীতি, প্রকাশক হরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, গা-৫, পৃঃ ৫-৬। কিছু শব্দ পরিবর্তিত।

১৮১।

এস সোনার বরণী রাণী গো শঙ্খ কমল করে।
এস মা লক্ষ্মী, বস মা লক্ষ্মী, থাক মা লক্ষ্মী ঘরে॥
গাছে গাছে দেছ ভারে ভারে ফল, মাঠে মাঠে দেছ ধান।
গোষ্ঠে গোষ্ঠে সুশীলা কপিলা, দুধের নদীতে তুলেছ বান॥
টলমল করে নদীর জল, ধুয়ে নেছ জ্বর জ্বালা।
তোমারই যতনে সাজান রতনে পরেছ ডিঙ্গার মালা॥

—বিদ্যাবিনোদ, ক্ষীরোদপ্রসাদ

'বাংলার মসনদ্' নাটক থেকে গৃহীত।
হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-৪১, পৃঃ ১৫১

১৮২। ব্যাঙের সুর

একবার জাগ, জাগ, জাগ,
যত ভারত সন্তান রে।
লোহিত বরণে পূরব গগনে,
উদিত তরুণ তপন রে।
জাগিল চীন জাগিল জাপান,
নবীন আলোকে রে,
কাল ঘুমঘোর ভাঙ্গিবে না তোর,
অলস ভারত রে।
ছিলে রাজরাণী বীর প্রসবিনী
প্রতাপ জননী রে,
(আজি) পর পদাঘাতে দলিতা লাঞ্ছিতা,
দীন কাঙ্গালিনী সে!
নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে,
সোনার ভারত রে;
তোমার আকাশ তোমার বাতাস,
তোমার কিছু নয় রে!

নবীন প্রভাতে নবীন প্রাণে
নবীন তপন রে,
কোটি কণ্ঠস্বরে গাও উচ্চৈঃস্বরে
বন্দেমাতরম্
শুনিয়া সে ধ্বনি স্বরগ অবনী
হবে প্রতিধ্বনি রে।
শতবৎসরের অলস পরাণ
জাগিবে জাগিবে রে।

—বিশ্বাস, রাইচরণ

জাতীয় সঙ্গীত, প্রকাশক বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী (১৯২২) পৃঃ ৭৯-৮০
মুক্তির গান, সতীশচন্দ্র সামন্ত

১৮৩।

হমারা সোনেকি হিন্দুস্থান।
তুহু মেরা দিল্‌কা রোসেন—তু হমারা জান।
চারু চন্দা তপন তারা উজল আস্‌মান্,
তেরি ছাতি পর শ্যামল তরুয়া ছায়া করত দান॥
তেরি কুঞ্জমে ফুটত ফুলুয়া, পক্ষী গাওত গান,
শ্যাম ক্ষেত পর ডোলত কোইছা, হাওয়াসে সোনেকি ধান॥
যমুনাকি তট পর কৈছন মনোহর শ্যামকি বংশীয়া তান।
যোহি শ্রওয়ন কিয়ে যমুনাকি পানিয়া চঞ্চল চলত উজান।
সারে দুনিয়া যব ঘোর আঁধারমে তবহু তুহু সেয়ান,
দেশ দেশ পর জ্ঞানকি জ্যোতি মাহ্নি দিয়াহু তেরি জেয়ান॥
যুগযুগান্তর তেরি তপোবন পর, কতহুঁ ধরম বাখান,
বিমান কম্পই উঠাথা নিতিহুঁ গম্ভীর ওঙ্কার তান॥
লাখ লাখ বীর চিতা ভস্মসে ছাদিত তেরি বয়ান,
তেরি মাট্টী পর নিদ্ যাওয়ে মাহ্নি অগণিত কবি মহান্॥
রক্ষণ হেতু বেদধরম ধন ভকত সাধু জন মান,
যুগে যুগে তেরি কোড়সে জননী জনম লিয়া ভগবান॥

অব তুহুঁ ভারত লজ্জিত বিষাদিত বিহীন ধরম যশো-মান।
সো হি দরশ কিয়ে দিনহুঁ রাতিয়া ঝুরত মেরি-নয়ান॥

—ভট্টাচার্য্য, কামিনীকুমার

মুক্তির গান, সতীশচন্দ্র সামন্ত, পৃঃ ৪-৫
স্বদেশ সঙ্গীত, মুরারি দে, পৃঃ ৩৬-৩৭
অর্ঘ্য, 'স্বরাজ সঙ্গীত', পৃঃ ৬১-৬২ *অজ্ঞাত কবির নামে গৃহীত।

১৮৪।

শাসন-সংযত-কণ্ঠ, জননি! গাহিতে পারি না গান
তাই মরম বেদনা লুকাই মরমে, আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ॥
সহি প্রতিদিন কোটি অত্যাচার,
কোটি পদাঘাত, কোটি অবিচার,
তবু হাসিমুখে বলি বার বার,
"সুখী কেবা আর মোদের সমান?"
বিনা অপরাধে অস্ত্রহীন কর,
অন্নাভাবে অতি শীর্ণ কলেবর,
তবু আশেপাশে শত গুপ্তচর,
প্রতি পদে লয় মোদের সন্ধান।
শোষণে শূন্য কমলা ভাণ্ডার,
গৃহে গৃহে মর্মভেদী হাহাকার,
যে বলে এ কথা অপরাধ তার,
হায় হায়, একি কঠোর বিধান!
না জানি জননী! কতদিন আর
নীরবে সহিবে হেন অত্যাচার,
উঠিবে কি কভু বাজিয়ে আবার,
স্বাধীন ভারতে বিজয়-বিষাণ?

—ভট্টাচার্য্য, কামিনীকুমার

হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-৩৯, পৃঃ ১৪৯-৫০

১৮৫।

অবনত ভারত চাহে তোমারে
এস সুদর্শনধারী মুরারী।
নবীন তন্ত্রে নবীন মন্ত্রে
কর দীক্ষিত ভারত নর-নারী।
মঙ্গল ভৈরব শঙ্খ-নিনাদে,
বিচূর্ণ কর সব ভেদ-বিবাদে,
সম্মান-শৌর্যে, পৌরুষ বীর্যে,
কর পূরিত নিপীড়িত ভারত তোমারি।
মুক্ত সমুন্নত-পতাকা তলে,
মিলাও ভারত-সন্তান সকল,
নব আশে হিন্দুস্থান, ধরুক নূতন তান,
এস অরি-শোণিতে মেদিনী রঞ্জিতে
নব বেশে ভীষণ অসিধারী।

—ভট্টাচার্য্য, কামিনীকুমার

হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-৭৮, পৃঃ ১৪৮-৪৯

১৮৬।

সোণার স্বপন মোহে ভুলিও না ভাই সাধনা।
এ যে আলেয়ার আলো মরু মরীচিকা আশ্বাস ভরা ছলনা
ওদের রুদ্ধ দুয়ারে করি করাঘাত পেয়েছ করে বেদনা,
ওরা শুনিল কি তব ধর্ম্ম-কাহিনী বুঝিল কি তব যাতনা ?
ওরা ঘৃণা করে মোদের বর্ণ মোদের আহ্বানে বধির কর্ণ
তুচ্ছ ফুৎকারে দেয় ভেঙ্গে চুড়ে সকল সঞ্চিত কামনা॥
না করিলে পান মোদের শোণিত হয় ওদের চিত্ত ক্ষুব্ধ
তাই ভুলাইতে চায় 'মাতৃমন্ত্র' করি আকাশ কুসুমে লুব্ধ
মোদের দৈন্য করে পরিহাস কেড়ে নিতে চায় মুখের গ্রাস
তবু যুক্ত করে ওদের দুয়ারে কেন নিত্য নিষ্ফল যাচনা॥

এখন আপনার পানে ফিরাও নয়ন জাগাও আপন শক্তি
পরের চরণ না করি লেহন কর আপনার মায়ে ভক্তি
তবে জাগিবে নবীন রঙ্গে নব জীবন নববঙ্গে
বিশ্ব কাঁপায়ে উঠিবে বাজিয়ে রুদ্র বিজয় বাজনা ॥

—ভট্টাচার্য্য, কামিনীকুমার

মাতৃমন্ত্র, প্রকাশক অমূল্যচন্দ্র অধিকারী, গা-১৫, পৃঃ ১৫-১৬
বন্দনা, (২য়) নলিনীরঞ্জন সরকার, গা-১৫

১৮৭। ললিত, আড়া

কত আর নিদ্রা যাও, ভারত-সন্ততিগণ।
নয়ন খুলিয়া দেখ শুভ-উষা আগমন।
অধীনতা অন্ধকার, পাপ তাপ দুর্নিবার,
মঙ্গল-জলধি-জলে হতেছে চিরমগন।
সযতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃ সমীরণ-স্বরে,
ডাকেন ভারতমাতা, পরি উজ্জ্বল বসন।—
"উঠ বৎস প্রাণসম, যত পুত্রকন্যা মম
কালরাত্রি অবসানে উদিল সুখতপন।
বিশাল বিশ্বমন্দিরে, সত্য শাস্ত্র শিরে ধ'রে,
বিশ্বাসেরে সার ক'রে, কর প্রীতির সাধন।
নরনারী সমুদয়ে এক পরিবার হয়ে,
গলবস্ত্রে পূজ তাঁরে, যাঁ হতে পেলে এ দিন ॥"

—মজুমদার, প্রতাপচন্দ্র

ব্রহ্ম সঙ্গীত, ৮ম অধ্যায়, গা-৮২০, পৃঃ ৪০৭
বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৭১৭

১৮৮।

জাগো জাগো ভারত মাতা!
চরণ তলে তব অভিনব উৎসব
করিব, রচিব নব গাথা।

অগণন জনগণ-ধাত্রি।

অকথিত মহিমা অশেষ গরিমা

অনন্ত সম্পদ দাত্রি।

মঙ্গলযুত তব কীর্ত্তি;

তব গুণ গৌরব তব যশ-সৌরভ

ব্যাপিল বিশাল পৃথ্বী।

শূরজননি সুরপূজ্যে!

নিহত সুকৃতি তব হত সুখ গৌরব

দনুজ-দলিত নব রাজ্যে,

নব্য জগত-ইতিহাসে

নগণ্য তুমি মা অগণ্য মহিমা

বিস্মৃত দেশ বিদেশে।

জাগো জাগো ভারত মাতা।

চরণ তলে তব রোদন-উৎসব

করিব, রচিব নব গাথা।

—মজুমদার, বিজয়চন্দ্র

বন্দেমাতরম্‌, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, পৃঃ ৮৯-৯০

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, সম্পাদক বন্দ্যোঃ এবং মুখোঃ, পৃঃ ৩৪৫

স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক নবেন্দ্রকুমার শীল, গা-৯

১৮৯।

হবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা, অগ্নিমন্ত্রে কিনা?

তৃণ বলি' তোরে গরবে হেলায়,

দলিতেছে অরি চরণতলায়,

পোড়াতে অরিকে পুড়িয়া মরিতে—পারিবি কিনা?

দগ্ধ ভস্মে গ্রাসিতে বিশ্ব পারিবি কিনা?

লভ গো মৃত্যু জিনিতে শত্রু—যে করে তোমারে ঘৃণা,

তবে পরীক্ষা, তোমার দীক্ষা, অগ্নিমন্ত্রে কিনা!

ভীষণ কান্তি আসিছে মরণ

মহা অরণ্যে করি বিচরণ

কৃষ্ণ হস্তে শাণিত অস্ত্র ধরিবি কিনা?

ধেয়ে আয় যারা মরিতে পারিস্
শ্মশানের ধূমে মিশাইতে বিষ,
মরণ আদেশ দিতেছে স্বদেশ, পালিবি কিনা ?
সৃজি হলাহল শোণিত তরল ঢালিবি কিনা ?
জাগে অপমান, বিন্ধ্যসমান ঘুচে কি মরণ বিনা ?
আজি পরীক্ষা তোমার দীক্ষা অগ্নিমন্ত্রে কি না !

—মজুমদার, বিজয়চন্দ্র

হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-৮৩, পৃঃ ১৫২

১৯০।

আয় আজি আয় মরিবি কে ?
পিষিতে অস্থি শুষিতে রুধির নিশীথে শ্মশানে পিশাচ অধীর ?
থাকিতে তন্ত্র সাধনমন্ত্র প্রেতভয়ে ছি ছি ডরিবি কে ?
মরার মতন না লভি মরণ, সাধকের মত মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?
অসুরনিধনে কিসের তরাস, পশুর নিধনে তোরা কি ডরাস্ ?
না গণি বিজন কানন ভীষণ বিপদ তরিবি কে ?
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি বীরের মতন মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?
উঠিয়া সিন্ধু মথিয়া তুফান ছুটিছে ঊর্মি পরশি বিমান
সাহসেতে ভর করি সে সাগর হাসিমুখে তোরা তরিবি কে ?
হউক ভগ্ন, জলধি মগ্ন, তবু তরী বাহি মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?
চরণের তলে দলি রিপুগণ লভিত নির্বাণে অমর জীবন,
তাদেরই অংশে তাদেরই বংশে জনম, সেকথা স্মরিবি কে ?
লভিতে তূর্ণ ত্রিদিব-পুণ্য আর্যের মতো মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?
মাতি সৌরভে যশগৌরবে অমর হইয়া মরিবি কে ?
আয় আজি আয় মরিবি কে ?

—মজুমদার, বিজয়চন্দ্র

হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-১৯, পৃঃ ১২৮-২৯

১৯১। বসন্তবাহার—একতালা

আঁধার ভারতে আলো কে আর জ্বালিবে রে ?
আলোকিতে ছিল যারা, একে একে গেছে তারা,
ত্যজি যায় সুখতারা, যেমন প্রভাতে রে।
বিদেশী চাতক আসি, পিয়িতেছে জল রে।
দুখে ভারতজননী, করিছে রোদন ধ্বনি
হারাইল মণিফণী, যেমন বিষাদ রে।
আর কি চকোর হাসি, পিয়িবে রে সুখরাশি,
পূরবে ভারতশশী যেমন উদিলে রে।
ভারত-বিহগগণ, গাবে কি মধুর গান,
তারা পূরবে যেমন, গাইত উল্লাসে রে।
সে সুখের দিন হায়, আসিবে কি পুনরায়,
পলাবে কি দুরালয়, ভারতের মসীরে।
আঁধার ভারতে আলো কে আর জ্বালিবে রে ॥

—মিত্র, অবিনাশচন্দ্র

সঙ্গীতকোষ, (২য়), সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩২০২, পৃঃ ৯৯৯
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৭১
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৭৯

১৯২। বিভাস—ঝাঁপতাল

উঠ উঠ উঠ সবে, ভারত-সন্তানগণ।
থেকো না থেকো না আর,
মোহ-নিদ্রায় অচেতন ॥
পোহাইল দুঃখনিশি, সুখ-সূর্য্য ঐ রে,
পথিক বলে হাসিতেছে,
দেখ রে মেলে নয়ন।
ঘোরতর অন্ধকার, পাপ-নিশাচর আর,
ঐ দেখ পোহাইল, আর দুঃখ রবে না ;
জ্ঞানালোক প্রকাশিল সুপবন বহিল,
ভারত-কাননে ডাকে, আশা বিহঙ্গিনীগণ ॥

সুপ্রভাতে শুভক্ষণে, চল সবে সযতনে,
আলস্য-ঔদাস্য বশে আর কেহ থেকো না ;
প্রেমের পতাকা তুলি বিভুপদ স্মরি রে,
ভাসাও জীবন-তরী কর শীঘ্র আয়োজন ॥

—মিত্র, আনন্দচন্দ্র

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৫৩৯
সঙ্গীতকোষ, (২য়), 'ভারত সঙ্গীত', সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৫৩
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৬
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা ১৯
হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-৩৭, পৃঃ ১৪৮

১৯৩। বেহাগ—আড়াঠেকা

একাকী কাননে বসি, কে তুমি বল রমণি।
স্বভাব সুন্দর অতি, নব রসে রসবতী,
শত কোটি চন্দ্র যিনি প্রভাময় মুখখানি ॥
নাহি কোন অলঙ্কার মণি মুক্তা চন্দ্রহার,
লাবণ্য তবু অপার, বনফুলে সুশোভিনী ॥
বিষাদে মলিন বেশে, বল কি ভাবিছ ব'সে,
নয়ন জলে যাও ভেসে, কোন্ দুঃখে বিনোদিনী।
ছাড় ঐ জীর্ণ বাঁশী, ত্বরা লহ মাল্য অসি,
আমি যাহা ভালবাসি, সাজ রণ-বিলাসিনী ॥
পথিক বলে মাতৃভাষা, হায় তোমার এ দুর্দ্দশা,
কত দিনে মনের আশা, পূর্ণ হবে নাহি জানি ॥

—মিত্র, আনন্দচন্দ্র

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৫৩৯
সঙ্গীতকোষ, (২য়), 'ভারত সঙ্গীত', সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৯৬

১৯৪। বেহাগ—আড়াঠেকা

কোথায় রহিলে সব, ভারতভূষণ,
একবার এসে দুঃখিনীরে কর দরশন।
সুরম্য কুসুমবন, দাবানলে দহে যেন,
নিষ্ঠুর শ্বাপদ পদে করিছে দলন ॥
কোথা রাম রঘুমণি বীরত্ব-ধীরত্ব খনি,
কোথা সীতা, কোথা সতী ভারতের প্রাণধন।
কোথা ভীষ্ম ভীমার্জ্জুন, কোথা যোগী ঋষিগণ,
কোথা সেই নবরত্ন অমূল্য রতন ॥
অজ্ঞানতা অন্ধকারে, অধীনতা-পারাবারে,
ভাসিছে ভারত ঐ, ভরসা নাহি সংসারে,
জননীর এ যাতনা, কেউ দেখেও দেখে না,
পথিক বলে সবে মোহ-নিদ্রায় মগন ॥

—মিত্র, আনন্দচন্দ্র

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৫৩৮
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৮১

১৯৫। মল্লার—আড়াঠেকা

সাধের ভারতভূমি ঢাকিল কি অন্ধকারে।
সবে অন্ধ মহামোহে, মত্ত হয়ে পরদ্রোহে,
নিজ হস্তে নিজ গৃহ, দুখানলে দগ্ধ করে ॥
কিবা মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কিবা ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
কিবা ধনী কি দরিদ্র, শত্রুভাব ঘরে ঘরে ;
সবে বটে ভাই ভাই, কারো প্রতি স্নেহ নাই,
সঁপিয়াছে দুঃখিনীরে, জন্মভূমি জননীরে।
এই দম্ভ-পাপে হায়, অনাহারে মৃতপ্রায়,
সহস্র ভারতযুবা ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে ॥
কেহ চির পরবাসে, দুঃখের সাগরে ভাসে,
জীবনেতে জীবন্মৃত, অনাদরে অত্যাচারে।

পথিক বলে এই পাপে, পুড়িতেছে মনস্তাপে,
দুঃখিনী ভারতনারী ভাসিছে নয়নাসারে।
ভ্রূণহত্যা ব্যভিচারে, গেল দেশ ছারেখারে,
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, দেখেও তা দেখে না রে॥

—মিত্র, আনন্দচন্দ্র

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী. পৃঃ ৫৪০
জাতীয় সঙ্গীত, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩২০১
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৭৮

১৯৬। ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি

কত প্রিয়তম, কে বুঝিতে পারে.
সুখ-জন্মভূমি, জননীসম রে।
শ্যামল সুন্দর, মনচিত্ত-হর,
প্রীতিপূর্ণিত রূপ অনুপম রে।
কিবা দূর দেশে, কিবা স্বপ্নাবেশে,
হেরি ঐ মূরতি, হৃদয়কন্দরে।
জনক জননী, সুখ-স্পর্শমণি,
বিরাজিত যে সুখ-রত্নাকরে॥
কিবা স্নেহমাখা, যত বাল্যসখা,
ছিল পুষ্পিত যে বনে থরে থরে।
প্রিয় প্রণয়িনী, প্রেম-কমলিনী,
হলো বিকশিত যেই সুখ-সরে॥
সে সুখ-সরসে পরিমল-আশে,
তৃষিত মানস-মরাল বিহরে।
সেই পুণ্য দেশে, ফল ফুল হাসে,
কল্প-কানন এ অবনীমাঝারে।
সে দেশের তরে, দু-নয়ন ঝরে,
হেরি ভগ্নদশা হৃদয় বিদরে॥

—মিত্র, আনন্দচন্দ্র

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৫৩৯
সঙ্গীতকোষ (২য়), 'ভারত সঙ্গীত', সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৯১
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৮০

১৯৭। আড়ানা—বাহার, তেওট

হে নিরদয় নীলকরগণ!
আর সহে না প্রাণে এ নীল-দাহন॥
দাহনের সুকৌশলে, শ্বেত-সমাজের বলে,
লুটে'ছ সকল ধন কি আর আছে এখন॥
দীনজনে দুঃখ দিতে, কাহার না লাগে চিতে,
কেবল নীলের হেরি পাষাণ সমান মন।
বৃটন-স্বভাবে শেষে, কালী দিলে বঙ্গে এসে,
তরিলে জলধি-জল পোড়া'তে স্বর্ণভবন॥

—মিত্র, দীনবন্ধু

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৪৯৬
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৮
হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-২, পৃঃ ১১২

১৯৮। কালাংড়া—একতালা

বাঁচিয়ে কি ফল যদি স্বাধীনতা যায়?
পড়িবে কি সিংহরাজ শৃগালের পায়?
স্বদেশ-রক্ষার তরে, সমরে কি কেহ ডরে,
শতগুণে হয় বলী স্বদেশ-রক্ষায়॥

—মিত্র, দীনবন্ধু

স্বদেশ সঙ্গীত, যোগেন্দ্রনাথ শর্মা, গা-২৫, পৃঃ ৩২

১৯৯। সিন্ধুভৈরবী—একতালা

এ দেশের দুখে কার না সরে চোখের জল
নিদ্রায় নিঝুম তবু আমরা সকল।
উঠ জাগ সকলেতে, সজীব কর ভারতে,
ভাই ভাই মিলে সব হও এক দল।

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, কত কাল রবে,
বিনা মিলে কোন কাজ হয় কি সফল ?

—মিত্র, নবগোপাল

সঙ্গীতকোষ, (২য়), 'ভারত সঙ্গীত', সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৪৭, পৃঃ ৯৭৭
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৭০
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৫৫ *'হিন্দুমেলা'র নামে গৃহীত।

২০০।

শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা
অভয়া চরণে নম্রশির,
ডরি না রক্ত ঝরিতে ঝরাতে—
দৃপ্ত আমরা ভক্তবীর।
শুধু মায়ের চরণে নম্রশির।
মা আমাদের জগদ্ধাত্রী—
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্রী,
ইপ্সিত বর অভয় দাত্রী—
অধিষ্ঠাত্রী ত্রিলোকীর।
আবাহন মার যুদ্ধঝননে—
তৃপ্ত তপ্ত রক্ত ক্ষরণে
পশুবধে আর অসুর দমনে
মায়ের খড়্গ ব্যগ্রাধীর।

—মিত্র, বরদাচরণ

হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-২২, পৃঃ ১৩২

২০১।

ও ভাই ক্ষুদিরাম! সকলকে ছেড়ে গেলি রে!
ও ভাই ক্ষুদিরাম।
গেলি রে স্বর্গপুরে না জানি কতদূরে
ভবসিন্ধুর ওই পারে করিলি বিশ্রাম।

ক্ষুদি, তুই প্রাণ পেলি, যে পথ দেখায়ে গেলি
সে পথ বিনে বাঙ্গালী পাবে না আরাম।
প্রফুল্ল সখার সনে, দেখা কি হয় সেখানে
পিতামাতার চরণে ঘটে কি প্রণাম ?
মানবের স্বাধীনতা যদি না থাকে সেথা,
তবে যে মানবের বৃথা, বৃথা স্বর্গধাম !
ও ভাই ক্ষুদিরাম।

—মিত্র, মদনমোহন*

* আগরতলার সভা-কবি।
বাংলায় বিপ্লববাদ, নলিনীকিশোর গুহ, পৃঃ ৩৪

২০২। কাফি—যৎ

কে তুমি বিজনে বসি কপোলে রাখিয়া কর,
কি তাপে তাপিত তনু নয়নে ঝরে নির্ঝর ॥
যেন নভচ্যুত শশী কাননে পড়েছে খসি,
অথবা বিজলীরাশি, ত্যজে জলদনিকর।
এমন কণ্টক বনে, এমন অমূল্য ধনে,
কে রেখেছে সংগোপনে, হয়ে কঠিন অন্তর।
চিনেছি চিনেছি মরি, এ যে ভারতসুন্দরী,
দুঃখিনী করেছে অরি, কাঁদিয়ে ভেঙ্গেছে স্বর ॥

—মিত্র, রাধানাথ

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৯০৪
সঙ্গীতকোষ, 'ভারত সঙ্গীত', সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৯০৩

২০৩। খাম্বাজ—একতালা

ভারত যশ কীর্ত্তন করিয়ে কাটাব এ ছার জীবন।
বেদবীণা ল'য়ে করে স্বদেশী বিদেশী ঘরে,
গাইব করুণ স্বরে, করেছি মনন ॥

উচল অচল শিরে, গহন-বন-মাঝারে,
গাইব সাগরতীরে, যখন তখন।
বনের বিহঙ্গ ধ'রে, শিখাব যতন ক'রে,
গাইবে মধুর স্বরে, ছাইয়া গগন।
দেখা ক'রে অলি সনে, বলে দিব কাণে কাণে,
গাইবে কুসুম-বনে, মাতায়ে পবন।
নির্জ্জীব সজীব হবে, মরুভূমি ফল দেবে,
গাবে জয় জয় রবে জ্বলন্ত তপন॥

—মিত্র, রাধানাথ

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৯০৩
সঙ্গীতকোষ, (২য়), 'ভারত সঙ্গীত', সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৪৬
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৫৪ রচয়িতার নাম অজ্ঞাত।

২০৪। পাহাড়ী জংলা—ঠুংরী

ভারত যো দীন, সো দীন রে।
কত কাল গেল, কত কাল এল,
রহে শ্রীহীন রে॥
কত শত দেশ, ধরে রাজবেশ,
কত দুঃখ শেষ, নাহি হ'ল রে।
দুটি অন্ন লাগি, পরদ্বার ভাগী
নিজধনে যোগী আজি তুমি রে।
কোটি কোটি সুত, হবে পরাভূত,
ক্ষত্র রাজপুত, শুধু নামে রে।
পরে ছিন্ন বাস, মুখে শোক-হাস
সদা হৃদিত্রাস, প্রাণভয়ে রে॥

—মিত্র, রাধানাথ

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৯০৪
সঙ্গীত কোষ, (২য়), 'ভারত সঙ্গীত', সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৫২
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৫৮

২০৫। ঝিঁঝিট—কাওয়ালি

ভারতভূমি সমান আছে ভবে কোন স্থান
ভারতের গুণগান সবে মিলি গাও রে।
ভারতে যে ধন নাই, কোথা তাহা নাহি পাই
অতুলনা এক ঠাঁই দেখিতে না পাওরে
যে ধনে হয়ে অভাব ভারতের এই ভাব
করি তাহা অনুভব তাহারে মিলাও রে
অধীনতা অপমানে দুঃখিনী ব্যথিতা প্রাণে
জননীর মুখপানে বারেক না চাওরে
পেলে তিনি হারাধন, জুড়াবেন প্রাণমন
করি হেন সমাপন বাসনা পুরাও রে।
থাকিবে না কোন দুঃখ হইবে পরম সুখ
সকলে কেন বিমুখ এ সুখ না চাওরে।

—মিত্র, রাধানাথ

সঙ্গীতকোষ, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৫৯, পৃঃ ৯৮২
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৬৫
স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক নরেন্দ্রকুমার শীল, গা-৭৭
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭৮ ৭৯

২০৬। 'কেন গো কালি নেংটা ফের' সুর

আহা। গেল গো ভারত রসাতলে, কিছু বিচার নাইকো হিন্দুর দলে
অনিয়মের বাধ্য হয়ে সকল স্বেচ্ছাচারে চলে
এ পাপ সমাজের কেউ কর্ত্তা নাই তো সাধ্য কি করবে বলে
জমীদার ধনীগণ আছে দুষ্টলোকের করতলে।
দেখ শ্রেষ্ঠলোকের অন্নকষ্ট মতির হার বানরের গলে
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য কতই আছে মোদের দলে
তারা সমাজের অগ্রগণ্য কতই কুকাজ তলে তলে

রাসবিহারী কয় মাটি ফাটি আমি যাব তোমার তলে
তখন ধরণী কয় কিরূপ ফাটি—গলিত তোমার নয়নজলে।

—মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী

সঙ্গীতকোষ, 'ভারত সঙ্গীত', সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৯৮, পৃঃ ৯৯৮
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন।
বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৭১৬

২০৭।

আয়রে আয় ভারতবাসী, হিন্দু-মুসলমান ছুটে আয়।
ত্বরা এসে নেগো স্মরণ, ভারতমাতার রাঙ্গা পায়॥
তোদের দুঃখে দুঃখী হইয়ে, দু'টী বাহু প্রসারিয়ে।
আয় কোলে আয় আয় বলিয়ে, ডাকছে ভারত মাতায়॥
বিনা পয়সায় উকিল হইয়ে মহাত্মা গান্ধী আসিয়ে।
মায়ের কাছে আরজী দিয়ে, আছেন তোদের অপেক্ষায়॥
চিত্তরঞ্জন আদি করে, মহুরী গান্ধীর দপ্তরে।
তাঁদের কথা শুন্‌লে পরে, ডিক্রী পাওয়া কত দায়?
এখনও যে রইলে শুইয়ে, ত্বরায় জোটনা আসিয়ে।
তোদের জবান বন্দী নিয়ে, ভারতমাতা লিখবেন রায়॥
না দিলেও কর্টফি ও ফিস্, মায়ের কাছে নাই মামলা ডিস্ মিস্
বসন্ত কয়, কেন ডরিস, ডিক্রী হ'বে এক তরফায়॥

—মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার

স্বরাজ সঙ্গীত, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, গা-১৪, পৃঃ ৯

২০৮।

জয় জয় ভারতমাতা, জয় মা তোমার জয়।
ভবে রত্নগর্ভা নারী, তুমি ত মাগো নিশ্চয়॥
(ও মাগো) তোর জ্যেষ্ঠ তনয়, এমন দয়াল নাই আর ধরায়,
ভারত হিতে ভ্রমিছে সদায়।
(ওমা) এ গান্ধীরে গর্ভে ধরে, রাখলে কীর্ত্তি জগৎময়॥

(মা!) বিলাস ধূল চোখে গিয়ে নিজ হিত সব ভুলিয়ে,
শুইয়ে ছিলাম অন্ধ যে হইয়ে।
(আহা) ধন্য গান্ধি, তাঁরে বন্দি, চোক ফুটেছে যাঁর কৃপায় ॥
(মা) চিত্তরঞ্জন আদি করে, ব্যারিষ্টারী কার্য্য ছেড়ে,
দাঁড়িয়েছে দেশের তরে।
(মাগো) সবাই এমন ত্যাগী হলে, তবে ভারত স্বরাজ পায় ॥
১৩২৭ সালে, কন্‌ফারেন্স হ'ল বরিশালে, কত লোক এল দলে দলে।
এখন যজ্ঞশালে গান্ধী এলে, তবে যজ্ঞ পূর্ণ হয়।
সি. আর. দাস লিয়াকত হোসেন, আক্রাম খাঁ ও নিশীথ সেন
সকল মহাত্মা এসেছেন।
ও বসন্ত ভণে, গান্ধী বিনে হল দক্ষযজ্ঞ প্রায় ॥

—মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার

স্বরাজ সঙ্গীত, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, গা-১, পৃঃ ১

২০৯।

পুতুলবাজির পুতুল মোরা, নাই নিজের বশে।
(যেমন) বাজীকরের পুতুলগুলি, আজ্ঞাতে উঠে বসে ॥
মোদের মত আর ত বোকা নাই, ভাঙ্গা পিতল দিয়ে রাখি,
লোহারই কড়াই।
মোরা কাঁচ রাখি কাঞ্চন দিয়ে নির্ব্বিবাদে আপোষে ॥
চাকরি কি এমনই মিঠা, (মোরা) এখন তো ছাড়তে নারি, খেয়েও ঝাটা।
এ গোলামী থাক্‌তে, এ ভারতে বল স্বরাজ পায় কিসে ॥
পরের হাতে বিচারেরই ভার, তাতে হচ্ছে কি সুসার,
এত খরচ চালাইতে শক্তি আছে কার।
(ভাইরে) কিসের শঙ্কা, মেরে ডঙ্কা, বিচার করবে সালিশে ॥
(দেশের লাগি) খাট রাত দিনে, (কিন্তু) বসন্ত কয়
আমার কথা শুন সাবধানে।
(মোদের) বাক্যে কি কার্য্যেতে যেন, শান্তিভঙ্গ না আসে ॥

—মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার

স্বরাজ সঙ্গীত, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, গা-৫, পৃঃ ৪

২১০।

সাবধান— সাবধান—
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড,
রুদ্র দৃপ্ত মূর্তিমান ॥
ঐ শোন তাঁর গরজে কম্বু অম্বুধি যথা উচ্ছলে,
প্রলয় ঝঞ্ঝা ইরম্মদে মৃত্যু ভীষণ কল্লোলে।
হুঙ্কার শুনি গভীর মন্ত্র, কাঁপিছে তারকা সূর্য চন্দ্র,
বিদরে আকাশ স্তব্ধ বাতাস—
শিহরি উঠিছে জগৎ প্রাণ ॥
ভ্রূকুটি কুটিল রক্ত নেত্রে চিত্র ভানু উজ্জ্বলে,
উঠিছে কিরীটি গরিমা দীপ্ত ভেদিয়া সূর্য মণ্ডলে।
অগণিত করে ঝলসে কৃপাণ তপ্ত রক্ত করিতে পান ;
বলদর্পির চরণাঘাতে—
ত্রিভুবন ভীত কম্পমান ॥
ত্রিভুবন জুড়ি বিরাট দেহ ভেবেছ কি আর পলাইবে কেহ,
এখনো চরণে শরণ লহ—
নতুবা নাহিরে পরিত্রাণ ॥

—মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র

চারণকবি মুকুন্দদাস, জয়গুরু গোস্বামী। পরিশিষ্ট—ঘ॥ ভণিতা-বিভ্রাট গীত-১, পৃঃ ৩০৭, রচয়িতা হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সুরকার ও যাত্রাগীতিকার মুকুন্দচন্দ্র দাস।

চারণকবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী, কালীপদ দাস, গীত-৩৩, পৃঃ ২৫-২৬

চারণকবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, গীত-৩, পৃঃ ২

মুকুন্দদাসের গীতাবলী—কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত এবং মদনগোপাল গুপ্ত, গীত-১, পৃঃ ২

হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-৩৩, পৃঃ ১৪৪-৪৫

মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ১২৩, মুকুন্দদাসের গান বলে উল্লিখিত। কিন্তু ৬ এবং ৭ পংক্তি পরিবর্তিত।

২১১।

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন, শুনে যা আমার আশার কথা ;
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে, তবুও প্রাণের ঘুচেছে ব্যথা।
এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে, ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে,
কি জানি কখন কি মোহন বলে ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু হেথা।

আমি শুনিনু জাহ্নবী-যমুনার তীরে, পুণ্য-দেব-স্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা, গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাবেরী পঞ্চনদকূলে একই প্রথা।
আর দেখিনু যতেক ভারত-সন্তান, একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান্,
আসিছে যেন গো তেজোমূর্ত্তিমান্, অতীত সুদিনে আসিত যথা।
ঘরে ভারত-রমণী সাজাইছে ডালি, বীর শিশুকুল দেয় করতালি ;
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা, গাইছে উল্লাসে বিজয় গাথা,

—রায়, কামিনী

মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ১০১
বন্দেমাতরম্, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, গা-৩৭
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক, জলধর সেন, গা-৫২
হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-২৭, পৃঃ ১৩৮-৩৯

২১২।

যেইদিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনম-ভূমি,—মা আমার, মা আমার।
অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে ;
ছোটখাটো সুখ-দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার
তুমি যবে চাহ কাজ,—মা আমার, মা আমার।
অতীতের কথা কহি, বর্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায় ;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে,—মা আমার, মা আমার।
মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময়, এ জীবন কেবা ধরে ?

যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক-ভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ,—মা আমার, মা আমার।

—রায়, কামিনী

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, সম্পাদক মুখোপাধ্যায় এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৫৬
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ১০০-১
বন্দেমাতরম্, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, গা-২৩
স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক নবেন্দ্রকুমার শীল, গা-১০
বঙ্গের মহিলা কবি, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ ৯৯-১০০

২১৩। পিলুবারোঁয়া—যৎ (প্রচলিত সুর)

নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা, তটশালিনি সুন্দরি যমুনে ও।
কত কত সুন্দর নগরী, তীরে রাজিছে, তট-যুগ ভূষি ও,
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ ছবি, অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও।
যুগ যুগ বাহী, প্রবাহ তোমারি, দেখিল কত শত ঘটনা ও,
তব জল বুদ্বুদ, সহ কত রাজা, পরকাশিল লয় পাইল ও।
কল কল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী, কহিছ সবে কি পুরাতন ও,
স্মরণে আসি, মরমে পশে কথা, ভূত সে ভারত-গাথা ও।
তব জল কল্লোল, সহ কত সেনা, গরজিল কোন দিন সমরে ও,
আঁজি সব নীরব, রে যমুনে তব, গত যত বৈভব কালে ও।

—রায়, গোবিন্দচন্দ্র

শতগান, 'জাতীয় সঙ্গীত', সম্পাদিকা সরলা দেবী, গা-৪৬, পৃঃ ১২৬
বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৬০৪-৬
বন্দেমাতরম্, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, পৃঃ ২৪-২৯
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৩৪
* এই গ্রন্থে কবিতাটি দীর্ঘ।

২১৪। খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌ ঠুংরি

কত কাল পরে, বল ভারত রে,
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে।

নিজ বাস ভূমে, পরবাসী হ'লে,
পর দাস-খতে সমুদায় দিলে।
পর-হাতে দিয়ে, ধন রত্ন সুখে,
বহ লৌহ-বিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর ভাষণ আসন, আনন রে,
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
পর দীপ-শিখা, নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।
ঘুচি কাঞ্চন-ভাজন, শৌধ-শিরে,
হলো ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে।
খনি খাত খুড়ে, খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে,
পুঁজি পাত নিলে যুটিয়ে লুটিয়ে।
নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে,
পরিবর্ত্ত ধনে দুর-ভিক্ষ নিলে।
মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গ সুখে,
তুমি আজও দুখে, তুমি কালও দুখে।
নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে
ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে।
বিধি বাদ হ'লে পরমাদ রটে,
পরমাদ হরে হিত-বোধ ঘটে।
কি ছিলে কি হ'লে কি হ'তে চলিলে ;
অবিবেক-বশে কিছু না বুঝিলে।
নয়নে কি সহে, এ কলঙ্ক দুখ,
পর-রঞ্জন অঞ্জনে কাল মুখ।

—রায়, গোবিন্দচন্দ্র

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৬০৬, এই গ্রন্থে সংকলিত গানটি অনেকাংশে পৃথক।

জাতীয় সঙ্গীত, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ দাস, গা-১৯, পৃঃ ৩৫

বন্দেমাতরম্, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, পৃঃ ৩৩-৩৫

সঙ্গীতকোষ, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৯৭, পৃঃ ৯৯৭

শতগান, সম্পাদিকা সরলা দেবী, গা-৪৭, পৃঃ ১২৮

জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৪৭

২১৫।

আজ আয় আয় ভাই সব মিলে।
সাধিতে স্বদেশহিত আয় রে সকলে।
চিরদিন দুখে বসি কি হবে কাঁদিলে,
একা অসহায় ভাই মোরা ধরাতলে,
হয় কি উদ্ধার কাজ এক নাহি হ'লে,
হয় কি উদ্ধার কাজ প্রাণ নাহি দিলে ;
আয় একবার সবে দ্বেষ হিংসা ভুলে,
আয় এই দুখনিশি দূরে যাবে চলে।

—রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল

বন্দেমাতরম্, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, গা-৪৪
দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ১ম, (সাহিত্য সংসদ) আর্য্যগাথা, ১ম, গা-১৮, পৃঃ ৪৮৩

২১৬। বাগেশ্রী—আড়া

"জন্মভূমি"

কি মাধুর্য্য জন্মভূমি জননি তোমার।
হেরিব কি তোমারে মা নয়নে আবার।
কত দিন আছি ছাড়ি,
তবু কি ভুলিতে পারি,
তবুও জাগিছ মাতঃ হৃদয়ে আমার।
লালিত শৈশব যথা যাপিত যৌবন,
ভুলিতে সে প্রিয় দৃশ্য চাহে কি গো মন,
প্রতি তরুলতা সনে,
মিশ্রিত জড়িত মনে,
স্মৃতিচোখে প্রিয় ছবি হেরি বার বার।
তোমা বিনা অন্য কারে মা বলে ডাকিতে,
কখন বাসনা মাতঃ নাহি হয় চিত্তে ;
অভূষণ শোভারাশি,
মাতঃ তব ভালবাসি

চাই না সুরম্য স্থান নানা অলঙ্কার।
স্বর্গীয় মাধুর্য্যময় স্বদেশ আমার।

—রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, 'গান', পৃঃ ৬৮৫

২১৭। "গান"

কিসের শোক করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই,—আবার তোরা মানুষ হ' ॥
পরের 'পরে কেন এ রোষ, নিজেরাই যদি শত্রু হ'স্ ?
তোদের এ যে নিজেরই দোষ—আবার তোরা মানুষ হ'।

ঘুচাতে চাস্ যদি রে এই হতাশাময় বর্ত্তমান ;
বিশ্বময় জাগায়ে তোল্ ভায়ের প্রতি ভায়ের টান ;
ভুলিয়ে যা রে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর্ ;
বিশ্ব তোর নিজের ঘর—আবার তোরা মানুষ হ'।

শত্রু হয় হোক্ না, যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,
তাহারে ভালবাসিতে শেখ্, তাহারে কর্ হৃদয় দান।
মিত্র হোক্ ভণ্ড যে—তাহারে দূর করিয়া দে ;
সবার বাড়া শত্রু সে,—আবার তোরা মানুষ হ'।

জগত জুড়ে দুইটি সেনা পরস্পরে রাঙায় চোক্ ;
পুণ্য সেনা নিজের কর্, পাপের সেনা শত্রুর হোক্ ;
ধর্ম্ম যেথা সেদিকে থাক্,—ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ্ ;
স্বজন দেশ ডুবিয়ে যাক্—আবার তোরা মানুষ হ' ॥

—রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল

দ্বিজেন্দ্র কাব্য-সঞ্চয়ন, সম্পাদক দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ২৫০-৫১

২১৮।

জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ অনল।
ফেলিব না শোকে আর নয়নের জল।

কাঁদিয়াছি বহুদিন কাঁদিব না আর হে,
দেখিব আজো এ মনে আছে কত বল।
বিভব গৌরব মান সকলি নির্ব্বাণ হে,
আছে মাত্র আর্য্যবংশ-গরিমা সম্বল।

এখনো আমরা সেই আর্য্যের সন্তান হে,
বহিছে শিরায় আর্য্য-শোণিত প্রবল।
সেই বেদ, সে পুরাণ, আজো বর্ত্তমান হে,
সে দর্শন যাহে মুগ্ধ আজো ভূমণ্ডল।
সেই ঘাট, সেই বিন্ধ্য, সেই হিমালয় হে,
জাহ্নবী-যমুনাবারি, আজো নিরমল।

আজিও বিস্তৃত সেই পুণ্য আর্য্যস্থান হে,
আমরা সন্তান তার কেহ হীনবল।
উঠ অগ্রসর, ভাই ত্যজি বিসম্বাদ হে,
ভাই ভাই মিলি সাধ স্বদেশ-মঙ্গল।
অজস্র রোদনে যাহা হয়নি সাধন হে,
আজি নবোৎসাহে তাহা হইবে সফল,
জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ অনল॥

—রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল

বন্দেমাতরম্, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, গা-৩৬
দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ১ম, (সাহিত্য সংসদ) গা-১৫, পৃঃ ৪৮২

২১৯। সিন্ধু-ভৈরবী, একতালা

কাঁদ রে, কাঁদ রে আর্য্য কাঁদ অবিরল।
শুকাবে জীবন-নদী শুকাবে না আঁখিজল॥
এ জগতে একা বসি, কাঁদ দুঃখে দিবানিশি,
নয়নের জলে তোরা ভাসাইয়ে ধরাতল॥
কাঁদ রে, কাঁদ রে আর্য্য কাঁদ অনিবার।
পেয়েছিলি একদিন যবে প্রাণভরে।
হাসিতিস্ আর্য্য তুই জগত ভিতরে,
সেদিন নাহিক আর, কাঁদ তবে অনিবার,

নিবিবে জীবন-দীপ নিবিবে না চিতানল।
কাঁদ রে কাঁদ আর্য্য কাঁদ অবিরল॥

—রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল

সঙ্গীতকোষ, 'ভারত সঙ্গীত', সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৯৪
বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৮১৬-১৭
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৮২ *দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে গৃহীত।
দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ১ম, (সাহিত্য সংসদ) আর্য্যগাথা, ১ম, গা-১২, পৃঃ ৪৮১

২২০। ইমন্‌-ভূপালী, একতালা

ভারত আমার, ভারত আমার,
যেখানে মানব মেলিল নেত্র ;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা,
এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননি,
দর্শন-উপনিষদে দীক্ষা ;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প,
কর্ম্ম-ভক্তি ধর্ম্ম-শিক্ষা।

(কোরাস্‌) ভারত আমার, ভারত আমার,
কে বলে মা তুমি-কৃপার পাত্রী ?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননী,
ধর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা ধাত্রী।

ভগবদ্গীতা গাহিল স্বয়ং
ভগবান সেই জাতির সঙ্গে ;
ভগবৎ প্রেমে নাচিল গৌর
যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে।
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র
প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম ;
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস
প্রচার করিল 'সোঽহং' ধর্ম্ম।
(কোরাস্‌) ভারত আমার ... ... তুমি মা ধাত্রী।

আর্য্য ঋষির অনাদি গভীর,
উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র ;
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি,
নহি কি আমরা, তাঁদের গোত্র !
তোমার গরিমা-স্মৃতির বর্ম্মে
চলে যাব শির করিয়া উচ্চ,—
যাদের গরিমাময় এ অতীত,
তারা কখনই নহে মা তুচ্ছ।
(কোরাস্) ভারত আমার ... ... তুমি মা ধাত্রী।

ভারত আমার, ভারত আমার,
সকল মহিমা হোক খর্ব্ব ;
দুঃখ কি, যদি পাই মা তোমার
পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব্ব ;
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ
লুপ্ত হয় এ মানব-বংশ।
যাদের মহিমাময় এ অতীত,
তাদের কখনও হবে না ধ্বংস।
(কোরাস্) ভারত আমার ... ... তুমি মা ধাত্রী।

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া
অতীতের সেই মহা আদর্শ,
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে
রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ 'পরে,
আছে বিধাতার করুণা-দৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপর
করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।
(কোরাস্) ভারত আমার ... ... তুমি মা ধাত্রী।

—রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ২য়, (সাহিত্য সংসদ), পৃঃ ৬৪৭-৪৮
হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-২৪, পৃঃ ১৩৪-৩৬

২২১। "মেবার"

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—যুঝেছিল যেথা প্রতাপবীর,
বিরাট দৈন্য দুঃখে, তাহার শৃঙ্গের সম অটল স্থির।
জ্বালিল সেখানে যেই দাবাগ্নি সে রূপবহ্নি পদ্মিনীর,
ঝাঁপিয়া পড়িল সে মহা আহবে যবন সৈন্য. ক্ষত্রবীর।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—রঞ্জিত করি' কাগার তীর
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত অযুত যাহার ভক্তবীর।
চিতোর দুর্গ হইতে খেদায়ে ম্লেচ্ছ রাজায় গজ্জনীর,
হরিয়া আনিল কন্যা তাহার বিজয়-গর্বে বাপ্পা বীর।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—গলিয়া পড়িছে হইয়া ক্ষীর,
সবার—সবার হইতে মধুর যাহার শস্য যাহার নীর।
যাহার কুঞ্জে বিহগ গাইছে গুঞ্জরি' স্তব যাহার শ্রীর,
যাহার কাননে বহিয়া যাইছে সুরভি স্নিগ্ধ পবন ধীর।

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—ধূম্র যাহার তুঙ্গ শির;
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া ভাসায় যাহার কাননতীর।
মাধুরী বন্য কুসুমে জাগিয়া ঘুমায় অঙ্গে রমণী শ্রীর;
শৌর্যে স্নেহে ও শুভ্রচরিতে কে সম মেবার—সুন্দরীর।

মেবার পাহাড়—উড়িছে যাহার রক্তপতাকা উচ্চশির—
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

—রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল

দ্বিজেন্দ্র কাব্য-সঞ্চয়ন, সম্পাদক দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ২৪৫-৪৬
দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, 'গান' দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ৬১৭
গান, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, পৃঃ ১৩১-৩২

২২২। গৌরী—মধ্যমান

* যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান;
ছিল এ একদা দেব-লীলাভূমি,—
করো না করো না তার অপমান!

আজিও বহিছে গঙ্গা, গোদাবরী,
যমুনা, নর্ম্মদা, সিন্ধু বেগবান ;
ওই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি,—
করো না করো না তার অপমান !

নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার,
পুণ্য হল্‌দীঘাট আজো বর্ত্তমান !
নাই উজ্জয়িনী, অযোধ্যা, হস্তিনা ?—
করো না করো না তার অপমান !

এ অমরাবতী, প্রতিপদে যায়,
দলিছ চরণে ভারত-সন্তান ;
দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত,—
করো না করো না তার অপমান !

আজো বুদ্ধ-আত্মা প্রতাপের ছায়া
ভ্রমিছে হেথায়—হও সাবধান !
আদেশিছে শুন অভ্রান্ত ভাষায়,—
"করো না করো না তার অপমান !"

—রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল

বন্দেমাতরম্, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, পৃঃ ৫৭-৫৮
বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৮১৬ * আরম্ভে একটি অতিরিক্ত চরণ—
"করো না করো না তার অপমান !"
সঙ্গীতকোষ, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'ভারত সঙ্গীত', গা-৩১৪৫,
* আর্য্য শব্দটি আছে।
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-১৩
দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ১ম, (সাহিত্য সংসদ) আর্য্যগাথা, ১ম, গা-১৪, পৃঃ ৪৮১-৮২

২২৩

স্বদেশ আমার ! নাহি করি দরশন,
তোমা সম রম্য ভূমি নয়নরঞ্জন।
তোমার হরিত ক্ষেত্র আনন্দে ভাসাবে নেত্র,
তটিনীর মধুরিমা তুষিবে এ মন।

প্রভাতে অরুণছটা সায়াহ্ন অম্বরে,
সুরঞ্জিত মেঘমালা শান্ত রবিকরে,
নিশীথে সুধাংশুকর, তারা-মাখা নীলাম্বর,
কে ভুলিবে কে ভুলিবে থাকিতে জীবন।

কোথায় প্রকৃতি এত খুলিয়ে ভাণ্ডার
বিতরেন মুক্তকরে শোভারাশি তাঁর ?
প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি বনে, প্রতি কুঞ্জে উপবনে,
কোথা এত—কোথা এত বিমোহে নয়ন ?
বাসন্ত কুসুমরাজি বিবিধ বরণ,
চুম্বি কোথা এত স্নিগ্ধ বয় সমীরণ ?
তরুরাজি তব সম, কলকণ্ঠ বিহঙ্গম,
পাইব না পাইব না খুঁজিয়ে ভুবন।
হায় মা আসিয়ে যত নিষ্ঠুর যবন,
হরিয়াছে ও দেহের সকল ভূষণ ;
কিন্তু তব হিমগিরি, জাহ্নবীর নীল বারি,
পারিবে না পারিবে না করিতে লুণ্ঠন।
অতুল স্বর্গীয় শোভা জননী তোমার,
মিশিবে মা অশ্রু সনে নয়নে আমার ;
যথায় যাইব আমি, তোমারে জনমভূমি
ভুলিব না ভুলিব না জীবনে কখন।

—রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল

বন্দেমাতরম্, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, গা-৪১
দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ১ম, (সাহিত্য সংসদ) আর্য্যগাথা ১ম, গা-৩, পৃঃ ৪৭৯-৮০

২২৪। জয়জয়ন্তী—একতালা

মনোমোহন মূরতি আজি মা তোমারি,
মলিন হেরিতে মা গো পারি না যে আর ॥
কেন মা আজি নীরব, বীণার কাকলি তব,
কেন বা পড়িয়ে বীণা আছে এক ধার।

নাহি ভবভূতি ব্যাস, নাহি মাঘ কালিদাস,
তাই কি মলিনবেশে কাঁদ অনিবার ॥
পরভয়ে স্বর তুলে, পার না হৃদয় খুলে,
গাইতে স্বাধীন ভাবে ঝঙ্কারিয়ে আর ।
তাই তব অশ্রুজল, ঝরে কি মা অবিরল,
তাই কি নীরব তব বীণার ঝঙ্কার ।
লও বীণা তুলি করে, মধুর গম্ভীর স্বরে,
গাও মা স্বর্গীয় গীত জগতে আবার ॥

—রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল

সঙ্গীতকোষ, ২য়, 'ভারত সঙ্গীত', সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গা-৩১৮৯
বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৮১৬
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৯৪, রচয়িতা—অজ্ঞাত ।

২২৫ । মল্লার—আড়া

রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত স্বরে রে ।
কেন ও কুহক আর ভারত ভিতর রে ।
যাও চলি পরভৃত, চাই না ও মৃদু গীত,
গাও রে পাপিয়া তবে ভাসায়ে অম্বরে রে ।
শুনিয়া মুরলীগান জাগিবে না আর্য্যপ্রাণ,
ঢালিবে সে স্বপ্ন তার শ্রবণকুহরে রে ।
উঠ তবে পার যদি, রে তূরী গগনভেদী,
উঠ কাঁপি দূরাকাশে লহরে লহরে রে ।
শঙ্কর-গৌতম-কথা প্রতাপের বীরগাথা,
গাও আজি পথে পথে নগরে নগরে রে ।
মিলি আর্য্য কবিগণে গাও রে উন্মত্ত মনে,
নীরব পুরাণ-গীত সানন্দ অন্তরে রে ।
রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত স্বরে রে ॥

—রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল

আর্য্যগাথা, ১ম, 'আর্য্যবীণা', গা-২, দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৪৭৯
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৮৪
বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৮১৬

২২৬। মিশ্র কেদারা—একতালা

ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা ;—
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা !
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ, এমন কালো মেঘে !
তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখীর ডাকে জেগে ;

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড় !
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে !
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে !

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী ; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি ;
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে ;

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ !
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি—

এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

—রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল

দ্বিজেন্দ্র কাব্য-সঞ্চয়ন, সম্পাদক দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ২৪৮-৪৯
দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, 'গান' দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, পৃঃ ৬৭৫
গান, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, পৃঃ ১৫১-৫২
হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-২৩, পৃঃ ১৩২-৩৪

২২৭। ইমন্—একতালা

তুমি ত মা সেই তুমি ত মা সেই
চির-গরীয়সী ধন্যা অয়ি মা।
আমরা শুধুই হ'য়েছি মা হীন, হারায়েছি সব বিভব, গরিমা ;

তুমি ত মা আছ তেমতি উচ্চ, আমরা শুধুই হয়েছি তুচ্ছ,
তোমারি অঙ্কে লভিয়া জনম, জানিনা কি পাপে এ তাপ সহি মা।
এখনো তোমার গগন সুনীল, উজল তপন তারকা চন্দ্রে,
এখনো তোমার চরণে ফেনিল, জলধি গরজে জলদ মন্দ্রে ;
এখনো ভেদি' হিমাদ্রি-জঙ্ঘা, উছলি' পড়িছে যমুনা গঙ্গা,
ঢালিয়া শতধা পীযূষ পুণ্য, তোমার ক্ষেত্রে যাইছে বহি' মা।
তুমি ত মা সেই সুজলা সুফলা, এখনও হরষে ভাসায় নেত্রে,
পুষ্প তোমার নিবিড় কুঞ্জে, শস্য তোমার শ্যামল ক্ষেত্রে ;
তোমার বিভবে পূর্ণ বিশ্ব, আমরা দুঃখী আমরা নিঃস্ব,
তুমি কি করিবে তুমি ত মা সেই মহিমা-গরিমা-পুণ্যময়ী মা।

—রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল

বন্দেমাতরম্, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, পৃঃ ৯১, (ইমন্-ভূপালী, চৌতালা)
গান, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, পৃঃ ২১

২২৮। ইমন্-কল্যাণ, একতালা

আজি গো তোমার চরণে, জননি।
আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান ;
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত
শতেক ভক্ত দীনের গান।
মন্দির রচি মা তোমার লাগি,
পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি,
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননি,
স্নেহের সরিতে করিয়া স্নান।
(কোরাস্) জননি বঙ্গভাষা, এ জীবনে
চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি
অমল-কমল-চরণে স্থান।

জান কি জননি জান কি কত যে
আমাদের এই কঠোর ব্রত।
হায় মা! যাহারা তোমার ভক্ত,
নিঃস্ব কি গো মা তারাই যত!
তবু সে লজ্জা তবু সে দৈন্য,
সহেছি মা সুখে তোমারি জন্য,
তাই দু'হস্তে তুলিয়া মস্তে
ধরেছি যেন সে মহৎ মান।
(কোরাস্) জননি ... ... চরণে স্থান!

নয়নে বহেছে নয়নের ধারা
জ্বলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা,
মিটায়েছি সেই জঠর-জ্বালায়
পিইয়া তোমার বচন-সুধা;
মরুভূমে সম যখন তৃষায়,
আমাদের মা গো ছাতি ফেটে যায়,
মিটায়েছি মা গো সকল পিপাসা
তোমার হাসিটি করিয়া পান।
(কোরাস্) জননি ... ... চরণে স্থান!
পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই
তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি,
বাসনা, তাহাই গুছায়ে যতনে
সাজাব তোমার চরণ দুটি।
চাহি না ক কিছু, তুমি-মা আমার,—
এই জানি শুধু নাহি জানি আর,
তুমি গো জননি হৃদয় আমার,
তুমি গো জননি আমার প্রাণ!
(কোরাস্) জননি ... ... চরণে স্থান!

—রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ২য় (সাহিত্য সংসদ) গান, পৃঃ ৬৫১-৫২

২২৯। মিশ্র ঝিঁঝিট, একতালা

"দেশ"

বঙ্গ আমার! জননি আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ!
কেন-গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন-গো মা তোর রুক্ষ কেশ?
কেন-গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন-গো মা তোর মলিন বেশ?
ত্রিংশ কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে—"আমার দেশ!"

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্ধ-জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর;
অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি শেষ,
তুই কিনা মাগো তাঁদের জননি, তুই কিনা মাগো তাদের দেশ!

একদা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণব-পোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময়;
সন্তান যা'র তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কিনা এই ধূলায় আসন, তার কিনা এই ছিন্ন বেশ!

উঠিল যেখানে মূরজ-মন্ত্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস যেথা গাহিল গান!
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই ত ম সেই ধন্য দেশ!
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্তলেশ।

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর,
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য; মানুষ আমরা; নহি ত মেষ!
দেবি আমার! সাধনা আমার! স্বর্গ আমার! আমার দেশ!

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ।
ত্রিংশ কোটি মিলিত-কণ্ঠে ডাকে যখন—"আমার দেশ।"

—রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল

গান, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, সম্পাদক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৩৪৮
দ্বিজেন্দ্র কাব্যসঞ্চয়ন, সম্পাদক দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ২৩৯-৪০

২৩০। ইমন্-ভূপালী, একতালা

যেদিন সুনীল জলধি হইতে
উঠিলে জননি ! ভারতবর্ষ !
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব,
সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ !
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার
প্রভাত হইল গভীর রাত্রি ;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি !
জগত্তারিণি ! জগদ্ধাত্রি !"
(কোরাস্) ধন্য হইল ধরণী তোমার
চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাইল, "জয় মা জগন্মোহিনী !
জগজ্জননি ভারতবর্ষ !"

সদ্যঃ স্নান-সিক্তবসনা
চিকুর সিন্ধু শীকর লিপ্ত ।
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে
অমল কমল-আননে দীপ্ত ;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য
করিছে—তপন তারকা চন্দ্র ;
মন্ত্রমুগ্ধ চরণে ফেনিল
জলধি গরজে জলদমন্দ্র ।
(কোরাস্) ধন্য হইল ... ... ভারতবর্ষ !"
শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট,
সাগর-উর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার
পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা ।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত
তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে ;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে,
ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে ।
(কোরাস্) ধন্য হইল ... ... ভারতবর্ষ !"

উপরে, পবন প্রবল স্বননে
শূন্যে গরজি অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক-কলরবে,
চুম্বি তোমার চরণ-প্রান্ত,
উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র,
করিয়া প্রলয়-সলিল-বৃষ্টি—
চরণে তোমার, কুঞ্জকানন
কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি।
(কোরাস্) ধন্য হইল ... ... ভারতবর্ষ !"
জননি, তোমার বক্ষে শান্তি,
কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন,
চরণে তোমার বিতর মুক্তি ;
জননি, তোমার সন্তান তরে
কত না বেদনা কত না হর্ষ ;
জগৎপালিনি ! জগত্তারিণি !
জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !
(কোরাস্) ধন্য হইল ... ... ভারতবর্ষ !"

—রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, (সাহিত্য সংসদ) গান, পৃঃ ৮৪৬-৪৭

২৩১। বাগেশ্রী-আড়া

কেন ভাগীরথী হাসিয়ে হাসিয়ে
নাচিয়ে নাচিয়ে, চলিয়ে যাও গো।
ঢলিয়ে ঢলিয়ে, সৈকত পুলিনে,
বহি এ ভারতে কি সুখ পাও গো।

নিরখি মা আজ ভারতের দশা,
এ দুঃখে আনন্দে কি গান গাও গো।
কি সুখে বল মা নীলাম্বর পরি,
হরষিত মনে সাগরে ধাও গো।

অধীন ভারতে বহ না মা আর,
এ কলঙ্করেখা মুছায়ে দাও গো।
উথলি তটিনী গভীর গরজে,
সমুত্ত ভারত-হৃদয় ছাও গো ॥

—রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী, ১ম, (সাহিত্য সংসদ) আর্যাগাথা ১ম, গা-২০, পৃঃ ৪৮৩
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৯৯
বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৮১৭

২৩২।

ক্ষুধিতের সেবার ভার
লও লও কাঁধে তুলে।
কোটি শিশু নরনারী
মরে অসহায় অনাহারে,
মহাশ্মশানে জাগো মহামানব
আগুয়ান হও ভেদ ভুলে।
মানুষের মাঝে মরে ভগবান
পিশাচ দুয়ারে হাসে খল খল
দীনতা হীনতা ভীরুতারে কর দূর
আশার আলো ধর তুলে ॥

—রায়, বিনয়

হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-৫৫, পৃঃ ১৬৪-৬৫

২৩৩। সুরটমল্লার—আড়া

বৃথায় জনম আমার অন্ন নাই খেতে ঘরে,
পরিবারগণ সবে শুধু ধায় ক্রন্দন করে।
প্রাণতুল্য পুত্রগণ হ'য়ে ব্যাকুলিত মন
বল শীঘ্র খেতে দাও নতুবা যাই প্রাণে মরে

দুর্ভিক্ষ হল প্রবল আমার নাই অর্থবল
কিরূপে বাঁচাব প্রাণ দেখিনে উপায়—
হায় এই ছিল রে ভাগ্যে জীবন যাবে দুর্ভিক্ষে
ভাবিলে সে ঘোর মূর্ত্তি সতত নয়ন ঝরে।
আর কোন স্থান নাই যথা গেলে অন্ন পাই
বিপদকালেতে বন্ধু কেহ নাহি হয়।
কোথাও হে ধনীগণ—দরিদ্রে দিয়ে অশন
রাখ ওষ্ঠাগত প্রাণ মঙ্গল হইবে পরে।

—রায়, মহিমারঞ্জন

সঙ্গীতকোষ, 'ভারত সঙ্গীত', সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৯৯, পৃঃ ৯৯৮
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৮৩
স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক নরেন্দ্রকুমার শীল, গা-৬৪

২৩৪। খাম্বাজ-জংলা—একতালা
(রামপ্রসাদী সুর)

তোমাদের এ কি বিবেচনা,
ঘরের তুল পরকে দিয়ে,
কাপড় চাদর কেন কেনা
আপনার মায়ে ভুলে গিয়ে,
পরের মায়ের উপাসনা,
কাজে কাজেই আজন্মকাল
ঘুচ্‌ল না কো ছেঁড়া টেনা।
কড়ামূলের ঝোড়াখানেক
পিতল কেনো দিয়ে সোণা,
তোমরা যে কি বুদ্ধিমান্‌,
তা এতদিনে গেল চেনা।

—রায়, রাজকৃষ্ণ

সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৪র্থ খণ্ড, 'ভারতগান', গা-৮৪, পৃঃ ৯২-৯৩

২৩৫। সাহানা—ধামার

জানি আমি, কেন গেল ভারতের সিংহাসন ;
জানি আমি ভারতের বুকে কেন হুতাশন।
কেন যে ভারত হেন, এ ঘোর কুদিন কেন,
তাও জানি, আরো জানি, যা না জানে অন্য জন।
কিন্তু কি দুখের কথা, জানি না কেন একতা
ভারতবাসীর নাই, এ কি বিধি-বিড়ম্বন ;—
হায়, কত দিন আর রসাস্বাদ একতার
লবে না এ মূর্খ জাতি, ধৈরযে ধরিয়া মন ?

—রায়, রাজকৃষ্ণ

সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৪র্থ খণ্ড, 'রাজকৃষ্ণ রায়', গা-৬৮, পৃঃ ৯১
বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৬৯০
সঙ্গীতকোষ, ২য়, 'ভারত সঙ্গীত', সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা-৩১৪৮, পৃঃ ৯৭৮
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৫৬ *রচয়িতা অজ্ঞাত।

২৩৬। ললিত—আড়াঠেকা

কি গাইব আজি, হায়, কি আছে ভারতে আর ?
হু হু করে প্রাণ মন, ধূ ধূ করে চারি ধার !
যে দিকে ফিরাই আঁখি, অনিমেষে চেয়ে থাকি,
শূন্যময় সবি দেখি, শূন্যে রব হাহাকার।
ভারত—ভারত নয়, কেবল শূন্যতাময়,
কায়ার কেবল ছায়া, নাহিক জীবন ;—
তাই আজি খেদে কই,—বেদের ভারত কই ?
অধীন ভারতে, হায়, এ যে শুধু অশ্রুধার !

—রায়, রাজকৃষ্ণ

সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৪র্থ খণ্ড, 'ভারতগান', গা-১, পৃঃ ৯০
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৩৭
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫০

২৩৭। বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

কোথা সে অযোধ্যাপুর, মথুরা এখন,
কোথা সেই কুরুক্ষেত্র-সমর-প্রাঙ্গণ।
কোথা সে বীরত্ব-লীলা, কোথা সে অসির খেলা,
কোথা সেই হুহুঙ্কার হৃদয়কম্পন।
কোথা সেই ধনুর্ব্বাণ, কোথা বীর-কণ্ঠগান,
কোদণ্ড টঙ্কার ঘোর এবে রে কোথায়।—
বীরমাতা হ'য়ে তুমি, হইলে অবীর ভূমি,
ভারত রে, ভাগ্যে তোর বিধি বিড়ম্বন॥

—রায়, রাজকৃষ্ণ

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৬৯০
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৭৫ *রচয়িতা অজ্ঞাত।

২৩৮। পরজ খাম্বাজ—মধ্যমান

কলকণ্ঠময়ী গঙ্গে, এখনো সাগরপানে
কোন্ সুখে চলি, চলেছ মৃদুল তানে।
পূর্ব্বে তুমি দিবানিশি, কনক কণিকারাশি,
প্রবাহে বহিয়া তব, ধাইতে মধুর গানে।
এবে এ ভারতে আর কই স্বর্ণ-কণাভার,
রাশি রাশি পঙ্ক, মতি, ভারত ভরিয়া ;—
এ পঙ্ক লইয়া মিছে, কেন যাও সিন্ধুকাছে,
যেও না যেও না আর, ফিরহ পুন উজানে।

—রায়, রাজকৃষ্ণ

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৬৯০
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৭২

২৩৯। খাম্বাজ-জংলা—একতালা

(রামপ্রসাদী সুর)

(ওরে) মনে মুখে তফাৎ কেন ?
(ওরে) এই তফাতে পরের হাতে
ফতে হ'ল সিংহাসন।
সভায় গিয়ে মুখের কথায়
দেখাও খুলে খোলা প্রাণ,
(কিন্তু) কাজের বেলায় আর নড় না,
কাঠে গড়া পুতুল যেন।
দিনে রেতে খেতে শুতে
সময় কাটাও যেন তেন,
স্বার্থী হয়ে অর্থ দিয়ে
ফক্কিকারী খেতাব কেনো !
পরের পায়ের ধূলা চেটে
মিছে বাড়াও নিজের মান,
(ছি ছি) নিজের টাকা পরকে দিয়ে
চাকর সেজে ফিরে আন।

—রায়, রাজকৃষ্ণ

সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৪র্থ খণ্ড, 'ভারতগান', গা-৮৫, পৃ: ৯৩-৯৪

২৪০। গৌরী—একতালা

দিবস বিগত, তবুও ভারত।
নহিল বিগত দুখ তোমার ?
রজনী আইল, আবার ছাইল
শোকের উছাস মুখ তোমার।
পূরব আকাশে আঁধার ধায়,
বদন তোমার আঁধার তায়,
তপত করিছে শীতল বায়
দুখ-নিপীড়িত বুক তোমার।

শিশির-শীকর ঝরে ধীরে ধীরে,
শরীর তোমার ভাসে আঁখি-নীরে,
আরো কত দিন, ওরে দুখিনি রে,
দুখ-নীরে পড়ি দিবি সাঁতার !

—রায়, রাজকৃষ্ণ

সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৪র্থ খণ্ড, 'ভারতগান', গা-২৯, পৃঃ ৯১
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫০
হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-৩৫, পৃঃ ১৪৬-৪৭

২৪১ । ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা

ভারতীয় আর্য্যনাম এখনো ধরায় ।
আর্য্যের শোণিত আজো আছে কি শিরায় ।
তা, যদি থাকিত তবে, এ দশা কেন রে হবে,
কেন বা ভাসিতে হ'বে নয়ন-ধারায় ।
আর্য্যনামে পরিচয়, দিবার এ কাল নয়,
অনার্য্য অধম এবে ভারতবাসী ;—
'আর্য্যত্ব যাহাতে রবে, ভারতে নাহি তা' এবে,
মুখে আর্য্যনাম ভাণে গৌরব কোথায় ॥

—রায়, রাজকৃষ্ণ

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৬৯০
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৬৭

২৪২ । খাম্বাজ-জংলা—একতালা
(রামপ্রসাদী সুর)

মন্ বসে না দেশের হিতে,
বাগান-ভোজে যাও রে ম'জে,
গরিবগুলি পায় না খেতে ।

গেজেটে নাম উঠ্‌বে ব'লে
টাকা ঢাল চাঁদার খাতে,
ভেলা মাথায় তেল ঢেলে দাও,
ক্ষুধিত ব'সে খালি পাতে !
হুজুর হুজুর ব'লে দাঁড়াও,
হাজার সেলাম ঠুকে মাথে,
কাজের বেলায় কাণা হ'লে,
দেশটা গেল অধঃপাতে।

—রায়, রাজকৃষ্ণ

সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৪র্থ খণ্ড, 'ভারতগান', গা-৮৭, পৃঃ ৯৪
স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক নরেন্দ্রকুমার শীল, গা-৪০

২৪৩। বিভাস—(কীর্ত্তনাঙ্গ)

নিশিদিন ভারত ! রোয়সি কিস লিয়ে
ভূ'পর শোয়সি কাহে,
গভীর দীঘল শ্বাস মুহু মুহু তেজসি,
নিয়ত দহসি দুখ-দাহে ?
বরষা আওল, পুন ফিরি যাওল,
শুখাওল ঘন-জল-ধারা।
তব ইহ শোক-ঘন আজুতক বরখন
করতহি আঁশু অপারা।
বিহি তুহেঁ বাম ভেল, সব সুখ ঘুচি গেল
শোক-শেল বিন্ধল ছাতি ;
সূরয উজল কর বরখে নভস পর,
তবু সোই দীঘল রাতি।
কব বিহি শুভ দিঠি বিথারব তুঝ 'পর,
কব নিশি হোয়ব ভোর ?
কব তুহু মিঠি বুলি বরখি' হরখভরে,
হাম সবে লেয়বি কোর ?

—রায়, রাজকৃষ্ণ

সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৪র্থ খণ্ড, 'ভারতগান', গা-৭১, পৃঃ ৯২

২৪৪। মিশ্র বারোঁয়া—ঢিমেতেতালা

নম বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী,
যুগে যুগে জননী লোকপালিনী।
সুদূর নীলাম্বরপ্রান্ত সঙ্গে
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে;
চুমি পদধূলি বহে নদীগুলি;
রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিনী!
তাল-তমালদল নীরবে বন্দে,
বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে;
আনন্দে জাগ, অয়ি কাঙ্গালিনী:
কিসের দুঃখ মা গো, কেন এ দৈন্য,
শূন্য শিল্প তব, বিচূর্ণ পণ্য?
হা অন্ন, হা অন্ন, কাঁদে পুত্রগণ?
ডাক মেঘমন্ত্রে সুষুপ্ত সবে,
চাহ দেখি সেবা জননী-গরবে;
জাগিবে শক্তি; উঠিবে ভক্তি;
জান না আপনার সন্তানশালিনী!

—রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ

বন্দেমাতরম্, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, পৃঃ ১৩
বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৮৩৩-৩৪
জাতীয় সঙ্গীত, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ দাস, গা-৩২, পৃঃ ৯
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ১১০-১১
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-১৮
স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক নরেন্দ্রকুমার শীল, গা-৩৫
গীতিকা, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, পৃঃ ৩৬, কয়েকটি ছত্র ভিন্ন।
হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-৪৪, পৃঃ ১৫৩

২৪৫। রামপ্রসাদী সুর

তুই মা মোদের জগত-আলো।
সুখে দুখে, হাসিমুখে,
আঁধারে দীপ তুমিই জ্বালো।

মা ব'লে মা ডাক্‌লে তোরে,
সারাটি প্রাণ ওঠে ভ'রে,
বেসেছি মা তোরেই ভালো,
তোরেই যেন বাসি ভালো।
ওই কোলে মা পাই যদি ঠাঁই,
জনম জনম কিছুই না চাই,
থাক্ না ওদের গৌরব বরণ, (?)
হলেমই বা আমরা কালো।
পরের পোষাক খুলে ফেলে,
ফিরলাম ঘরে ঘরের ছেলে,
আঁখির নীরে মোদের শিরে
আশীষধারা আজি ঢালো।

—রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৮৩৩
জাতীয় সঙ্গীত, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ দাস, গা-২৬, পৃঃ ৩২
বন্দেমাতরম্, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, পৃঃ ৬৯
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-১২
স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক নরেন্দ্রকুমার শীল, গা-৪৪

২৪৬। মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ আজি জয়,
গাহ জয়, গাহ জয়, মাতৃভূমির জয়!
(একাধিক কণ্ঠে) জয় জয় জয়, মাতৃভূমির জয়!
(বহুকণ্ঠে) জন্মভূমির জয়, স্বর্ণভূমির জয়!
পুণ্যভূমির জয়, মাতৃভূমির জয়!
লক্ষমুখে ঐক্যগাথা রটাও জগতময়!
সুখ স্বস্তি স্বাস্থ্য স্বার্থ দিলাম তোমার পায়,
যতদিন মা তোমার বক্ষ জুড়ায়ে না যায়;
কে সুখে ঘুমায়, কে জেগে বৃথায়?

মায়ের চোখে অশ্রুধারা, সে কি প্রাণে সয়।
নূতন উষায় গাহে পাখী নূতন জাগান সুর ;
উঠ রানী কাঙ্গালিনী দুঃখ হ'ল দূর ;
অলস আঁখি মেল, মলিন বসন ফেল,
উঠ মা গো, জাগো জাগো ডাকে পুত্রচয়।

—রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ

বন্দেমাতরম্, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, পৃঃ ১২-১৩
বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৮৩৪
জাতীয় সঙ্গীত, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ দাস, গা-৫০, পৃঃ ৮
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ১১১
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৪
স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক নবেন্দ্রকুমার শীল, গা-৫

২৪৭। খট্ ভৈরবী—ঝাঁপতাল

পারি কি ভুলিতে ভারত রুধির,
বহি যতকাল রেখেছে শরীর ?
পারি কি ভুলিতে জীবন থাকিতে
প্রিয় জন্মভূমি, তব অশ্রুনীর ?
ধিক্ সে পাষণ্ড অকাল কুষ্মাণ্ড
তব আর্তনাদে যে জন বধির।

—শাস্ত্রী, শিবনাথ

জাতীয় সঙ্গীত, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ দাস, পৃঃ ৪১
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-১০০

২৪৮।

গভীর রজনী ! ডুবেছে ধরণী,
জাগ্ রে জাগ্ রে সাধের লেখনী !
প্রাণপ্রিয় ভাই ভারত-সন্তান !
জাগ্ রে সকলে শোন্ করি গান।
ভারতের গতি, ভারত-নিয়তি,
ভেবে আজ কেন, উথলিল প্রাণ !

কা'র কথা ভাবি, কোন্ দিক্ দেখি,
সব অন্ধকার যে দিকে নিরখি!
কোটি কোটি লোক অজ্ঞান-আঁধারে
চিরমগ্ন, যেন আছে কারাগারে;
দারিদ্র্য-ভাবনা, অসহ্য যাতনা,
শোণিত শুষিছে তাদের সংসারে,
নির্ব্বাক হইয়া কাঁদে পরস্পরে!

অভদ্র কি ভদ্র লোক শত শত
অনাহারে শীর্ণ দেখি অবিরত
না যেতে যৌবন তাদের নয়নে
বিষাদ নিরাশা দেখি এক মনে;
দারিদ্র্য-যাঁতায় প্রাণ পিষে যায়,
চূর্ণ আশা যত কঠোর ঘর্ষণে,
সে মুখ ভাবিলে ঘুমাই কেমনে?

কাজ কি ঘুমায়ে থাকি জাগরণে,
কাজ কি বিশ্রামে খাটি প্রাণপণে,
এ ঘোর দুর্দ্দশা ঘুমালে কি যায়!
বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ুক ধরায়,
তিল তিল ক'রে আয় যাই ম'রে;
বল বুদ্ধি মন মিলিয়া সবায়,
আয় ধরে দিই ভারতের পায়!

উৎসাহেতে পুড়ে মরিব আকালে,
তাও যদি হয়, হোক্ রে কপালে!
বুঝিয়াছি বেশ, দিতে হবে প্রাণ,
তবে রে জাগিবে ভারত-সন্তান!
আয় জন কত ধরি এই ব্রত
খাটিয়া জীবন করি অবসান,
তবে যদি জাগে ভারত-সন্তান!

আয় রে বোম্বাই! আয় রে মাদ্রাজ!
বৃথা গণ্ডগোলে নাহি কোন কাজ,

ভারতের তোরা অমূল্য রতন,
আয় সবে মিলে করি জাগরণ ;
মিলে পরস্পরে, দেশের উদ্ধারে
আয় দেখি সবে করি প্রাণপণ,
দেখি রে দুর্দ্দশা না যায় কেমন !

ভাই মহারাষ্ট্র ! তোমার কপালে,
পৌরুষের আভা আছে চিরকালে।
দাঁড়াও আসিয়া কাছে একবার,
মুখ দেখে আশা বাড়ুক আমার ;
সাহসের কথা, শুনে যাক্ ব্যথা,
প্রিয় ভারতের হোক রে উদ্ধার ;
জয় মহারাষ্ট্র জয় রে তোমার !

আয় রাজপুত, আয় প্রিয় শিখ,
জাতি-ধর্ম্ম-ভেদ সকলি অলীক,
ভারত-রুধির সবার শরীরে,
ভাই ব'লে নিতে তবে শঙ্কা কি রে !
আয় ভাই ব'লে দিব প্রাণ খুলে,
ভাই হ'য়ে রব তোদের মন্দিরে,
ক'রো না রে ঘৃণা ভীরু বাঙ্গালীরে।

পাইয়াছি শিক্ষা, পেয়েছি ত মান,
তোরা ভাই সব আছিস্ অজ্ঞান।
তা ব'লে ভেবো না করিব মমতা,
আর বলিব না সুশিক্ষার কথা,
তোদের যে গতি আমারো সে গতি,
তো'দিকে ফেলিয়া চাই না সভ্যতা,
সবে এক হ'য়ে থাকিব সর্বথা।

শেষে ডেকে বলি ওরে যুন ভাই,
প্রাচীন শত্রুতা প্রয়োজন নাই।
দেশের দুর্দ্দশা দেখ্ হলো ঢের,
তোরা ত সন্তান প্রিয় ভারতের।

সে শত্রুতা ভুলে আয় প্রাণ খুলে,
—পুতে রাখ্ কথা মশ্লেম্, কাফের—
বল শুধু—"মোরা প্রিয় ভারতের !"

ভারতের তোরা, তোদের আমরা,
আয় পূর্ণ হলো আনন্দের ভরা !
সবে এক দশা তবে অহঙ্কার,
তরে রে শত্রুতা শোভে না যে আর !
মিলি ভাই ভাই জয়ধ্বনি গাই,
ঘুরিয়া বেড়াই শুভ সমাচার,—
"আমাদের মাতা বাঁচিল আবার !"

—শাস্ত্রী, শিবনাথ

মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪৫-৪৭
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৪৯
বন্দেমাতরম্, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, গা-২১
স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক নরেন্দ্রকুমার শীল, গা-৪৫

২৪৯। ললিত—আড়া.

কালরাত্রি পোহাইল উদিল সুখ-স্বপন।
আর কি ভারতে যুবা রবে ঘুমে অচেতন ॥
দুখ শোক যার ঘরে, সে কি গো ঘুমাতে পারে,
তার কি উচিত কভু থাকে ঘুমে অচেতন।
অধীনতা কারাগারে, অজ্ঞানতা অন্ধকারে,
কোটি কোটি নারী নরে, উঠে কর দরশন ॥
কারার বন্দিনী প্রায়, বৃথা দিন চলে যায়,
রহিল পশ্চাতে পড়ে যত ভারত-ললনা।
বিধবার হাহাকারে, প্রাণ ফাটে ঘরে ঘরে,
রমণীর নেত্রাসারে ভাসিছে বিধুবদন।
যুবক যুবতী যত, পাশবদ্ধ পাখীর মত,
দারিদ্র্য-দুর্দ্দশাক্লেশ কত যে করে বহন ॥

বহু পরিবার লয়ে, অর্থাভাবে ম্লান হয়ে,
অশেষ যন্ত্রণা সয়ে বিষাদে কাটে জীবন।
এই সব মহাপাপে, এই সব মনস্তাপে,
পড়েছ কি অভিশাপে, আছ হয়ে বিচেতন॥
করো না হে অবহেলা, নাহি ঘুমাবার বেলা,
বিধাতা ডাকিছেন দ্বারে, উঠ হে মেল নয়ন॥

—শাস্ত্রী, শিবনাথ

বাঙ্গালীর গান, সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃঃ ৮৫১
জাতীয় সঙ্গীত, 'ভারত সঙ্গীত', সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গা, ৩১৫৪,
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-৬০

২৫০। প্রসাদী সুর—একতালা

"স্বদেশীর গান"

মা! আমি স্বদেশী হ'ব।
ওমা বিদেশীর কাছে না যা'ব॥
বিদেশীর বিষম মায়ায় কতকাল আচ্ছন্ন রব?
তোর চরণ-ধূলি, শিরে তুলি, সে মায়া কাটায়ে দিব।
তোর সদাব্রতে সদাই তুষ্ট,
পশু-পক্ষী আদি সব,
পোড়া পেটের জ্বালায় আমিই কেন চাকুরী কুকুরী লব?
ভ্রমে প'ড়ে আর কভু না ভরমের ভিখারী হ'ব,
নামে উপাধি, দেহে ব্যাধি
ল'য়ে কি কাল কাটাইব?
লক্ষ্মীগোলায় লক্ষ্মীরূপার লক্ষ মন্দির উঠাইব,
তুমি অন্নপূর্ণা—তোমার ছেলে অন্নের জন্য না কাঁদিব॥[১]

—সরকার, অক্ষয়চন্দ্র

অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮১৯

১ "বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে রাখীবন্ধন ও অরন্ধনদিবসে চুঁচুড়ার পথে পথে শোকযাত্রায় গীত হইয়াছিল।"

২৫১। মিশ্র, কাহার্‌বা

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নত-শির, নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ-জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান,—হবে জয়।
নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্;
দেখিয়া ভারতে মহা-জাতির উত্থান—জগজন মানিবে বিস্ময়!
তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন!
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন—ঐ দেখ প্রভাত-উদয়!
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে, বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে—সত্যের নাহি পরাজয়॥

সেন, অতুলপ্রসাদ

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, সম্পাদক মুখোপাধ্যায় এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৬৩
ব্রহ্মসঙ্গীত, গা-৮১২, পৃঃ ৪০১
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ১০৭

২৫২।

মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা!
কি যাদু বাংলা গানে! গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
(এমন কোথা আর আছে গো।)
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা॥
ঐ ভাষাতেই নিতাই গোরা, আনল দেশে ভক্তি-ধারা,
(মরি হায়, হায় রে!)
আছে কৈ এমন ভাষা এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা॥

বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন ;
(আরও কত মধুপ গো !)
ঐ ফুলেরই মধুর রসে বাঁধলো সুখে মধুর বাসা ॥
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আনলো মালা জগৎ জিনে,
(গরব কোথায় রাখি গো !)
তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-আসা ॥
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাক্‌নু মায়ে 'মা', 'মা' ব'লে ;
ঐ ভাষাতেই বল্‌বো হরি, সাঙ্গ হ'লে কাঁদা হাসা ॥

—সেন, অতুলপ্রসাদ

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, সম্পাদক মুখোপাধ্যায় এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৬৩-৬৪

২৫৩ । মিশ্র খাম্বাজ

ভারত-ভানু কোথা লুকালে
পুনঃ উদিবে কবে পূরব-ভালে ?
হারে বিধাতা, সে দেবকান্তি
কালের গর্ভে কেন ডুবালে ?

আছে অযোধ্যা, কোথা সে রাঘব ?
আছে কুরুক্ষেত্র, কোথা সে পাণ্ডব ?
আছে নৈরঞ্জনা, কোথা সে মুক্তি ?
আছে নবদ্বীপ, কোথা সে ভক্তি ?
আছে তপোবন, কোথা সে তপোধন ?
কোথা সে কালা কালিন্দী-কূলে ?

পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে ;
নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে ।
কোথা সে বীরেন্দ্র সুর দানবারি ?
কোথা সে বিদুষী তাপসী নারী ?
সিংহের দেশে বিচরিছে শিবা,
বীর্য বিড়ম্বিত খল কোলাহলে ।

নানক গৌরাঙ্গ শাক্যের জাতি—
নাহিক সাম্য ভেদে আত্মঘাতী।
ধর্মের বেশে বিহরে অধর্মী।
কোথা সে ত্যাগী, প্রেমী ও কর্মী ?
কোথা সে জাতি যাহারে বিশ্ব
পূজিত কালের প্রভাতকালে ?

—সেন, অতুলপ্রসাদ

গীতিগুচ্ছ, স্বর্ণকুমারী দেবী, গা-৮১, পৃঃ ৯৯-১০০

২৫৪। মিশ্র কাওয়ালী (সুর—ইংরাজী)

"স্বদেশ"

উঠ গো, ভারত-লক্ষ্মী, উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা,
দুঃখ দৈন্য সব নাশি করো দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড়ো গো ছাড়ো শোকশয্যা, করো সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে!
জননী গো, লহো তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলে চক্ষে ;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো। ১
কাণ্ডারি নাহিক কমলা, দুখলাঞ্ছিত ভারতবর্ষে ;
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে।
তোমার অভয় পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে,
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে।
জননী গো, লহো তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলে চক্ষে ;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো। ১

ভারত-শ্মশান করো পূর্ণ পুনঃ কোকিল-কূজিত কুঞ্জে,
দ্বেষ-হিংসা করি চূর্ণ করো পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে,
দূরিত করি পাপ-পুঞ্জে, তপঃ-ভুঞ্জে,
পুনঃ বিমল করো ভারত পুণ্যে।
জননী গো, লহো তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলে চক্ষে ;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো। ১

মিশ্র

১ অথবা

জননী, দেহো তব পদে ভক্তি,
দেহো নব আশা, দেহো নব শক্তি ;
এক সূত্রে করো বন্ধন আজ
ত্রিংশতি কোটি দেশবাসীজনে।

—সেন, অতুলপ্রসাদ

শতগান, সরলা দেবী, গা-৫২, পৃঃ ১৩৩
জাতীয় সঙ্গীত, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ দাস, গা-১২, পৃঃ ৬
বন্দেমাতরম্, সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ সরকার, পৃঃ ১৫-১৬
মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পৃঃ ১০৮
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-২০
হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-২৮, পৃঃ ১৩৯
ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, সম্পাদক মুখোপাধ্যায় এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৬১

২৫৫। মিশ্র খাম্বাজ

বলো বলো বলো সবে, শত-বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার, পুরাতন এ পুরবে।

আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী ;
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী,—
এখনো অমৃতবাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা বন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন,
কহিছে গৌরবকাহিনী।
বলো বলো বলো সবে, ... পুরাতন এ পুরবে।
বিদুষী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী
সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি,—
আমরা তাঁদেরই সন্ততি।
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান,
পতি-পুত্র-তরে সুখে ত্যজে প্রাণ,
আমরা তাঁদেরই সন্ততি।
বলো বলো বলো সবে, ... পুরাতন এ পুরবে।
ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা,
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা ;
নানক নিমাই করেছিল ভাই
সকল ভারত-নন্দনে।
ভুলি ধর্ম-দ্বেষ জাতি-অভিমান
ত্রিশ কোটি দেহ হবে এক-প্রাণ,
এক-জাতি-প্রেম-বন্ধনে।
বলো বলো বলো সবে, ... পুরাতন এ পুরবে।
মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে,
ঋষি-রাজকুল জন্মেনি মিছে ;
দুদিনের তরে হীনতা সহিছে,
জাগিবে আমার জাগিবে।
আসিবে শিল্প ধনবাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা বিনয় বীর্য,
আসিবে আবার আসিবে।

বলো বলো বলো সবে, ... পুরাতন এ পুরবে।
এসো হে কৃষক কুটিরনিবাসী,
এসো অনার্য গিরিবনবাসী,
এসো হে সংসারী, এসো হে সন্ন্যাসী,
মিল' হে মায়ের চরণে।
এসো অবনত, এসো হে শিক্ষিত,
পর-হিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,
মিল' হে মায়ের চরণে।
এসো হে হিন্দু, এসো মুসলমান,
এসো হে পারসী, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান,
মিল' হে মায়ের চরণে।

—সেন, অতুলপ্রসাদ

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, সম্পাদক মুখোপাধ্যায় এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৬১-৬২

মাতৃবন্দনা, সম্পাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ১০৫

২৫৬। বাউল

প্রবাসী, চল্ রে দেশে চল্ ;
আর কোথায় পাবি এমন হাওয়া, এমন গাঙের জল !
যখন ছিলি এতটুক্,
সেথাই পেলি মায়ের সুধা ঘুম-পাড়ানো বুক ;
সেথাই পেলি সাথির সনে বাল্যখেলার সুখ ;
যৌবনেতে ফুটল সেথাই হৃদয় শতদল।—
প্রবাসী চল্‌রে দেশে চল্।
হরির লুটের বাতাসা, আর পৌষ মাসের পিঠা,
পীরের সিন্নি, গাজির গান, আর করিম-ভাইয়ের ভিটা,
আহা মরি সেই স্মৃতি আজ লাগছে কত মিঠা।
শিউলি, বেলি, কদম, চাঁপা এমন কোথায় বল্।—
প্রবাসী চল্‌রে দেশে চল্।

মনে পড়ে দেশের মাঠে খেত-ভরা সব ধান,
মনে পড়ে তরুণ চাষির করুণ বাঁশির তান,
মনে পড়ে পুকুর-পাড়ে বকুল গাছের গান,
মনে পড়ে আকাশ-ভরা মেঘ ও পাখির দল।—
প্রবাসী, চল্ রে দেশে চল্।

—সেন, অতুলপ্রসাদ

গীতিগুচ্ছ, স্বর্ণকুমারী দেবী, পরিশিষ্ট, গা-১, পৃঃ ২২৯

২৫৭।

বাধাবিঘ্ন কত শত শত, করিতে মা তোর চরণ বন্দন।
চাহি মা! গাহিতে তব গুণ গান,
কিন্তু তাহে রাজশাসন ভীষণ।
বন্দেমাতরম্ ধ্বনি যে বা করে,
রাজদ্রোহী নাকি হয় সে বিচারে,
বাঁধে তারে চরে, রাখে কারাগারে,
পলে পলে করে কত নির্যাতন।
কহিতে ভারত-জননী জয়, শ্বেতাঙ্গের হয় অশান্তির উদয়,
যে কহে, তাহার যাতনা অপার, মা বলিতে কার এ বিড়ম্বন।
কে আছে মা তোর ভকত-সন্তান,
কে সঁপিছে তব পদে মনপ্রাণ,
শত গুপ্তচরে করে তার সন্ধান,
কত অপরাধী যেন সেই জন!
বুক ফেটে যায়, মুখ ফুটে তাই,
বলিতে ভারতে কারো সাধ্য নাই,
নিত্য নীরবে সহিতেছে সবে, মলিন বদনে মরম বেদন।

—সেন, গিরিশচন্দ্র

হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-৪৯, পৃঃ ১৫৬

২৫৮।

হিন্দু মুসলমান, হয়ে এক প্রাণ এস পূজি মার চরণ দুখানি
মর্মে বাজে ব্যথা, জন্মভূমি মাতা আমাদের আজ দোষে কাঙ্গালিনী

মাতৃসেবা মহাপুণ্যেরই অভাবে কি দুর্গতি আজ দেখ ভাই ভেবে
মাতা অন্নপূর্ণা, একি বিড়ম্বনা—অন্নাভাবে মরে লক্ষ লক্ষ প্রাণী
বর্ষে বর্ষে তায় দুর্ভিক্ষ পীড়ন, বর্ষশস্যে হয় ত্রিবর্ষ যাপন
কারে বা বলিব, কে বুঝে বেদনা, কেহ নাই আর বিনা কাত্যায়নী।
ওঠ ওঠ ভাই, থেক না অলসে, মাতৃসেবা ব্রত লহ রে হরষে ;
মার আশীর্বাদে, রব নিরাপদে, সম্পদে বিপদে কর মা-মা ধ্বনি!
ব্রতের নিয়ম শুন দিয়া মন—'একতা' 'সংযম' অতি প্রয়োজন,
স্বদেশ বাণিজ্যে উন্নতি সাধন ভুল না একথা মূলমন্ত্র জানি।
স্বদেশী দ্রব্যেতে জীবন যাপন, প্রতিজনে কর প্রতিজ্ঞা এখন,
প্রতি ঘরে ঘরে লহ সমাদরে স্বদেশীয় দ্রব্য উপাদেয় মানি।
'হুজুগে বাঙালী' বলে সবজন, এ কলঙ্ক ভাই করহ মোচন ;
'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' কার্যে পরিণত কর সিদ্ধবাণী।
শক্তিরূপা মাতা শক্তির আকর পূজ ভক্তিভরে জুড়ি দুই কর ;
মা প্রসন্না হলে কিসে আর ডর আদ্যাশক্তি মাতা অসুরঘাতিনী॥

—সেন, দেবেন্দ্রনাথ

হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-১৬, পৃঃ ১২৫-২৬

২৫৯। ৲ সংকীর্তন—গড় খেমটা

"মিলন"

আয় ছুটে ভাই, হিন্দু-মুসলমান!
ঐ দেখ্ ঝরছে মায়ের দু'নয়ান
আজ, এক ক'রে সে সন্ধ্যা নমাজ,
মিশিয়ে দে আজ, বেদ কোরাণ!
(জাতিধর্ম্ম ভুলে গিয়ে রে) (হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে রে)
থাকি একই মায়ের কোলে, করি
একই মায়ের স্তন্যপান।
(এক মায়ের কোল জুড়ে আছি রে) (এক মায়ের দুধ খেয়ে বাঁচি রে)
আমরা পাশাপাশি, প্রতিবাসী,
দুই গোলারি একই ধান।
(একই ক্ষেতে সে ধান ফলে রে) (একই ভাতে একই রক্ত ব'য়ে যায়)

এক ভাই না খেতে পেলে,

কাঁদে না কোন্ ভায়ের প্রাণ ?

(এমন পাষাণ কেবা আছে রে) (এমন কঠিন কেবা আছে রে)

বিলেত ভারত দু'টো বটে, দুয়েরি এক ভগবান্ ।

(দুই চ'খে যে দু'দেশ দেখে না) (তার কাছে তো সবাই সমান রে)

—সেন, রজনীকান্ত

কান্তবাণী, সম্পাদিকা দীপ্তি ত্রিপাঠী, পৃঃ ৩৩-৩৪

২৬০ । বেহাগ—খাম্বাজ/তেওরা মূলতান—গড় খেম্‌টা

"সংকল্প"

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়

মাথায় তু'লে নে রে ভাই ;

দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের

তার বেশি আর সাধ্য নাই ।

ঐ মোটা সূতোর সঙ্গে, মায়ের

অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই ;

আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ

পরের দ্বারে ভিক্ষা চাই ।

ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের

সবার প্রচুর অন্ন নাই ;

তবু, তাই বে'চে কাচ, সাবান, মোজা,

কিনে কল্লি ঘর বোঝাই ।

আয় রে আমরা মায়ের নামে

এই প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ব ভাই ;

পরের জিনিস কিন্‌ব না, যদি

মায়ের ঘরের জিনিস পাই ।

—সেন, রজনীকান্ত

কান্তবাণী, রজনীকান্ত সেন, সম্পাদিকা দীপ্তি ত্রিপাঠী, পৃঃ ৪০-৪১
জাতীয় সঙ্গীত, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ দাস, পৃঃ ২৯
সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৭ম খণ্ড, সংখ্যা ৭৯, পৃঃ ১২
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-১৫
স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক নরেন্দ্রকুমার শীল, গা-১৮
হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-২৫, পৃঃ ১৩৬-৩৭
রজনীকান্তের গান, সম্পাদক মনোরঞ্জন সেন, গা-১৫, পৃঃ ৪০

২৬১।

জংলা—কাহারোয়া

"তাই ভালো"

তাই ভালো, মোদের
মায়ের ঘরের শুধু ভাত ;
মায়ের ঘরের ঘি-সৈন্ধব,
মার বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান ;
মোটা হোক্, সে সোনা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান।
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান!
মিহি কাপড় প'রব না আর যেচে পরের কাছে ;
মায়ের ঘরের মোটা কাপড় প'র্‌লে কেমন সাজে।
দেখ্‌তো প'রলে কেমন সাজে।
ও ভাই চাষী, ও ভাই তাঁতী, আজকে সুপ্রভাত ;
ক'সে লাঙ্গল ধর ভাই রে, ক'সে চালাও তাঁত।
ক'সে চালাও ঘরের তাঁত।

—সেন, রজনীকান্ত

কান্তবাণী, সম্পাদিকা দীপ্তি ত্রিপাঠী, পৃঃ ৪১
জাতীয় সঙ্গীত, গা-২৫, পৃঃ ৪৮। রচয়িতার নাম নেই।
বন্দেমাতরম্, পৃঃ ৭০। রচয়িতার নাম নেই।
জাতীয় উচ্ছ্বাস, সম্পাদক জলধর সেন, গা-১৬
স্বদেশী সঙ্গীত, সম্পাদক নরেন্দ্রকুমার শীল, গা-১৯

২৬২।

রাগিণী জংলা—তাল খেম্‌টা

"হুকুম"

ফুলার কল্লে হুকুম জারি,—
মা ব'লে যে ডাকবে রে তার শাস্তি হবে ভারি।

মা ব'ল্লে ভাই ডাকলে মাকে ধ'রবে টিপে গলা?
তবে কি ভাই বাঙ্গলা হ'তে উঠবে রে মা বলা?
যে দিয়েছে এমন হুকুম মা কিরে নাই তারি?
তার মাকে কি ডাকে না সে? দোষ শুধু বাঙ্গলারি?

মা বলা যে পাপের কার্য্য শুনিনি ত' কভু।
মা বলা যে বন্ধ করে সেই বা কেমন প্রভু ?
বিচার ক'র হে ভগবান্ দীনের দুঃখহারি।
তুমিই বল, মা'ল্লে কি আর মা ডাক ছাড়তে পারি ?

বন্দেমাতরম্ ত' শুধু মায়ের বন্দনাই,
এতে তো ভাই সেডিমনের নাম কি গন্ধ নাই ;
তবে কেন তা' নিয়ে ভাই এত মারামারি ?
হাজার মার, মা বলা ভাই কেমন ক'রে ছাড়ি ?

—সেন, রজনীকান্ত

কান্তবাণী, সম্পাদিকা দীপ্তি ত্রিপাঠী, পৃঃ ৬২-৬৩

২৬৩। ভৈরবী, কাওয়ালী

"ভারতভূমি"

শ্যামল-শস্য-ভরা।
চির শান্তি-বিরাজিত, পুণ্যময়ী ;
ফল-ফুল-পূরিত, নিত্য সুশোভিত,
যমুনা-সরস্বতী-গঙ্গা-বিরাজিত ॥
ধূর্জটী-বাঞ্ছিত-হিমাদ্রি-মণ্ডিত,
সিন্ধু-গোদাবরী-মাল্য-বিলম্বিত,
অলিকুল-গুঞ্জিত-সরসিজ রঞ্জিত ॥
রাম-যুধিষ্ঠির-ভূপ-অলঙ্কৃত,
অর্জুন-ভীষ্ম-শরাসন-টঙ্কৃত,
বীর প্রতাপে চরাচর শঙ্কিত।
সামগান-রত-আর্য-তপোধন,
শান্তি-সুখান্বিত কোটী তপোবন,
রোগ-শোক-দুখ পাপ-বিমোচন ॥
ওই সুদূরে সে নীর-নিধি,—
যার, তীরে হের, দুখ-দিগ্ধ-হৃদি,
কাঁদে, ওই সে ভারত, হায় বিধি।

—সেন, রজনীকান্ত

কান্তবাণী, সম্পাদিকা দীপ্তি ত্রিপাঠী, পৃঃ ৪-৫

২৬৪ । ভৈরবী, ত্রিতাল

ভারতকাব্যনিকুঞ্জে—
জাগ সুমঙ্গলময়ি মা।
মুঞ্জরি তরু, পিক গাহি
করুক প্রচারিত মহিমা ॥
তুলে লহ নীরব বীণা, গীতহীনা,
অতি দীনা ;—
হের ভারত, চির-দুখ-শয়ন-বিলীনা ;
নীতি-ধর্ম্মময় দীপক মন্ত্রে,
জীবিত কর সঞ্জীবন মন্ত্রে,
জাগিবে রাতুল-চরণ-তলে
যত লুপ্ত পুরাতন গরিমা ॥

—সেন, রজনীকান্ত

কান্তগীত-লিপি, সম্পাদক প্রফুল্লকুমার দাস, গা-১, পৃঃ ১
রজনীকান্তের গান, সম্পাদক মনোরঞ্জন সেন, গা-১২, পৃঃ ৩৪

২৬৫ । কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর—গড় খেম্‌টা

"শেষ কথা"

বিধাতা আপনি এসে পথ দেখা'লে
তাই কি তোরা ভুল্‌বি ?
বিধাতা আপনি এসে জাগিয়ে দিলে,
তাও কি ঘুমে ঢুল্‌বি ?
বিধাতা, ওদের দোকান বন্ধ ক'ল্লে,
তোরা কি তাই খুলবি ?
বিধাতা সোনার মাটী দেখিয়ে দিলে,
তাও কি শূন্যে ঝুলবি ?
বিধাতা পণ করা আজ শিখিয়ে দিলে,
তবু কি ভাই ভুলবি ?

বিধাতা মনের কথা চা'পতে ব'লে
তাও খুঁচিয়ে তুলবি ?
বিধাতা এত মানা ক'চ্ছে, তবু
দুধে তেঁতুল গুলবি ?
বিধাতা ধান দিয়েছে, উপোষ থেকে
পথে পথে বুলবি ?

—সেন, রজনীকান্ত

কান্তবাণী, সম্পাদিকা দীপ্তি ত্রিপাঠী, পৃঃ ৬৩-৬৪

২৬৬। "রে গঙ্গামাই—প্রাতে দরশন—দে—" সুর, কাহারোয়া

"তাঁতী ভাই"

রে তাঁতী ভাই, একটা কথা মন লাগিয়ে শুনিস্ ;
ঘরের তাঁত যে ক'টা আছে রে,
তোরা স্ত্রী-পুরুষে বুনিস্।
এবার যে ভাই তোদের পালা,
ঘরে ব'সে, ক'সে মাকু চালা ;
ওদের কলের কাপড় বিশ হবে রে,—
না হয় তোদের হবে উনিশ !
তোদের সেই পুরানো তাঁতে ;
কাপড় বুনে দিবি নিজের হাতে ;
আমরা মাথায় ক'রে নিয়ে যাব রে,—
টাকা ঘরে ব'সে গুণিস্।

—সেন, রজনীকান্ত

কান্তবাণী, সম্পাদিকা দীপ্তি ত্রিপাঠী, পৃঃ ৩৪-৩৫

২৬৭। মিশ্র পরোজ, কাওয়ালী

জয় জয়, জনমভূমি, জননি।
যাঁর, স্তন্যসুধাময় শোণিত ধমনী ;
কীর্তি-গীতিজিত, স্তম্ভিত, অবনত,
মুগ্ধ, লুব্ধ, এই সুবিপুল ধরণী।
উজ্জ্বল-কানন-হীরক-মুক্তা
মণিময় হার-বিভূষণ-যুক্তা ;
শ্যামল-শস্য পুষ্প-ফল-পূরিত,
সকল-দেশ-জয়-মুকুটমণি।
সর্ব শৈল-স্থিত, হিমগিরি শৃঙ্গে,
মধুর-গীতি-চির-মুখরিত ভৃঙ্গে,
সাহস-বিক্রম-বীর্য-বিমণ্ডিত,
সঞ্চিত-পরিণত-জ্ঞান-খনি!
জননী-তুল্য তব কে মর-জগতে ?
কোটী কণ্ঠে কহ, "জয় মা! বরদে!"
দীন বক্ষ হ'তে, তপ্ত রক্ত তুলি'
দেহ পদে, তবে ধন্য গণি!

—সেন, রজনীকান্ত

হাজার বছরের বাংলা গান, সম্পাদক প্রভাতকুমার গোস্বামী, গা-২৬, পৃঃ ১৩৭-৩৮

২৬৮। সুরটমল্লার—একতালা

"বঙ্গমাতা"

নমো নমো নমো জননি বঙ্গ!
উত্তরে ঐ অভ্রভেদী,
অতুল, বিপুল, গিরি অলঙ্ঘ্য!
দক্ষিণে সুবিশাল জলধি,
চুম্বে চরণতল নিরবধি,
মধ্যে পূত-জাহ্নবী-জল-
ধৌত শ্যাম-ক্ষেত্র সঙ্ঘ

বনে বনে ছুটে ফুল-পরিমল,
প্রতি সরোবরে লক্ষ কমল,
অমৃতবারি সিঞ্চে, কোটি
তটিনী, মত্ত, খর-তরঙ্গ ;
কোটি কুঞ্জে মধুপ গুঞ্জে ;
নব কিশলয় পুঞ্জে পুঞ্জে,
ফল-ভর-নত শাখি-বৃন্দে
নিত্য শোভিত অমল অঙ্গ !

—সেন, রজনীকান্ত

কান্তবাণী, সম্পাদিকা দীপ্তি ত্রিপাঠী, পৃঃ ২৫-২৬

২৬৯ ।

মুলতান—জলদ একতালা
("সদা দয়াল দয়াল ব'লে"—সুর)

"বঙ্গ বিভাগ"

এমন সোনার বাংলা ভাগ ক'রে ভাই
ক'ল্লে রে দু'খান্ ।
এত ঝগড়াঝাটি, কান্নাকাটি রে—
সবই বিফল হ'ল গল্‌লো না পাষাণ ।
এদের একই ভাষা, একই রীতি নীতি,
একই রুচি, একই স্বভাব, প্রাণে এক প্রীতি ;
এরা একই ঘরে বসত করে রে,—
এদের পরস্পরের দুঃখ সুখ সমান ।
দু' সীমানা কল্লে কি হবে ?
হাত বাঁধিবে, পা বাঁধিবে, মন বাঁধিবে কে ?
আমরা একই ছিলাম একই আছি রে,—
ওকে, উড়িয়ে দিতে পারে প্রাণের টান্ ?
জ্ঞানী লোকে দে'খে বুঝে লয় ।

যে মেঘেতে বজ্র থাকে, তাতেই বৃষ্টি হয় ;
দেখ নিরেট মন্দ নাই এ সংসারে,—
অতি মন্দ যেটা, সেটাও সুবিধান।

—সেন, রজনীকান্ত

কান্তবাণী, রজনীকান্ত সেন, সম্পাদিকা দীপ্তি ত্রিপাঠী, পৃঃ ৬০

২৭০। বসন্তমিশ্র—গড় খেম্‌টা

"উদ্দীপনা"

তোরা আয়রে ছুটে আয় ;
ঘুমের মা আজ জে'গে উঠে ছেলে দেখতে চায়।
সরা' ফুল বেলের পাতা, নোয়া' সাতকোটি মাথা,
প্রাণের ভক্তি, দেহের শক্তি, ঢাল্‌রে মায়ের পায়।
মা যে ভাই ঢের কেঁদেছে, কেঁদে কেঁদে বুক বেঁধেছে,
আঁখির কোণে আজকে একটু হাসির রেখা ভায়।
এমন দিন আর কি পাবি ? হেলা ক'রে তাই হারাবি ?
থাক পড়ে সব ছোট স্বার্থ, যোগ যে বয়ে যায়।
বল্‌ "জয় শুভঙ্করী, জয় রাজরাজেশ্বরী !"
দীনদুখিনী ভিখারিনী কে বলে আজ মায় ?
ছোট বড় কেউ থেকো না পিছু থেকে কেউ ডেকো না,
"জয় মা !" বলে সাত কোটি সুর উঠুক মেঘের গায়।

—সেন, রজনীকান্ত

কান্তবাণী, রজনীকান্ত সেন, সম্পাদিকা দীপ্তি ত্রিপাঠী, পৃঃ ৬২

২৭১। মিশ্র বারোয়াঁ—কাওয়ালী

আমরা নেহাৎ গরিব, আমরা নেহাৎ ছোট,
তবু, আজি সাত কোটী ভাই, জেগে ওঠ।
জু'ড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান,
বিদেশে না যায় ভাই, গোলারি ধান ;

মোটা খাব ভাই রে প'রব মোটা,
মাখবো না ল্যাভেণ্ডার, চাইনে অটো।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দু'য়ে,
আমরা, রব কি উপোসী, ঘরে শুয়ে?
হারাস্ নে ভাই রে, আর এমন সুদিন
মায়ের পায়ের কাছে এসে জোটে।
ভাইরে ঘরের দিয়ে, আমরা পরের মেঙ্গে
কিন্‌বো না ঠুনকো কাচ, যায় যে ভেঙ্গে;
* শোন বিদেশি, আমরা আজ বুঝেছি সব—
তোমরা খেলনা দিয়ে মোদের সোনা লোটো।

—সেন, রজনীকান্ত

জাতীয় সঙ্গীত, সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ দাস, পৃঃ ৪৫
সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৭ম খণ্ড, সংখ্যা ৭৯, পৃঃ ২৩ * শেষের চরণ দু'টি পৃথক এখানে আছে—"থাক্‌লে, গরীব হ'য়ে, ভাই রে, গরীব চালে,
তাতে হবে নাকো মান খাটো।"
কান্তগীত-লিপি, দিলীপকুমার রায়—সংকলিত, প্রফুল্লকুমার দাস—সম্পাদিত,
গা-৭, পৃঃ ১৪

২৭২। মিশ্র ললিত, একতাল

সেথা আমি কি গাহিব গান?
যেথা, গভীর ওংকারে সামঝংকারে
কাঁপিত দূর বিমান।
যেথা, সুর-সপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী শুভ্র কমলাসীনা,
রোধি' তটিনী-জল-প্রবাহ
তুলিও মোহন তান।
যেথা, আলোড়ি' চন্দ্রালোক শারদ,
করি হরিগুণ-গান নারদ;
মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন,
টলাইত ভগবান।

যেথা, যোগীশ্বর পুণ্য-পরশে,
মূর্ত রাগ উদিল হরষে ;
মুগ্ধ কমলাকান্ত-চরণে
জাহ্নবী জনম পান।
যেথা, বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে,
মুরলী-রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি ফুটিত কুসুম,
যমুনা যেত উজান।
আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ ?

—সেন, রজনীকান্ত

রজনীকান্তের গান, সম্পাদক, মনোরঞ্জন সেন, গা-১৮, পৃঃ ৪৭

২৭৩। কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর—গড় খেমটা

"মাভৈঃ"

আর কিসের শঙ্কা, বাজাও ডঙ্কা ; প্রেমেরি গঙ্গা বো'ক ;
মায়েরি রাজ্যে, মায়েরি কার্য্যে, ফুটেছে আজ যে চোখ্।
মা যে, রাজার কন্যা, জগত-মান্যা, ধনে ও ধান্যে ভরা ;
অমৃতস্নিগ্ধ, মায়েরি দুগ্ধ, পানে মুগ্ধ ধরা ;
মায়েরি রাজ্যে, মায়েরি কার্য্যে, ছুটেছে আজ যে লোক,
একই লক্ষ্য, প্রীতি, সখ্য, প্রাণেরি ঐক্য হো'ক।
হও, কর্ম্মে বীর বাক্যে ধীর, মনে গভীর ভাব ;
সে অপদার্থ, যে পরমার্থ ভাবে স্বার্থ-লাভ ;

মায়েরি রাজ্যে, মায়েরি কার্য্যে, ঘুচেছে আজ যে শোক ;
হবে সমৃদ্ধি, শক্তিবৃদ্ধি, ছে'ড় না সিদ্ধি-যোগ।

—সেন, রজনীকান্ত

কান্তবাণী, সম্পাদিকা দীপ্তি ত্রিপাঠী, পৃঃ ৫৯

রজনীকান্তের অন্ততঃ সাতটি গান সে যুগের প্রেস আইনে বর্জিত হয়েছিল যা গানগুলির জনপ্রিয়তা সূচিত করে। গানগুলির নাম মাভৈঃ, বঙ্গ বিভাগ, উদ্বোধন, বিচার, উদ্দীপনা, হুকুম, শেষ কথা।

('সূচনা'—কান্তবাণী, সম্পাদিকা দীপ্তি ত্রিপাঠী, পৃঃ ৮)

ক্রোড়পঞ্জী—১

যে ১০০টি গান বিশেষভাবে আলোচনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তাদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা

১। অতীত-গৌরববাহিনী মম বাণি ! ... সরলা দেবী
২। অয়ি বিষাদিনী বীণা ... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩। অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, মা, ... ,,
৪। আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি ... ,,
৫। আজি এ ভারত লজ্জিত হে ... ,,
৬। আজি শৃঙ্খলে বাজিছে ... নজরুল ইসলাম
৭। আজি মঙ্গল মোহন তানে ভারত যশ গাও রে ... অশ্বিনীকুমার দত্ত
৮। আমি দশহাজার প্রাণ যদি পেতাম .. মুকুন্দদাস
৯। আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে ... রবীন্দ্রনাথ
১০। আমরা নেহাৎ গরীব, ... রজনীকান্ত
১১। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি ... রবীন্দ্রনাথ
১২। আমার সোনার হিন্দুস্থান ... নজরুল ইসলাম
১৩। আমার শ্যামলা বরণ বাঙ্‌লা মায়ের ... ,,
১৪। আর কিসের শঙ্কা, ... রজনীকান্ত
১৫। আসি ভারতভূমে, একবার দেখে যাও আর্য্যগণ .. অজ্ঞাত (হিন্দুমেলা)
১৬। আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে ... রবীন্দ্রনাথ
১৭। উঠ গো ভারতলক্ষ্মী, উঠ আদি জগত ... অতুলপ্রসাদ
১৮। একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন ... রবীন্দ্রনাথ
১৯। এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি ... ,,
২০। একবার তোরা মা বলিয়া ডাক ... ,,
২১। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে ... ,,
২২। এস, দেশের অভাব ঘুচাও দেশে ... কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ
২৩। এমন সোনার বাংলা ভাগ করে ... রজনীকান্ত
২৪। এস মা ভারত-জননী ... নজরুল ইসলাম
২৫। এই শিকল-পরা ছল মোদের ... ,,

২৬। এস হে ভারতবাসী প্রীতির কুসুমহারে ... গোবিন্দচন্দ্র দাস

২৭। ওরে শশী কি দেখিস্ আর এ ভারতভুবনে ... অশ্বিনীকুমার দত্ত

২৮। ও আমার দেশের মাটি ... রবীন্দ্রনাথ

২৯। ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ... ”

৩০। কতকাল পরে, বল ভারত রে ... গোবিন্দচন্দ্র রায়

৩১। কি আনন্দধ্বনি উঠল বঙ্গভূমে ... মুকুন্দদাস

৩২। কারার ঐ লৌহকপাট ... নজরুল ইসলাম

৩৩। কেন চেয়ে আছ, গো মা, ... রবীন্দ্রনাথ

৩৪। কোথা সে অযোধ্যাপুর, মথুরা ... রাজকৃষ্ণ রায়

৩৫। কোথায় রহিলে সব, ভারতভূষণ ... আনন্দচন্দ্র মিত্র

৩৬। গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ওই ... নজরুল ইসলাম

৩৭। গাওরে ভারতসঙ্গীত ... কালীপ্রসন্ন ঘোষ

৩৮। চল্ চল্ চল্ ঊর্দ্ধ-গগনে বাজে মাদল ... নজরুল ইসলাম

৩৯। ছেড়ে দেও কাঁচের চুড়ি বঙ্গনারী ... মুকুন্দদাস

৪০। জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে .. রবীন্দ্রনাথ

৪১। জননী জন্মভূমি স্বর্গ তুমি মহীতলে ... কালীপ্রসন্ন ঘোষ

৪২। জয় জয় জনমভূমি, জননি, ... রজনীকান্ত

৪৩। জাগ গো জাগ জননী ... মুকুন্দদাস

৪৪। জ্বালাও ভারত-হৃদে উৎসাহ অনল ... দ্বিজেন্দ্রলাল

৪৫। তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত ... রজনীকান্ত

৪৬। তুমি ত মা সেই ... দ্বিজেন্দ্রলাল

৪৭। তুই মা মোদের জগত আলো ... প্রমথ রায়চৌধুরী

৪৮। তোমাদের এ কি বিবেচনা ... রাজকৃষ্ণ রায়

৪৯। তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন ... কামিনী রায়

৫০। তোমারি তরে, মা, সঁপিনু দেহ ... রবীন্দ্রনাথ

৫১। তোরা আয়রে ছুটে আয় ... রজনীকান্ত

৫২। ত্রিংশ কোটি তব সন্তান ... নজরুল ইসলাম

৫৩। দিনের দিন্ সবে দীন ... মনোমোহন বসু

৫৪। দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার ... নজরুল ইসলাম

৫৫। দেশ দেশ নন্দিত করি ... রবীন্দ্রনাথ

৫৬। ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা ... দ্বিজেন্দ্রলাল

ক্রোড়পঞ্জী—২

স্বদেশী গান রচয়িতা কবিদের নাম

বহু কবি স্বদেশী গান রচনা করেছেন, সকলের নাম অবশ্য জানা যায়নি। এখানে যে তালিকা দেওয়া হল তার থেকে দেখা যাবে কত কবি, যাঁদের কেউ কেউ এখন সম্পূর্ণ বিস্মৃত, এই ধরণের গান লিখেছেন। যাঁরা প্রধান কবি তাঁদের গীতি সংকলন আছে, কিন্তু অপ্রধান কবিদের নিজস্ব গীতি সংকলন নেই, তাঁদের রচনা বিভিন্ন সংগ্রহ ও সংকলন গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। এখানে সব কবিদের নাম এবং তাঁদের জীবনকাল উল্লেখ করা হল। আকর গ্রন্থের নাম "গ্রন্থপঞ্জী"তে দ্রষ্টব্য ঃ

১।	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	···	(১৮৪৬—১৯১৭)
২।	অতুলপ্রসাদ সেন	···	(১৮৭১—১৯৩৪)
৩।	অবিনাশচন্দ্র মিত্র	···	
৪।	অমৃতলাল বসু	···	(১৮৫৩—১৯২৯)
৫।	অশ্বিনীকুমার দত্ত	···	(১৮৫৬—১৯২৩)
৬।	আনন্দচন্দ্র মিত্র	···	(১৮৫৪—১৯০৩)
৭।	ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী	···	(১৮৭৩—১৯৬০)
৮।	উপেন্দ্রনাথ দাস	···	(১৮৪৮—১৮৯৫)
৯।	করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায়	···	
১০।	কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ (হরিনাথ)	···	(১৮৩৩—১৮৯৬)
১১।	কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য	···	
১২।	কামিনী রায়	···	(১৮৬৪—১৯৩৩)
১৩।	কায়কোবাদ (মোহাম্মদ কাজেম)	···	(১৮৫৪—১৯৫১)
১৪।	কালীপদ	···	
১৫।	কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়	···	
১৬।	কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (বন্দ্যোপাধ্যায়)	···	(১৮৬১—১৯০৭)
১৭।	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	···	(১৮৪৩—১৯১০)
১৮।	কেদারনাথ (চট্টোপাধ্যায় ?)	···	(১৮৯১—১৯৬৫)
১৯।	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	···	(১৮৬৩—১৯২৭)
২০।	ক্ষেত্র চট্টোপাধ্যায়	···	

২১। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... (১৮৪১—১৮৬৯)
২২। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ... (১৮৪৪—১৯১২)
২৩। গিরিশচন্দ্র সেন ... (১৮৩৫—১৯১০)
২৪। গোবিন্দচন্দ্র দাস ... (১৮৫৫—১৯১৮)
২৫। গোবিন্দচন্দ্র রায় ... (১৮৩৮—১৯১৭)
২৬। চন্দ্রনাথ দাস ...
২৭। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ... (১৮৪৯—১৯২৫)
২৮। দয়ালকুমার ...
২৯। দিলীপ রায় ...
৩০। দীননাথ ধর ... (১৮৩৯—)
৩১। দীনবন্ধু মিত্র ... (১৮৩০—১৮৭৩)
৩২। দীনেশচরণ বসু ... (১৮৫১—১৮৯৮)
৩৩। দেবেন্দ্রনাথ সেন ... (১৮৫৮—১৯২০)
৩৪। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ... (১৮৪৪—১৮৯৮)
৩৫। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... (১৮৪০—১৯২৬)
৩৬। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ... (১৮৬৩—১৯১৩)
৩৭। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ... (১৮৬১—১৯৪০)
৩৮। নজরুল ইসলাম ... (১৮৯৯—১৯৭৬)
৩৯। নবগোপাল মিত্র ...
৪০। নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত) ... (১৭৪১—১৮৩৮)
৪১। নিবারণ পণ্ডিত ...
৪২। নির্মলচন্দ্র বড়াল ...
৪৩। প্রজ্ঞানন্দ ...
৪৪। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ...
৪৫। প্রমথনাথ দত্ত ...
৪৬। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ... (১৮৭২—১৯৪৯)
৪৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... (১৮৩৮—১৮৯৪)
৪৮। বরদাচরণ মিত্র ...
৪৯। বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় ...
৫০। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ... (১৮৪৪—১৯০৯)
৫১। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ...

৫২।	বিজয়চন্দ্র মজুমদার	···	
৫৩।	বিনয় রায়	···	(—১৯৭৫)
৫৪।	বিপিনচন্দ্র পাল	···	(১৮৫৮—১৯৩২)
৫৫।	বিষ্ণু দে	···	
৫৬।	মদনমোহন মিত্র	···	
৫৭।	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	···	
৫৮।	মনোমোহন চক্রবর্ত্তী	···	
৫৯।	মনোমোহন বসু	···	(১৮৩১—১৯১২)
৬০।	মহিমারঞ্জন রায়	···	
৬১।	মুকুন্দদাস	···	(১৮৭৮—১৯৩৪)
৬২।	যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী	···	(১৮৭৮—১৯৪৮)
৬৩।	রজনীকান্ত সেন	···	(১৮৬৫—১৯১০)
৬৪।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	···	(১৮৬১—১৯৪১)
৬৫।	রাজকৃষ্ণ রায়	···	(১৮৪৯—১৮৯৪)
৬৬।	রাধানাথ মিত্র	···	(১৮২৫—১৯২১)
৬৭।	রামচন্দ্র দাশগুপ্ত	···	
৬৮।	রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়	···	
৬৯।	শিবনাথ শাস্ত্রী	···	(১৮৪৭—১৯১৯)
৭০।	শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়	···	
৭১।	সজনীকান্ত দাস	···	(১৯০০—১৯৬২)
৭২।	সত্যেন সেন	···	
৭৩।	সরলা দেবী	···	(১৮৭২—১৯৪৫)
৭৪।	সরোজিনী দেবী	···	
৭৫।	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	···	(১৮৪২—১৯২৩)
৭৬।	স্বর্ণকুমারী দেবী	···	(১৮৫৫—১৯৩২)
৭৭।	সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	···	
৭৮।	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	···	(১৮৮২—১৯২২)
৭৯।	সুন্দরীমোহন দাস	···	
৮০।	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	···	
৮১।	সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু	···	
৮২।	হরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ		

৮৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... (১৮৩৮—১৯০৩)

৮৪। হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...

৮৫। হেমদাকান্ত চৌধুরী ...

৮৬। হেমলতা ঠাকুর ... (১৮৭৩—)

৮৭। হেমাঙ্গ বিশ্বাস ...

ক্রোড়পত্রী—৩

প্রধান স্বদেশী গানের তালিকা

	রচয়িতা	গানের প্রথম ছত্র	আকর গ্রন্থ*
১।	অজ্ঞাত	সতত রত হও যতনে	হিমেই
২।	”	এই ধরাতলে, ধন্য ধন্য ক্ষত্রিয় ললনা	”
৩।	”	আসি ভারতভূমে, একবার দেখে যাও	হিমেই। সকো। জাউ
৪।	”	ছাড় হে অসার অলস,	হিমেই
৫।	”	কবে উদিবে সৌভাগ্য ভানু	”
৬।	”	সবে আয় রে আয়, জীবন উৎসর্গ করি	জাস[২]। মাব
৭।	”	জাগ ভারতবাসি গাও বন্দেমাতরম্	জাস[২]
৮।	”	কানে কানে প্রাণে প্রাণে মায়ের নাম	জাস[২]
৯।	”	ভারতী-জননী মলিনবদনী	সকো। জাউ
১০।	”	যদি গাবে গাও বঙ্গে	” । ”
১১।	”	ভারত যশ-কীর্ত্তন করিয়ে কাটাব	সকো। জাস[২]
১২।	”	আয় আয় ভাই আয় রে সবে	সকো। জাউ
১৩।	”	একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি	হাববাগা
১৪।	”	জাগরে জাগরে ভারত-সন্তান	মাতৃপূজা
১৫।	”	ক্ষুদিরাম গেল হাসিতে হাসিতে	—
১৬।	”	দেশ আজি ডাক্‌ছে তোরে	খেলাফৎ সঙ্গীত
১৭।	”	তুর্কীর সৈন্য, তুর্কীর বল	”
১৮।	”	কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য কিসের লজ্জা	”
১৯।	”	কি জানি কি সুরে গাহিব গান	”
২০।	”	ও ভাই ভাবনা কি আর আছে	পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ
২১।	”	এবার বন্দেমাতরং বল সর্ব্বজন	পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ
২২।	”	আছিস্ কোন উল্লাসে ?	বন্দনা
২৩।	”	সুখে যাবে সুখসাগরে	”
২৪।	”	কোথা গো মা ভিক্টোরিয়া	সকো
২৫।	”	আমরা গাব সবে বন্দেমাতরম্	মুগা

২৬।	”	ছন্দে ছন্দে নব আনন্দে গাও রে	বাণার ঝঙ্কার
২৭।	”	মায়ের ক্ষেতে ফলে পাকা সোনা	”
২৮।	”	এনেছি দেশী সিগারেট	”
২৯।	”	ভায়ে ভায়ে বিসম্বাদে ভেঙ না	স্বগী
৩০।	”	কে বাজিয়ে সিংঙ্গা	”
৩১।	”	এখনো কে আছ অবসন্ন প্রাণ	”
৩২।	”	ভুল না ভুল না এদেশের কথা	” । মাম
৩৩।	”	আজকে মা তোর চায় নাক' ফুল	মাম
৩৪।	”	হে বঙ্গজননি, স্বর্ণ প্রসবিনী	জাস[২] । মাব
৩৫।	”	কাঁপায়ে মেদিনী, কর জয়ধ্বনি	অ-স্বস । বন্দনা
৩৬।	”	গেল রে সোনার বাংলা রসাতলে	মৈমনসিংহ সুহৃদ সমিতি
৩৭।	”	বন্ধনভয় তুচ্ছ করেছি	হাববাগা
৩৮।	”	জাগে নব ভারতের জনতা	মুগা। ভাস্বগা
৩৯।	”	কদম কদম বঢ়ায়ে জা	” । ”
৪০।	”	হুন ছিলিম চাচা, আইজ এ্যাক	বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর
৪১।	”	এসেছে ডাক, বেজেছে শাঁখ	মুগা
৪২।	”	নিশান রাখ উঁচু	মুগা। ভাস্বগা
৪৩।	”	তাহাদের রেখো স্মরণে	মুগা
৪৪।	”	চরণে চরণে কণ্টক যারা গেল দলি'	”
৪৫।	”	গেল রে সোনার বাংলা রসাতলে	স্বআবাস।
৪৬।	অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭)	মা! আমি স্বদেশী হব	অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার
৪৭।	অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)	উঠ গো, ভারতলক্ষ্মী	শগা
৪৮।		বলো বলো সবে শতবীণা বেণুরবে	গীতিগুচ্ছ
৪৯।		মোদের গরব মোদের আশা	”
৫০।		হও ধরমেতে বীর হও করমেতে বীর	”
৫১।		ভারত-ভানু কোথা লুকালে	”
৫২।		প্রবাসী, চল্ রে দেশে চল্	”
৫৩।	অবিনাশচন্দ্র মিত্র	আঁধার ভারতে আলো কে আর	সকো। জাউ

৫৪।	অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)	ওরা জোর ক'রে দেয় দিক না	জাউ। স্বস ও অন্যান্য
৫৫।	অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩)	অগ্নিময়ী মা গো আজি	বাগা
৫৬।		আজি মঙ্গল মোহন তানে	”
৫৭।		আয় রে আয় রে ভারতবাসী	স্বস। অকুর
৫৮।		আয় আয় ভাই আয় সবে মিলি	অকুর
৫৯।		আয় আয় সবে ভাই যাই দ্বারে দ্বারে	অকুর। বাগা
৬০।		ওরে শশী কি দেখিস্ আর	বাগা
৬১।		ও ভাই বিধির এমনি কল	অকুর
৬২।		ও সাহেব এদিন যাবে, কেউ না রবে	”
৬৩।		ওরে কাটাকাটি এখনো কর,	”
৬৪।		ওরে ভাই কিসের লেগে দিনে দিনে	অকুর। সকো। জাউ। স্বস
৬৫।		কোথা দয়াময় ডাকিহে তোমায়	বাগা। অকুর
৬৬।		কি ভেবে মা এসেছিস আজ	”। ”
৬৭।		গেল গেল সবই গেল	অকুর
৬৮।		জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি	”
৬৯।		জয় জয় আর্য্য মাতা	”
৭০।		বাঙ্গালী বড় বুদ্ধিমান	অকুর। বাগা
৭১।		বিধি কি নিদ্রিত আজি	অকুর
৭২।		শ্মশান তো ভালবাসিস্ মাগো	হাববাগা
৭৩।	আনন্দচন্দ্র মিত্র (১৮৫৪-.৯০৩)	একাকী কাননে বসি, কে তুমি	বাগা। সকো
৭৪।		উঠ উঠ উঠ সবে, ভারত-সন্তান	বাগা। সকো। মাব হাববাগা
৭৫।		কত প্রিয়তম, কে বুঝিতে	বাগা। জাস৮। জাউ
৭৬।		কোথায় রহিলে সব,	বাগা। জাউ
৭৭।		সাধের ভারতভূমি ঢাকিল	বাগা। জাউ। জাস৮
৭৮।		মরি কিবা মূরতি ভীষণ	—
৭৯।		আজি শুভদিনে মরি কি আনন্দ	—

৮০।	ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী (১৮৭৩-১৯৬০)	আজ এস সবে গীতরবে	সুরঙ্গমা
৮১।		মোরা আশ্রম দুহিতা	"
৮২।	উপেন্দ্রনাথ দাস (১৮৪৮-১৮৯৫)	হায় কি তামসী নিশি	জাস[২]। জাউ। সকো। মাব
৮৩।	করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায়	বাজে রণের ভেরী	বঙ্গের আহ্বান
৮৪।	কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ (১৮৩৩-১৮৯৬)	এই কি সেই আর্য্যস্থান	বাগা। মাব
৮৫।	কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য	অবনত ভারত চাহে তোমারে	হাববাগা
৮৬।		আপনার মান রাখিতে জননী	স্বআবাসা
৮৭।		শাসন-সংযত-কণ্ঠ, জননি!	"
৮৮।		সোনার স্বপন মোহে	মাম। বন্দনা
৮৯।		হমারা সোনেকি হিন্দুস্থান	মুগা। স্বস। অ-স্বস
৯০।	কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)	তোরা শুনে যা আমার মধুর	বন্দে। মাব। জাউ। হাববাগা
৯১।		যেইদিন ও চরণে	বন্দে। স্বস। মাব। বমক
৯২।	কায়কোবাদ (১৮৫৪-১৯৫১)	ক্ষমা কর মা বঙ্গভূমি	হাববাগা
৯৩।	কালীপদ	কেন গো আনন্দে আজি	সকো
৯৪।	কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়	ভারত-উদ্ধার বল হবে হে	সকো। জাউ
৯৫।		প্রভু এই তব পদে করি	"। "
৯৬।	কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ (বন্দ্যোপাধ্যায়) (১৮৬১-১৯০৭)	আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল	জাস[২]
৯৭।		আসিলে কি অন্নপূর্ণা অন্নহীন	স্বআবাসা
৯৮।		এক দেশে থাকি	স্বস
৯৯।		এই দ্বারদেশে এসেছে ভিখারী	স্বআবাসা
১০০।		এস, দেশের অভাব ঘুচাও	বাগা। জাউ। স্বস
১০১।		ঐ যে জগত জাগে	স্বআবাসা
১০২।		ছিন্ন হল বঙ্গ কেন ভাব	হাববাগা

১০৩।		জয় জগদীশ হরে	স্বস
১০৪।		জাগো জাগো বরিশাল	স্বআবাসা
১০৫।		দণ্ড দিতে চণ্ড মুণ্ডে	বন্দনা। স্বস
১০৬।		নবীন এ অনুরাগ	জাস[২]। স্বদেশীস
১০৭।		নীতিবন্ধন ক'র না লঙ্ঘন	বন্দনা। স্বস
১০৮।		নয়ন মুদিত মোহে	স্বআবাসা
১০৯।		ভাইসব দেখ চেয়ে	জাউ। স্বদেশীস। স্বআবাসা
১১০।		ভেইয়া দেশ্‌কা এ কেয়া হাল্	সাসাচমা
১১১।		(বল) ভেয়ে ভেয়ে মিলবে কবে	স্বআবাসা
১১২।		মাগো যায় যেন জীবন চলে	জাস[২]। মাব। স্বআবাসা
১১৩।		যদি এ দুঃখের নিশা	স্বস
১১৪।		সেই তো রয়েছ মা তুমি	জাউ। স্বদেশীস। স্বআবাসা
১১৫।		স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি'	জাস[২]। মাব। হাববাগা
১১৬।		শুনরে ভাই দেশের দশা	স্বআবাসা
১১৭।		হতাশ হয়ো না প্রাণে	”
১১৮।	কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০)	উর গো বাণি বীণাপাণি	বাগা। সকো। জাউ
১১৯।		কি দেখিতে এলে মা আবার	বাগা
১২০।		গাওরে ভারত-সঙ্গীত, সবে	বাগা। সকো। জাউ মাব
১২১।		জননী জন্মভূমি স্বর্গ তুমি	বাগা। সকো। জাউ
১২২।		নীরব ভারতে কেন ভারতীর	বাগা। স্বদেশীস। মাব
১২৩।	কেদারনাথ (চট্টোপাধ্যায় ?) (১৮৯১-১৯৬৫)	কতদিন দহিবে এ তুষ	সকো
১২৪।	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭)	এস সোনার বরণী রাণী গো	হাববাগা

১২৫।	ক্ষেত্র চট্টোপাধ্যায়	শোন দেশপ্রেমিকের দল	জয়ুগা
১২৬।	গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-১৮৬৯)	লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি	বাগা। সকো। জাস[২]। হিমেই
১২৭।	গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)	কেন আর ভাবৃছ অত	স্বআবাসা
১২৮।		জাগো শ্যামা জন্মদে	জাস[২]। জাউ
১২৯।		নয়ন জলে গেঁথে মালা পরাব	জাউ। মাব। হাববাগা
১৩০।	গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০)	বাধাবিঘ্ন কত শত শত	হাববাগা
১৩১।	গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮)	এস হে ভারতবাসী	সকো
১৩২।		বহু দিন হতে রে ভাই শ্রীহীনা	সকো। জাউ। ভাসমু
১৩৩।		স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে ?	মাব। সাসাচমা
১৩৪।	গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৮৩৮-১৯১৭)	কত কাল পরে, বল ভারত রে	সকো। বন্দে। বাগা। জাউ। শগা। জাস[২]
১৩৫।		নির্মল সলিলে বহিছ সদা	শগা। বাগা। বন্দে। জাউ
১৩৬।	চন্দ্রনাথ দাস	নিয়েছ যে ব্রত, পালনে বিরত	হাববাগা
১৩৭।	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)	আয় রে আয় দেশের সন্তান	সাসাচমা
১৩৮।		চল্ রে চল্ সবে ভারত-সন্তান	সাসাচমা। বন্দে। মাব। জাউ। শগা। স্বদেশীস
১৩৯।		জাগ জাগ জাগ সবে	মুক্তিসংগ্রাম
১৪০।	দয়ালকুমার	সৈনিক শোনো রণভেরী	জয়ুগা
১৪১।	দিলীপ রায়	এসেছে দিন স্বাধীনতারি,	”
১৪২।	দিলীপ রায় ও সুনীল চ্যাটার্জি	আজ গগনে পতাকা নাচেরে	”
১৪৩।	দীননাথ ধর (১৮৩৯—)	আজি কিসের এদিন।	সকো। জাউ
১৪৪		রে বিধি, কেন আমারে	

১৪৫।	দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)	বাঁচিয়ে কি ফল যদি	স্বস
১৪৬।		হে নিরদয় নীলকরগণ	বাগা। মাব। হাববাগা
১৪৭।	দীনেশচরণ বসু (১৮৫১-১৮৯৮)	আয়লো স্মৃতি আয়	বাগা। সকো। জাউ
১৪৮।		এ সুখ সন্ধ্যায় আজি	বাগা। সকো। জাউ
১৪৯।		বিমল তপনের স্নিগ্ধ বারি	" । " । "
১৫০।	দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮-১৯২০)	হিন্দুমুসলমান হয়ে এক প্রাণ	হাববাগা
১৫১।	দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৮৯৮)	দ্বিজ হও, ক্ষত্র হও, বৈশ্যশূদ্র	সকো। মাব। জাউ
১৫২।		না জাগিলে সব ভারত-ললনা	বাগা। মাব। হাববাগা
১৫৩।		নির্ব্বাণ আশার দীপ	বাগা। জাউ। সকো। মাব
১৫৪।		ভারত দুঃখিনী আমি পরভোগ্যা	বাগা। সকো। জাউ
১৫৫।		সোনার ভারত আজ	সকো। মাব
১৫৬।		স্মরিলে পূর্বের কথা	বাগা
১৫৭।		হবে কি ভারত পুনঃ এমন	সকো। মাব। জাউ
১৫৮।	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)	মলিন-মুখ-চন্দ্রমা ভারত	বন্দে। বাগা। শগা। জাস২। সকো। জাউ
১৫৯।	দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬০-১৯১৩)	আজ আয় আয় ভাই	বন্দে। আর্য্যগাথা
১৬০।		আজিগো তোমার চরণে জননি	দ্বির
১৬১।		কাঁদরে, কাঁদরে আর্য্য	বাগা। সকো। জাউ আর্য্যগাথা
১৬২।		কি মাধুর্য্য জন্মভূমি	দ্বির। সাসাচমা
১৬৩।		কিসের শোক করিস ভাই	দ্বিকাস
১৬৪।		কেন ভাগীরথি হাসিয়ে	বাগা। জাউ। আর্য্যগাথা
১৬৫।		জ্বালাও ভারত-হৃদে	বন্দে। দ্বির
১৬৬।		তুমি ত মা সেই	বন্দে। গান

১৬৭।		ধনধান্য পুষ্পে ভরা	হাববাগা। দ্বির
১৬৮।		বঙ্গ আমার! জননি আমার!	গান। দ্বিকাস
১৬৯।		ভারত আমার, ভারত আমার	হাববাগা
১৭০।		মনোমোহন মূরতি আজি মা	বাগা। জাউ। সকো
১৭১।		মেবার পাহাড়—মেবার পাহাড়	দ্বির। দ্বিকাস
১৭২।		যেদিন সুনীল জলধি হইতে	দ্বির
১৭৩।		যেই স্থানে আজ কর বিচরণ	বন্দে। বাগা। সকো। জাউ। দ্বির
১৭৪।		রেখে দেও, রেখে দেও	বাগা। জাউ। আর্য্যগাথা
১৭৫।		স্বদেশ আমার নাহি করি	বন্দে। আর্য্যগাথা
১৭৬।	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০)	দেখ গো ভারতমাতা তোমারি	সকো। জাউ
১৭৭।	নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-)	আজি শৃঙ্খলে বাজিছে মাভৈঃ	নগী
১৭৮।		আমার শ্যাম্‌লা বরণ বাঙলা	নগী। সুর-সাকী
১৭৯।		আমার সোনার হিন্দুস্থান	”। ”
১৮০।		এই শিকল-পরা ছল মোদের	নগী
১৮১।		এস মা ভারত-জননী আবার	নগী। সুর-সাকী
১৮২।		উদার ভারত সকল মানবে	”। ”
১৮৩।		কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙে	নগী। হাববাগা
১৮৪।		গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা	নগী
১৮৫।		চল্-চল্-চল্। উর্দ্ধ-গগনে বাজে	নজরুল-গীতিকা
১৮৬।		জাগো জাগো জাগো হে দেশপ্রিয়	নগী
১৮৭।		ত্রিংশ কোটি তব সন্তান ডাকে	নগী। সুর-সাকী
১৮৮।		দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু	নজরুল-গীতিকা
১৮৯।		বিশাল-ভারত-চিত্তরঞ্জন	নগী
১৯০।		ভারতের দুই নয়ন-তারা	”
১৯১।		ভারতলক্ষ্মী মা আয় ফিরে	নগী। সুরলিপি
১৯২।		লক্ষ্মী মা তুই আয় গো উঠে	নগী। সুর-সাকী
১৯৩।		সিন্ধুর কল্লোল ছন্দে	নগী
১৯৪।		হায় পলাশী! এঁকে দিলি তুই	”

১৯৫।	নবগোপাল মিত্র	এদেশের দুখে কার না সরে	সকো। মাব। জাউ
১৯৬।	নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত)	নানান্ দেশের নানান্ ভাষা	গীতাবলী
১৯৭।	নিবারণ পণ্ডিত	দেশে সবে মাত্র, কৃষক ছাত্র	
১৯৮।	নির্মলচন্দ্র বড়াল	গৃহে গৃহে তোমার হাসি	অর্চ্চনা
১৯৯।	প্রজ্ঞানন্দ (স্বামী)	কে আছ মায়ের মুখ-পানে	মাম
২০০।	প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	কত আর নিদ্রা যাও,	ব্রস। বাগা
২০১।		কে আমায় ডাক বিদেশী	বাগা
২০২।	প্রমথনাথ দত্ত	আমরা যা করছি তা	স্বআবাসা
২০৩।	প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯)	তুই মা মোদের জগত-আলো	বন্দে। বাগা। জাস২। জাউ। স্বদেশীস
২০৪।		নম বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী	বন্দে। বাগা। জাস২। জাউ। স্বদেশীস। মাব। হাববাগা
২০৫।		শুভদিনে শুভক্ষণে গাহ	বন্দে। বাগা। জাস২। জাউ। স্বদেশীস। মাব
২০৬।	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)	বন্দেমাতরম্, সুজলাং সুফলাং	বন্দে। বাগা। জাস২। জাউ। স্বদেশীস। সকো। আনন্দমঠ
২০৭।	বরদাচরণ মিত্র	শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত মোরা	হাববাগা
২০৮।	বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়	আয়রে আয় ভারতবাসী,	স্বরাজস
২০৯।		জয় জয় ভারতমাতা, জয় মা	”
২১০।		পুতুলবাজির পুতুল মোরা	”
২১১।	বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪৪-১৯০৯)	এতদিনে পোহাইল ভারতের	বাগা। ব্রস
২১২।	বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭৪)	চাই স্বাধীনতা, সাম্য চাই	মুগা। ভাস্বগা
২১৩।		মুক্তি মোদের পরাণবঁধু	মুগা
২১৪।	বিজয়চন্দ্র মজুমদার	আয় আজি আয় মরিবি কে	হাববাগা
২১৫।		জাগো জাগো ভারত মাতা!	বন্দে। স্বদেশীস

২১৬।		হবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা	হাববাগা
২১৭।	বিনয় রায়	ক্ষুধিতের সেবার ভার	”
২১৮।		সাবাস চীনা ভাই, তোমার	জযুগা
২১৯।		হোই হোই হোই জাপান ঐ	”
২২০।	বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)	আর সহে না, সহে না, জননী	মাব। স্বআবাসা
২২১।		বাজায়ো না আর মোহন বাঁশী	মাব। হাববাগা
২২২।	বিষ্ণু দে	বিশ্বের মুক্তির শুনি আজ	
২২৩।	মদনমোহন মিত্র	ও ভাই ক্ষুদিরাম! সকলকে	বাংলায় বিপ্লববাদ
২২৪।	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	আমি মরণ আজিকে বরণ	স্বআবাসা
২২৫।		এতদিন পরে, জননীরে যবে	”
২২৬।	মনোমোহন চক্রবর্তী	চল্ রে চল্ রে চল্ রে ও ভাই	জাস[২]। মাব
২২৭।	মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২)	"উন্নতি উন্নতি"—উল্লাসভারতী	মগী। সাসাচমা। জাউ। মাব
২২৮।		কোথায় মা ভিক্টোরিয়া, দেখ্	মগী
২২৯।		তাই বলি, বল ভাই,	”
২৩০।		দিনের দিন্ সবে দীন হয়ে	মগী। হিমেই। বাগা। সাসাচমা। ~ বন্দে। সকো। মাব। জাউ। স্বদেশীস
২৩১।		নরবর নাগেশ্বর শাসন কি	হিমেই
২৩২।		মিলন বিনা জীবন, সতত	মগী
২৩৩।		হায়! দেশের হ'লো কি?	”
২৩৪।	মহিমারঞ্জন রায়	বৃথায় জনম আমার অন্ন নাই	সকো। জাউ। স্বদেশীস
২৩৫।	মুকুন্দদাস (১৮৭৮-১৯৩৪)	অগ্নিময়ী মায়ের ছেলে	চাকমুদা
২৩৬।		আবার যখন গান ধরেছি	”
২৩৭।		আমি দশহাজার প্রাণ যদি	চাকমুদা। চামুগী
২৩৮।		আয়রে বাঙালী আয় সেজে	”
২৩৯।		এসেছে ভারতে নব জাগরণ	”
২৪০।		করমেরই যুগ এসেছে	”
২৪১।		কি আনন্দধ্বনি উঠল বঙ্গভূমে	”

২৪২।		স্বরাজ সেদিন মিলিবে যেদিন	”
২৪৩।		ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ী	”। চামুগী। স্বআবাসা। মুদাগ্র
২৪৪।		জাগ গো জাগ জননী	”
২৪৫।		অতীত গিয়াছে অতীতে মিলায়ে	”
২৪৬।		পণ করে সব লাগ রে কাজে	চাকমুদা
২৪৭।		পুঁটলি বেঁধে ঘরের কোণে	”
২৪৮।		ফুলার-আর কি দেখাও ভয়	চাকমুদা। চামুগী
২৪৯।		বন্দেমাতরম্ বলে নাচ্‌রে	” । ”
২৫০।		বল ভাই মেতে যাই বন্দেমাতরম্	”
২৫১।		বান এসেছে মরা গাঙে	”
২৫২।		বাবু, বুঝবে কি আর মলে	” । চামুগী। স্বআবাসা
২৫৩।		ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে	”
২৫৪।		মায়ের নামে ডঙ্কা দিয়ে	”
২৫৫।		মায়ের নামের বাদাম উড়িয়ে	”
২৫৬।		মায়ের নাম নিয়ে ভাসান তরী	”
২৫৭।		মা মা বলে ডাক দেখি ভাই	”
২৫৮।		রাম রহিম না জুদা কর ভাই	”। মুদাগ্র। চামুগী। স্বআবাসা। হাববাগা
২৫৯।	যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী (১৮৭৮-১৯৪৮)	ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্	গীতিমালিকা। অম্বস। বন্দনা। স্বগী
২৬০।	রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)	আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা	জাস[২]। সাসাচমা। কাগীলি
২৬১।		আয় ছুটে ভাই, হিন্দুমুসলমান	কান্তবাণী
২৬২।		আর কিসের শঙ্কা, বাজাও ডঙ্কা	”
২৬৩।		এমন সোনার বাংলা ভাগ করে	”
২৬৪।		জয় জয় জনমভূমি, জননি	হাববাগা
২৬৫।		তাই ভালো, মোদের মায়ের	কান্তবাণী। জাস[২]। বন্দে। জাউ। স্বদেশীস
২৬৬।		তোরা আয়রে ছুটে আয়	কান্তবাণী
২৬৭।		নমো নমো নমো জননী বঙ্গ	”

২৬৮।		ফুলার কল্লে হুকুমজারি	কান্তবাণী
২৬৯।		বিধাতা আপনি এসে পথ	”
২৭০।		ভারতকাব্য নিকুঞ্জে-জাগ	কাগীলি। রজনীকান্তের গান
২৭১।		মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়	কান্তবাণী। জাস২। সাসাচমা। জাউ। স্বদেশীস। হাববাগা। রজনীকান্তের গান
২৭২।		রে তাঁতী ভাই, একটা কথা	কান্তবাণী
২৭৩।		শ্যামল-শস্য-ভরা	”
২৭৪।		সেথা আমি কি গাহিব গান?	রজনীকান্তের গান
২৭৫।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)	অয়ি বিষাদিনী বীণা	গীতবিতান। বাগা। জাউ। সকো
২৭৬।		অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, মা	”। শগা। বাগা। জাস২। বন্দে। জাউ। স্বদেশীস
২৭৭।		আগে চল্ আগে চল্ ভাই	”। বাগা। বন্দে। সকো। স্বদেশীস
২৭৮।		আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে	
২৭৯।		আজি এ ভারত লজ্জিত হে	
২৮০।		আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে	”। জাস২। স্বদেশীস
২৮১।		আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে	”। বাগা। বন্দে। জাউ
২৮২।		আপনি অবশ হলি, তবে বল	”
২৮৩।		আমরা পথে পথে যাব	”। জাস২। জাউ। স্বদেশীস
২৮৪।		আমরা মিলেছি আজ মায়ের	”। শগা। ব্রস। বাগা। বন্দে। জাউ। স্বদেশীস
২৮৫।		আমরা সবাই রাজা	”
২৮৬।		আমায় বোলো না গাহিতে	”। জাস২। বাগা। জাউ। স্বদেশীস
২৮৭।		আমার সোনার বাংলা	”। জাস২। বন্দে। জাউ স্বদেশীস

২৮৮।	আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু	
২৮৯।	আমি ভয় করব না	”। স্বদেশীস
২৯০।	এ ভারতে রাখ নিত্য	ব্রস। বাগা
২৯১।	একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি	গীতবিতান। মাব। জাউ। স্বদেশীস
২৯২।	একবার তোরা মা বলিয়া	”। বন্দে। ব্রস। বাগা। জাস২। মাব। সকো। জাউ। স্বদেশীস
২৯৩।	এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি	গীতবিতান। বাগা। বন্দে
২৯৪।	এখন আর দেরী নয়	”
২৯৫।	এবার তোর মরা গাঙে	”। জাস২। জাউ। স্বদেশীস
২৯৬।	ও আমার দেশের মাটি	”। জাস২। জাউ। স্বদেশীস
২৯৭।	ওদের বাঁধন যতই শক্ত	”। জাস২। স্বদেশীস
২৯৮।	ওরে, তোরা নেই বা কথা	”
২৯৯।	ওরে নূতন যুগের ভোরে	”
৩০০।	ওরে ভাই, মিথ্যা ভেবে না	”
৩০১।	কে এসে যায় ফিরে ফিরে	”। বাগা। বন্দে। জাউ। স্বদেশীস
৩০২।	কেন চেয়ে আছ, গো মা	”। বাগা। বন্দে
৩০৩।	খ্যাপা তুই আছিস্	”। ”
৩০৪।	ঘরে মুখ মলিন দেখে	”। জাউ
৩০৫।	চলো যাই চলো, যাই	”
৩০৬।	ছি ছি, চোখের জলে	গীতবিতান। জাউ
৩০৭।	জনগণমন-অধিনায়ক	”। ব্রস
৩০৮।	জননীর দ্বারে আজি	”। বাগা। জাউ। স্বদেশীস
৩০৯।	ঢাকো রে মুখ, চন্দ্রমা	”। বাগা। সকো
৩১০।	তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ	”। বাগা। বন্দে। জাউ

৩৩৫।		সাধন কি মোর আসন নেবে	"
৩৩৬।		সুখহীন নিশিদিন পরাধীন	" । ব্রস
৩৩৭।		হে ভারত আজি তোমারি	গীতবিতান। বন্দে। জাউ
৩৩৮।		হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে	" । ব্রস
৩৩৯।	রাইচরণ বিশ্বাস	একবার জাগ, জাগ জাগ	জাস[৫]। মুগা
৩৪০।	রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪)	আবার কেন হে রবি উঠিলে	ভাগা
৩৪১।		আর কতকাল ভারত মা রবে	"
৩৪২।		এখনো কি মৃদুমন্দ বহিবি	"
৩৪৩।		(ওরে) মনে মুখে তফাৎ কেন?	সাসাচমা
৩৪৪।		কনকরচিত মণি-খচিত	ভাগা
৩৪৫।		কলকণ্ঠময়ী গঙ্গে	বাগা। জাউ
৩৪৬।		কি গাইব আজি, হায় কি	সাসাচমা। জাউ। মাব
৩৪৭।		কেন, রে ভারত! নিয়ত নয়ন	ভাগা
৩৪৮।		কোথা সে অযোধ্যাপুর,	বাগা। জাউ
৩৪৯।		জানি আমি, কেন গেল ভারতের	সাসাচমা। বাগা। সকো। জাউ
৩৫০।		তোমাদের এ কি বিবেচনা,	সাসাচমা
৩৫১।		দিবস বিগত তবুও ভারত	" । মাব। হাববাগা
৩৫২।		নিশিদিন ভারত! রোয়সি	"
৩৫৩।		প্রভাত আইল অই, ভারত	ভাগা
৩৫৪।		ভারতীয় আর্য্যনাম এখনো	বাগা। জাউ
৩৫৫।		ভারতের সুখ-রবি লুকায়েছে	ভাগা
৩৫৬।		মন্ বসে না দেশের হিতে	সাসাচমা। স্বদেশীস
৩৫৭।	রাধানাথ মিত্র (১৮২৫-১৯২১)	কে তুমি বিজনে বসি	বাগা। সকো
৩৫৮।		ভারতভূমি সমান আছে	সকো। জাউ। স্বদেশীস। মাব
৩৫৯।		ভারত যশকীর্ত্তন করিয়ে	বাগা। সকো। জাউ
৩৬০।		ভারত যো দীন, সো দীন রে	" । জাস[৮]। "
৩৬১।	রামচন্দ্র দাশগুপ্ত	আমরা সবাই মায়ের ছেলে	হাববাগা

৩৬২।	রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়	আহা গেল গো ভারত রসাতলে	সকো। জাউ। বাগা
৩৬৩।	শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)	কালরাত্রি পোহাইল	বাগা। জাস৮। জাউ
৩৬৪।		গভীর রজনী ডুবেছে ধরণী	মাব। জাউ। বন্দে। স্বদেশীস
৩৬৫।		পারি কি ভুলিতে ভারতরুধির	জাস২। জাউ
৩৬৬।	শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়	ছিল গো ভারত তব একই	সকো
৩৬৭।	সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২)	জয়তু গান্ধীজী প্রণাম গান্ধী	ভাস্বগা
৩৬৮।	সত্যেন সেন	কি করি উপায় রে,	জয়ুগা
৩৬৯।		বাজে তূর্য্য তৈরী হও সেনাগণ	”
৩৭০।	সরলা দেবী (১৮৭২-১৯৪৫)	অতীত-গৌরববাহিনী মম বাণি!	শগা। মাব। বন্দে। জাউ। হাববাগা
৩৭১।		কোন্ রূপসাগরে ডুব দিলি	গীতিত্রিংশতি
৩৭২।		জয় যুগ আলোকময়,	”
৩৭৩।		নমো নমো জগত-জননি	শগা
৩৭৪।		বন্দি তোমায় ভারত-জননি	শগা। মাব। বন্দে। জাউ। স্বদেশীস। হাববাগা
৩৭৫।		বাঙ্গাই নিয়ে মরি তোদের	গীতিত্রিংশতি
৩৭৬।		মন্ত্রস্তব্ধ জড় কণ্ঠরুদ্ধ	”
৩৭৭।		রণরঙ্গিণী নাচে, নাচে রে,	”
৩৭৮।		স্বাগত! স্বাগত! স্বাগত!	”
৩৭৯।	সরোজিনী দেবী	ও চরণ বন্দি প্রণমি হে গান্ধি	জাস৪
৩৮০।		কি ভাবিছ সব, ভারত গৌরব	জাস৪
৩৮১।		নিক্ না মোদের জেলে ধরে	জাস৪
৩৮২।		মা তোমারি তরে এসেছি	হাববাগা
৩৮৩।	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩)	মিলে সব ভারত-সন্তান	হিমেই। শতগান। সাসাচমা। বাগা। বন্দে। জাউ। স্বদেশীস

৩৮৪।	স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)	বন্দেমাতরম্ ব'লে আয়রে ভাই	গীতিগুচ্ছ
৩৮৫।		লক্ষ ভায়ের দাঁড়ের টানে	গীতিগুচ্ছ
৩৮৬।		শতকণ্ঠে কর গান জননীর	স্বআবাসা। মাব
৩৮৭।	সতীশ (বাবু) চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ওঠ্‌রে ওঠ্‌রে ওঠ্‌রে তোরা	জাস২। মাব। হাববাগা। স্বদেশীস
৩৮৮।	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)	মধুর চেয়েও আছে মধুর	হাববাগা
৩৮৯।	সুন্দরীমোহন দাস	আমরা চাই না তব শিক্ষা	মুগা। জাস৩। বন্দনা
৩৯০।	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	আমরা বীর কিশোর (কিশোর বাহিনীর গান)	জযুগা
৩৯১।		বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ	"
৩৯২।	সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু	কে আছিস্ দেখ্ সে এসে	সকো। স্বদেশীস
৩৯৩।	হরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	শুনিস্ নে আর কারো কথা	মাম। স্বগী
৩৯৪।	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)	আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি	—
৩৯৫।	হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	সাবধান—সাবধান—আসিছে	চাকমুদা। চামুগী। হাববাগা। মাব। মুগী
৩৯৬।	হেমদাকান্ত চৌধুরী	অবনত ভারতের দুঃখ দৈন্য	মুগা। জাস৩
৩৯৭।	হেমলতা ঠাকুর (১৮৭৩—)	ওহে বিশ্বশোভন মুক্তচেতন	—
৩৯৮।	হেমাঙ্গ বিশ্বাস	ওরে ও চাষী ভাই, তোর	জযুগা
৩৯৯।		কংগ্রেস লীগ এক হও,	"
৪০০।		চল চলরে কমরেড চল	
৪০১।		তোমার কাস্তেটারে দিও	
৪০২।		দেশে উঠলো দারুণ হাহাকার	

ক্রোড়পঞ্জী-৩

সংকেত সূচী

সংকেত	গ্রন্থের নাম
অকুর	অশ্বিনীকুমার রচনাসম্ভার
অ-স্বস	অর্ঘ্য-স্বরাজ সঙ্গীত
কাগীলি	কান্ত গীত লিপি
চাকমুদা	চারণকবি মুকুন্দদাস
চামুগী	চারণকবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী
জযুগা	জনযুদ্ধের গান
জাউ	জাতীয় উচ্ছ্বাস
জাস	জাতীয় সঙ্গীত (১-৮, গ্রন্থপঞ্জী-১ দ্রষ্টব্য)
দ্বির	দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী
দ্বিকাস	দ্বিজেন্দ্র কাব্য সম্ভার
নগী	নজরুল গীতি
বন্দে	বন্দেমাতরম্
বমক	বঙ্গের মহিলা কবি
বাগা	বাঙ্গালীর গান
ব্রস	ব্রহ্ম সংগীত
ভাগা	ভারতগান
ভাসমু	ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী
ভাস্বগা	ভারতের স্বদেশী গান
মগী	মনোমোহন গীতাবলী
মাব	মাতৃবন্দনা
মাম	মাতৃমন্ত্র
মুগা	মুক্তির গান
মুদাগ্র	মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী
শগা	শতগান
সকো	সঙ্গীত কোষ
সাসাচমা	সাহিত্যসাধক চরিতমালা
স্বআবাসা	স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য

স্বগী	স্বদেশ গীতি
স্বদেশীস	স্বদেশী সঙ্গীত
স্বস	স্বদেশ সঙ্গীত
স্বরাজস	স্বরাজ সঙ্গীত
হাবৰাগা	হাজার বছরের বাংলা গান
হিমেই	হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত

ক্রোড়পঞ্জী-৩

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সংকেত ব্যবহার করা হয় নাই

অক্ষয় সাহিত্য সম্ভার
অর্চ্চনা (মাসিক পত্রিকা) ২২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩২। ১৯২৫
আর্য্যগাথা
আনন্দমঠ
কান্তবাণী
খেলাফৎ সঙ্গীত
গান
গীতবিতান
গীতাবলী
গীতিকা
গীতিগুচ্ছ
গীতিগুঞ্জ
গীতিত্রিংশতি
গীতিমালিকা
নজরুলগীতিকা
পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ
বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর
বঙ্গের আহ্বান
বন্দনা
বাংলায় বিপ্লববাদ
বীণার ঝঙ্কার
মাতৃপূজা
মুক্তিসংগ্রাম
মৈমনসিংহ সুহৃদ সমিতি প্রকাশিত গান
রজনীকান্তের গান
সুরঙ্গমা, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী বিশেষ সংখ্যা। প্রকাশক—প্রভাস নিয়োগ
সুরলিপি
সুর-সাকী

ক্রোড়পত্রী—৪

প্রকাশকাল অনুযায়ী মুখ্য আকর গ্রন্থের তালিকা

প্রকাশকাল	গ্রন্থের সংখ্যা
১৮৭৬	১
১৮৭৯	১
১৮৮৫	১
১৮৮৭	১
১৮৯১	১
১৮৯৬	২
১৮৯৭	১
১৯০০	১
১৯০১	১
১৯০৫	৬
১৯০৬	৬
১৯০৭	৩
১৯০৮	২
১৯১২	১
১৯১৭	১
১৯১৯	১
১৯২০	৪
১৯২১	৬
১৯২২	৫
১৯২৩	১
১৯২৪	১
১৯৩১	১
১৯৩৮	১
১৯৪২	২
১৯৪৫	১
১৯৪৭	১
১৯৪৮	২
১৯৫৫	১
১৯৬২	২
১৯৬৩	২
১৯৬৬	১
১৯৭০	১
১৯৭২	১

ক্রোড়পঞ্জী—৫

এই প্রসঙ্গে খেলাফৎ আন্দোলন উপলক্ষ্যে রচিত গানগুলিও স্মরণীয়। যেমন ঃ

(ক) কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য কিসের লজ্জা কিসের ভয় ?
চল্লিশকোটি ভ্রাতৃ মিলিয়া গাহিব যখন ধর্মের জয় ...
ইসলাম খলিফা করিতে ধ্বংস কখনো পারেনি' পারেনি' কেউ
ধ্বংসের স্রোতে ডুবিবে অরি, যখন উঠিবে উঠিবে ঢেউ।

(খ) তুর্কীর সৈন্য তুর্কীর বল। তুর্কীর ধন ও জনবল
বৃদ্ধি হউক বৃদ্ধি হউক বৃদ্ধি হউক, হে খোদাওয়ান্দ
তুর্কীর মাটি তুর্কীর জল। তুর্কীর বায়ু তুর্কীর ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক, হে খোদাওয়ান্দ ॥

(আবদুল মতিন, খেলাফৎ সংগীত, মৈমনসিংহ, ১৯২১)—এই গানগুলি বঙ্গভঙ্গ আমলের গানের ভিত্তিতেই রচিত, নতুন গান নয়।

গ্রন্থপঞ্জী

(১) মুখ্য আকর গ্রন্থ : সংগীত সংকলন

জাতীয় সঙ্গীত[1]	দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী,	১৮৭৬
ভারতগান	রাজকৃষ্ণ রায়,	১৮৭৯
ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী	নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়,	১৮৮৫
মনোমোহন গীতাবলী	মনোমোহন বসু,	১৮৮৭
সঙ্গীত সহস্র	গ্রন্থকার সমিতি,	১৮৯১
সঙ্গীতকোষ	উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,	১৮৯৬
গীতাবলী	রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু),	১৮৯৬
স্বরলিপি গীতিকা	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর,	১৮৯৭
শতগান	সরলা দেবী,	১৯০০
সঙ্গীতসার সংগ্রহ	হরিমোহন মুখোপাধ্যায়,	১৯০১
বাংলার গান	উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী,	১৯০৫
জাতীয় রাখীসঙ্গীত	নব্যভারত সমিতি,	১৯০৫
স্বদেশ সঙ্গীত	যোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা,	১৯০৫
বন্দেমাতরম্	যোগীন্দ্রনাথ সরকার,	১৯০৫
জাতীয় উচ্ছ্বাস	জলধর সেন,	১৯০৫
স্বদেশী পল্লীসংগীত	রজনীকান্ত পণ্ডিত, মৈমনসিংহ,	১৯০৫
জাতীয় সঙ্গীত[2]	উপেন্দ্রনাথ দাস,	১৯০৬
বাঙ্গালীর গান	দুর্গাদাস লাহিড়ী,	১৯০৬
জাতীয় গাথা	জগদীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ঢাকা,	১৯০৬
স্বদেশ গাথা	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত,	১৯০৬
স্বদেশ হিতৈষী ভানুসংগীত	পীতাম্বরচন্দ্র চন্দ্র, বাঁকুড়া,	১৯০৬
মাতৃপূজা	কুন্তলীন প্রেস,	১৯০৬
গীতিমালিকা	অতুলচন্দ্র ঘটক,	১৯০৭
মাতৃগাথা	হেমচন্দ্র সেন,	১৯০৭
স্বদেশী সংগীত	নরেন্দ্রকুমার শীল,	১৯০৭
বন্দনা	নলিনীরঞ্জন সরকার,	১৯০৮

হুঙ্কার	হীরালাল সেনগুপ্ত,	১৯০৮
বীণার ঝঙ্কার	অমৃতলাল বসু,	১৯১২
গান	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,	১৯১৭
স্বদেশের ধূলি (আদিপর্ব)	পরেশচন্দ্র চৌধুরী,	১৯১৯
মাতৃমন্ত্র	অমূল্যচন্দ্র অধিকারী (প্রকাশক), ময়মনসিংহ	১৯২০
স্বদেশ গীতি	হরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,	১৯২০
স্বরাজ সঙ্গীত	মডেল লাইব্রেরী, ঢাকা, ময়মনসিংহ,	১৯২০
আবাহন	বিজয়লক্ষ্মী দেবী,	১৯২০
অর্ঘ্য-স্বরাজ সঙ্গীত		১৯২১
খেলাফৎ সঙ্গীত	আবদুল মতিন, ময়মনসিংহ,	১৯২১
দেশের গান	অক্ষয়কুমার দাশগুপ্ত, খুলনা,	১৯২১
স্বরাজ সঙ্গীত	বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, কোটালিপাড়া,	১৯২১
স্বদেশী সঙ্গীত	বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী,	১৯২১
স্বরাজ সঙ্গীত	সুধা দেব,	১৯২১
*জাতীয় সঙ্গীত*৩	বিজয়কুমার চক্রবর্তী (প্রকাশক),	১৯২২
*জাতীয় সঙ্গীত*৪	সরোজিনী দেবী, বরিশাল,	১৯২২
গীতিগুচ্ছ	স্বর্ণকুমারী দেবী,	১৯২২
স্বদেশী গান	অক্ষয়শঙ্কর ভট্টাচার্য,	১৯২২
*জাতীয় সঙ্গীত*৫	রেণুপ্রভা দেবী,	১৯২২
মুক্তিবাণী	অমরেশ কাঞ্জিলাল,	১৯২৩
জাতীয় দীক্ষা	যোগেন্দ্রনাথ দে,	১৯২৪
গীতিগুঞ্জ	অতুলপ্রসাদ সেন,	১৯৩১
*জাতীয় সঙ্গীত*৬	অক্ষয়কুমার রায়,	১৯৩৮
জনযুদ্ধের গান	ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ,	১৯৪২
জাতীয় শিল্পী পরিষদ	অরুণ সরকার,	১৯৪২
*জাতীয় সঙ্গীত*৭	ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ,	১৯৪৫
মুক্তির গান	সতীশচন্দ্র সামন্ত,	১৯৪৭
স্বদেশ সঙ্গীত	মুরারি দে,	১৯৪৮
ভারতের স্বদেশী গান	কমল রায়চৌধুরী,	১৯৪৮
একশ'টি বাংলা গান	লতিকাদেবী চট্টোপাধ্যায়,	১৯৫৫

মাতৃমন্ত্র — কালীচরণ ঘোষ, ১৯৬২
কান্তবাণী — রজনীকান্ত সেন; ১৯৬২
মাতৃবন্দনা — হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৯৬৩
বন্দেমাতরম্ — রঞ্জিৎকুমার সেন, ১৯৬৩
বাংলার পল্লীগীতি — চিত্তরঞ্জন দেব, ১৯৬৬
হাজার বছরের বাংলা গান — প্রভাতকুমার গোস্বামী, ১৯৭০
চারণকবি মুকুন্দদাস — জয়গুরু গোস্বামী, ১৯৭২

(২) গৌণ আকর গ্রন্থ

অজ্ঞাত — *সদুক্তিকর্ণামৃত*, ৫ম প্রবাহ, ৩১ বীচি, ২য় শ্লোক
অনন্ত সিংহ — *চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ*, ১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯৬৮
অপর্ণা দেবী — *দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন*, ১৯৭০
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর — *ঘরোয়া*, ১৯৬২
অমরেন্দ্রনাথ রায় — *বঙ্গ সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও ভাষাপ্রীতি*, ১৯৫২
অমৃতলাল বসু — *জীবনী সংগ্রহ*, ১৮৮৪
আজাহার উদ্দীন খান — *বাংলা সাহিত্যে নজরুল*, ৪র্থ সং, ১৯৬১
আবদুল আজীজ-আল-আমান — *নজরুল পরিক্রমা*, ১৯৬৯
আবুল কালাম সামসুদ্দীন — *অতীত দিনের স্মৃতি*, ঢাকা, ১৯৬৮
আবুল মনসুর আহমদ — *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ২য় মু, ঢাকা, ১৯৭০
আশুতোষ ভট্টাচার্য্য — *বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর*, ১৯৬৬
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত — *কবিতাবলী*, ১৮৮৫
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — *নির্বাসিতের আত্মকথা*, ৭ম সং, ১৯৬০
গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী — *শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ*, ১৯৫৬
চিত্তরঞ্জন দাস — 'স্বদেশী আন্দোলনের কথা', *অর্চ্চনা*, ২২শ ভাগ, ৬ষ্ঠ সং, শ্রাবণ, ১৩৩২। ১৯২৫
চিত্তরঞ্জন দেব — *পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ*, ১৯৫৩
চিন্মোহন সেহানবীশ — 'রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ', রঘুবীর চক্রবর্তী (সম্পাঃ) *রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও বাংলাদেশ*, ১৯৭২ গ্রন্থে

জয়গুরু গোস্বামী — *চারণকবি মুকুন্দদাস*, ১৯৭২

জয়দেব রায় — *সঙ্গীত পরিক্রমা*, ৩য় খণ্ড, ১৯৬০

জিতেন ঘোষ — *জেল থেকে জেলে*, ঢাকা, ১৯৬৯

দিলীপকুমার রায় — (ক) *সাংগীতিকী*, ১৯৩৮
(খ) *দ্বিজেন্দ্রগীতি*, ১৯৬৫
(গ) *উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল*, ১৯৩৮ (?)

দীনেশচন্দ্র সেন (সম্পাঃ) — (ক) *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, ১৮৯৬
(খ) *মৈমনসিংহ গীতিকা*, ১৯২৩

দীপ্তি ত্রিপাঠী (সম্পাঃ) — *কান্তবাণী*, ১৯৬২

নবীনচন্দ্র সেন — *পলাশীর যুদ্ধ*, ১৮৫৮

নরহরি কবিরাজ — *স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা*, ১৯৫৭

নলিনীকিশোর গুহ — *বাংলায় বিপ্লববাদ*, ১ম সং, ১৯২৩ ; ৪র্থ সং, ১৯৬৯

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত — *কান্তকবি রজনীকান্ত*, ১৯৬৮

নীহারকণা মুখোপাধ্যায় — *সঙ্গীত ও সাহিত্য*, ১৯৬২

নীহাররঞ্জন রায় — *রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা*, ১৯৬২

নেপাল মজুমদার — *ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ*, ১ম-৪র্থ খণ্ড, ১৯৬১

পুলিন বিহারী সেন — 'জগদীশচন্দ্রের স্বাদেশিকতা', *দেশ*, ২৬শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সং, ১৯৫৪ (?)

প্রফুল্লকুমার দাস — *রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রসঙ্গ*, ১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯৬২

প্রফুল্লকুমার সরকার — *জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ*, ১৯৬১

প্রবোধচন্দ্র সেন — (ক) *ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত*, ১৯৪৯
(খ) *বাংলার ইতিহাস সাধনা*, ১৯৫৩
(গ) 'জনগণমন', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত *রবীন্দ্র জীবনী* ২য় খণ্ড, ১৯৬২ গ্রন্থে

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় — *ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া*, ১৯৬৫

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — (ক) *ভারতের জাতীয় আন্দোলন*, ১৯৬০
(খ) *রবীন্দ্র-জীবনী*, ১ম-৪র্থ খণ্ড, ১৯৬২
(গ) *কালানুক্রমিক গীতবিতান*, বোলপুর, ১৯৭৩

প্রমথনাথ বিশী　(ক) 'বন্দেমাতরম্ তত্ত্ব', কমলাকান্তের আসর, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৯৬০
(খ) *চিত্রচরিত্র*, ১৯৬৫
(গ) *বঙ্কিম সরণী*, ১ম সং, ১৯৬৬

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়　(ক) *আনন্দমঠ*, ১৮৮২
(খ) ধর্মতত্ত্ব (নিম্নে 'ছ' দ্রষ্টব্য)
(গ) 'ভারত কলঙ্ক' (নিম্নে 'ছ' দ্রষ্টব্য)
(ঘ) 'বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (নিম্নে 'ছ' দ্রষ্টব্য)
(ঙ) বিবিধ প্রবন্ধ (নিম্নে 'ছ' দ্রষ্টব্য)
(চ) বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৫৭
(ছ) বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৯

বিপিনচন্দ্র পাল　(ক) *সত্তর বৎসর* ॥ আত্মজীবনী, ১৯৫৫
(খ) *সাহিত্য ও সাধনা*, ২য় খণ্ড, ১৯৬০

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়　*সাহিত্যসাধক চরিতমালা*, ১ম খণ্ড, ১৬ সংখ্যা, ১৯৬০

ভবতোষ দত্ত　'কবি রজনীকান্ত সেন', *তত্ত্বকৌমুদী*, ৮৮শ বর্ষ, ৯-১৪ সং, ১৩৭২ । ১৯৬৫

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়　*গান্ধীজির দৃষ্টিতে বাংলা ও বাঙালী*, ১৯৬৯

ভূদেব চৌধুরী　*বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*, ২য় পর্যায়, ১৯৭৪

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়　*ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব*, ১৯৭০

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত　*বিপ্লবের পদচিহ্ন*, ১৯৭৩

মতিলাল রায়　*আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী*, ১৯৫৭

মধুসূদন দত্ত　*মেঘনাদবধ কাব্য*, ১৮৬১

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (সম্পাঃ)　*অশ্বিনীকুমারের রচনাসম্ভার*, ১৯৬৭

মন্মথনাথ ঘোষ　*মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র*, ১৯২৪

মানসী মুখোপাধ্যায়　*অতুলপ্রসাদ*, ১৯৭১

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ　(ক) *কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা*, ১৯৬৫
(খ) *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস*, ১৯৬৯

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়　*বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি*, ১৯৫৬

যোগেশচন্দ্র বাগল	(ক) *হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত*, ১৯৬৮
	(খ) *মুক্তির সন্ধানে ভারত* ১৯৪০
রঘুবীর চক্রবর্তী (সম্পাঃ)	*রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও বাংলাদেশ* ১৯৭২
রজনীকান্ত গুপ্ত	(ক) *আর্য্যকীর্তি* ১৮৮৩
	(খ) *ভারত কাহিনী*, ১৮৮৩
	(গ) *বীরমহিমা*, ১৮৮৫
	(ঘ) *সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস*, ১৮৭৯ ১৯০০
রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত	(ক) চিত্রে বন্দেমাতরম্' *দেশ* ২০শ, কার্তিক, ২৯-৩২, ১৩৬১। ১৯৫৪
	(খ) মনোমোহন বসুর স্বদেশী গান, *দেশ* ফাল্গুন ৫ ১৭০ ১৭৫ ১৩৬২। ১৯৫৫
	(গ) *স্বদেশী গান*, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা।
	(ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র *কথাসাহিত্য* ৯ম সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৭০। ১৯৬৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ক) *রবীন্দ্র রচনাবলী*, বিশ্বভারতী
	(খ) *আত্মশক্তি* ১৯৫৭
	(গ) *জীবনস্মৃতি*, ১৯৬২
	(ঘ) 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ ১৯০৫ বৈশাখ ১৩১২
	(ঙ) বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠি (উত্তর-প্রত্যুত্তর), *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮১। ১৯৭৪
	(চ) জওহরলাল নেহেরুকে লেখা চিঠি, নভেম্বর ২, ১৯৩৭
	(ছ) *গোরা*, ১৯১০
	জ) গীতাঞ্জলি, ১৯১০
রমেশচন্দ্র দত্ত	ক) *মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত*, ১৮৭৮
	(খ) *রাজপুত জীবন সন্ধ্যা* ১৮৭৯
রাজকৃষ্ণ রায়	*ভারত সান্ত্বনা*, ১৮৭৮
রাজনারায়ণ বসু	(ক) *হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত*, ১৮৭৬
	(খ) *আত্মচরিত*, ১৯১২

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (ক) শিবাজীর চরিত্র, ১৮৬০
(খ) মেবারের রাজেতিবৃত্ত, ১৮৬১
রাজ্যেশ্বর মিত্র *বাংলার গীতকার*, ১৯৫৬
রামদাস সেন *ভারত রহস্য*, ১৮৮৫
রেজাউল করীম *বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ*, ১৯৫৪
শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *বঙ্কিম জীবনী*, ৩য় সং, ১৯৩১
শান্তিদেব ঘোষ *রবীন্দ্র সঙ্গীত*, ১৯৬২
শিবনাথ শাস্ত্রী *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, নিউ এজ, ২য় সং, ১৯৫৭
শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ) *গান্ধী পরিক্রমা*, ১৯৬৯
সখারাম গণেশ দেউস্কর *দেশের কথা*, ১৯০৪
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর *আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস*, ১৯১৫
সমুদ্র গুপ্ত *বঙ্গভঙ্গ*, ১৯৬৮
সরলা দেবীচৌধুরাণী *জীবনের ঝরাপাতা*, ১৯৫৮
সাহানা দেবী *মৃত্যুহীন প্রাণ*, ১৯৭০
সুকুমার সেন *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, ১৯৬৩
সুভাষচন্দ্র বসু পত্রাবলী, ১ম সং, ১৯৬৪ ; ২য় সং, ১৯৬৮
তরুণের স্বপ্ন, ১৯২৯
সুনীলকুমার গুহ *স্বাধীনতার আবোল তাবোল*, ২য় সং, ১৯৬১
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার *রাজস্থানের ইতিবৃত্ত, মিবার*, ১৮৭২-৭৩
সুরেশচন্দ্র গুপ্ত *অশ্বিনীকুমার*, বরিশাল, ১৯২৮
সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, ১৯৬০
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর *রবীন্দ্রনাথের গান*, ১৯৬৬
সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় *বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচিন্তা*, ১৯৬৮
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ *সঙ্গীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান*, ১৯৬৫
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, ১৮৯৫
হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলায় নবযুগ*, ১৯৬১
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় *তরী হতে তীর*, ১৯৭৪
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় *বৃত্রসংহার*, ১৮৭৭
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ *কংগ্রেস ও বাংলা*, ১৯৩৫

Bagal, J. C., "Congress in Bengal", in Gupta, A. C. (ed.) *Studies in the Bengal Renaissance*, 1958.

Bamford, P. C., *Histories of the Non-Co-operation and Khilafat Movements*, Delhi, 1974 (1st ed. 1925).

Banerjee, Surendranath, *A Nation in Making*, Oxford U. Press, 1925, Reprint 1963.

Bartarya, S. C., *The Indian Nationalist Movement*, Allahabad, 1958.

Bose, Nemai Sadhan, *The Indian National Movement*, 1965.

Buch, M A., *Rise and Growth of Indian Militant Nationalism*, Baroda, 1940.

—— *Rise and Growth of Indian Liberalism*, Baroda, 1940.

Calcutta Municipal Gazette, The. Vol. LXXV, No. 2.

Chandra, Bipan, *The Rise and Growth of Economic Nationalism in India*, Delhi, 1966.

Chandra, B., Tripathi, A., and De, B., *Freedom Struggle*, New Delhi, 1972.

Chowdhury, Sukhbir, *Growth of Nationalism in India, (1857-1918)*, Vol. 1, New Delhi, 1973.

Chowdhury, Shashi Bhushan, "Pre-Congress Nationalism" in Gupta, A. C., (ed.) *Studies in Bengal Renaissance*, 1958.

Chunder, Bholanath, *Travels of a Hindoo*, London, 1969.

Das, Sisir Kumar, "Nationalism in 19th Century Bengali Literature", *Thought*, Delhi, October 10, 19.4.

—— *Western Sailors : Eastern Seas*, New Delhi, 1971.

—— "Communalism and Bengali Literature—1917-1947", *Radical Humanist*, July, 1972.

—— *The Shadow of the Cross*, Delhi, 1974.

Das Gupta, R. K., "The Song Book of Indian Struggle", *Orient Review*, Vol. 1, No. 1, 1955.

—— "The Deity of Bande Mataram", *The Statesman*, Puja Supplementary, September 18, 1960.

—— (ed.) *Bankim Chondra Chatterjee, Vandemataram*, University of Delhi, 1967, p. 16.

—— (ed.) *Our National Anthem*, University of Delhi, 1967.

—— "Sakharam Ganesh Deuskar : The man and his work", Lecture delivered at India International Center, New Delhi. 1971 (unpublished).

Datta, Kalikinkar, *Renaissance, Nationalism and Social Changes in Modern India*, Calcutta, 1965.

Desai, A. R., *Social Background of Indian Nationalism*, Bombay, 1966.

Digby, William, *Prosperous British India*, (1901), Indian ed., 1969.

Dilks, David, *Curzon in India*, Vol. I & II, London, 1969.

Dutt, R. Palme, *India To-day*, Bombay, 1949.

Dutt, Romesh Chandra, *The Economic History of India in the Victorian Age*, London, 7th ed. 1950.

The Economic History of India, Vol. I, 1969.

.ndhi, M. K., *The Collected Works of Mahatma Gandhi*, Vol. V, Ahmedabad, 1961.

Gangopadhyay, D., *Indian National Songs and Lyrics*, Lahore, 1883.
Ganguly, B. N , *Dadabhai Naoroji and the Drain Theory*, Bombay, 1965.
Ghosh, Kalicharan, *The Roll of Honour*, Calcutta, 19o5.
Gokhale, G. K., *Congress Presidential Address*, 1905.
Gordon, Leonard A., *Bengal : The Nationalist Movement, 1876-1940*, Delhi, 1974.
Government of India, *Sedition Committee Report, 1918*, Calcutta, 1918.
Gupta, A. C. (ed.), *Studies in Bengal Renaissance*, Calcutta, 1958.
Hay, Stephen, *Asian Ideas of East and West : Tagore and his critics in Japan, China and India*, 1970.
Heimsath, C. H., *Indian Nationalism and Hindu Social Reform*, Princeton, 1964.
Ker, James Campbell, *Political Trouble in India*, (1907-17), Calcutta, 1917.
Kopf, David, *British Orientalism and the Bengal Renaissance*, Calcutta, 1969.
Lok Sabha, *Loksabha Debates*, on 3 8.66 3rd Series, LVII, VIII, 2117-18.
Lovett, Verney, *History of the Indian Nationalist Movement*, London, 1921.
Majumdar, B , *History of Indian Social and Political Ideas, From Ram Mohan to Dayananda*, Calcutta, 1967.
Majumdar, R. C., *Three Phases of India's Struggle for Freedom*, Bombay, 1961.
—— *History of the Freedom Movement in India*, Vol. 1-3, Calcutta, 1962.
—— and Majumdar, A. K., *The History and Culture of the Indian People Struggle for Freedom*, Bombay, 1969.
—— Roy Chowdhury, H. C. and Dutta, K. K., *An Advanced History of India*, (2nd ed.) 1960.
Mookherjee, P., *All About Partition*, Calcutta, 1905.
Mukherjee, Haridas and Mukharjee Uma, "*Bande Mataram*" *and Indian Nationalism (1906-1908)*, Calcutta, 195
—— *India's Fight for Freedom or the Swadeshi Movement, (1905-1906)*, Calcutta, 195
Mukherjee, Hiren, *India's Struggle for Freedom*, Calcutta, 1946.
Nauroji, Dadabhai. *Poverty and Un-British Rule in India*, London, 1901.
Nehru, Jawaharlal, *Statement on Vandemataram, in his draft of the Congress Working Committee's Resolution on the Song Past on 28, October 1937.*
Nehru, Jawaharlal, *Autobiography*, London, 1955.
Pal, Bipin Chandra, *Memories of My Life and Times*, Calcutta, 1932.
—— *Swadeshi and Swaraj*, Calcutta, 1954.
—— *Beginnings of Freedom Movement in Modern India*, Calcutta, 1932.
Ray, Nihar Ranjan, *Nationalism in India*, Aligarh, 1973.
Ronaldshay, Lord, *The Heart of Aryavarta*, London, 1925.
Sarkar, Sumit, *The Swadeshi Movement in Bengal*, New Delhi, 1973.
Sen, P. R., *Western Influence in Bengali Literature*, Calcutta, 1966.
Sri, Aurobindo, *Bankim-Tilak-Dayananda*, 1947.
Tagore, Soumyendranath, "The Evolution of Swadeshi Thought", in Gupta A. C., (ed.) *Studies in Bengal Renaissance*, Calcutta, 1958.
Tarachand, *History of the Freedom Movement in India*, Vol. 1-4, New Delhi, 1